হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

প্রদীপ আচার্য

—ঃ প্রকাশক ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য
শ্রীহরি প্রকাশন
পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা ।

Hridoyey Tumi Maa Bhakti

A Noval written by
Dr. Pradip Acharjee
Price : Rs. 30.00 only

প্রথম প্রকাশ ঃ

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা
১৯শে শ্রাবণ, শনিবার ১৪১৩ বাং
৫ই আগস্ট, ২০০৬ইং

প্রকাশক ঃ-

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য
পুরাতন কালীবাড়ী লেন,
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।
ফোন ঃ ২৩১-১৪৬২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য

মুদ্রণ ও বাঁধাই

সুনীতি প্রিন্টার্স
ভট্টপুকুর, আগরতলা ।
ফোন ঃ ২২৩০৮৩৯

মূল্য ঃ

ত্রিশ টাকা মাত্র

➢ লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- ➢ পথের প্রদীপ
- ➢ গোমতীর স্বপ্ন
- ➢ দুই অধ্যায়
- ➢ জীবন যে রকম
- ➢ অসবর্ণ
- ➢ হোয়াইট লিকার
- ➢ সমশের গাজী
- ➢ অমৃতলোকের সন্ধানে
- ➢ ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য
- ➢ অমর মাণিক্য
- ➢ ভুবনেশ্বরী মন্দির
- ➢ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ্ গাথা
- ➢ ফুলকুমারী
- ➢ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীলা কথা
- ➢ ভালবাসার মৃত্যু নেই
- ➢ নীরমহলের রাজা
- ➢ জগৎ নারায়ণের পাঁচালী
- ➢ মান সরোবর তীরে
- ➢ লঙত্রাই বাবা
- ➢ মিলন তীর্থ কেদার বদরী
- ➢ পূর্ণকুম্ভে অমৃতের খোঁজে
- ➢ প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রী দীনদয়ালানন্দ পরমহংস দেব (দাদামহারাজ)
- ➢ হৃদয় মন্দিরে তুমি

উৎসর্গ

পরম সাধিকা

শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা

এবং

মা প্রিয়বালা দেবীর শ্রীচরণে

ভূমিকা

ডাঃ প্রদীপ আচার্য ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে এক পরিচিত নাম। ১৯৭২ সালে "পথের প্রদীপ" উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যজগতে প্রবেশ। তারপর ক্রমে কয়েকটি উপন্যাস কলিকাতার বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ খৃঃ থেকে এ পর্যন্ত তার লেখা ৪১৬২টি নিবন্ধ ও প্রবন্ধ ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীহরি প্রকাশন শ্রী আচার্যের বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেছে। "হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি" গ্রন্থটিতে মা ও নারী সমাজের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হয়েছে। "হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি" গ্রন্থটিতে মা ও নারী সমাজের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশিত হয়েছে নারী সমাজের অবদানের কোন বিকল্প নেই। বৈদিক সমাজ তাই নারী জাতীকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রায় আটশো বছর মুসলমান শাসকরা ভারত শাসন করেছে।

আটশো বছর প্রাণ ও মান রক্ষায় হিন্দু নারী জাতীকে ঘরের কোণে ঘোমটা দিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারতের শাসন দণ্ড দখলের পর নারী শক্তি আবার ঘরের কোন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছিল। এক শ্রেণীর লোক একে ইংরেজদের অবদান বলে প্রচার করছে। হিন্দুজাতী নারীর সম্মান এবং শিক্ষায় উদাসীন ছিল বলে প্রচার করছে। এরা বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রচারের বিরোধী।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতেই রয়েছে কোটি কোটি বছর ধরে মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস। সাতজন ঋষি কন্যা বেদ এর ১২৬টি ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করেছেন। মুসলমান শাসনকালে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা নারীর বেদ পাঠের অধিকার হরণ করা হয়েছে। যারা বেদ রচনা করেছেন তারা বেদ পাঠ করতে পারবেন না এর চেয়ে হাস্যকর বিষয় আর কি হতে পারে।

এক শ্রেণীর ইতিহাসবিদ সরস্বতী নদীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আসছিলো। ঋক্ বেদ এ দেবী সরস্বতী এবং সরস্বতী নদীর কথা বলা হয়েছে। দেবী ভাগবতে দেবী গঙ্গা ও দেবী সরস্বতীর মর্তে আগমনের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

২০০২ সালে সরস্বতী নদী প্রকল্প গঠন করে সরস্বতী নদীর প্রবাহকে খোঁজ করার প্রয়াস চালানো হয়। গত চার বছরেই এতে বিরাট সাফল্য পাওয়া গেছে। ভূতত্ত্ববিদ্গণ স্বীকার করছেন সরস্বতী নদী প্রায় পাঁচলক্ষ বছর অগে হিমালয় থেকে সমতলে প্রবাহিত

হয়। ব্যাপক বন ধ্বংসের ফলে প্রায় সারে পাঁচ হাজার বছর আগে সরস্বতী নদী বিলুপ্ত হয়ে যায় । হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে প্রায় এক হাজার মিটার গভীরে সরস্বতী নদীর প্রবাহ ধরা পড়েছে । সরস্বতী নদীর প্রবাহ দ্বারা রাজস্থান এবং গুজরাটের পানীয়জলের সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীগণ দাবী করছেন ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ এখন স্বীকার করছেন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে। পুরাণে পৃথিবী ২৮ বার ধ্বংস হয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণের মতে পৃথিবী পাঁচবার ধ্বংস হয়েছে। প্রথমবার ধ্বংস হয়েছে প্রায় ৩৬ কোটি বছর আগে শেষ বার ধ্বংস হয়েছে প্রায় ছয় কোটি বছর আগে। ডিসকভারী চ্যানেলে ঐসব তথ্য বহুবার প্রকাশিত হয়েছে ।

এসব কথা বলা হলো এজন্য যে জাগতিক জ্ঞানের তথা বিজ্ঞানের যেখানে শেষ অধ্যাত্মজ্ঞানের সেখান থেকে শুরু । "হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি" গ্রন্থটিতে লেখক এমনসব বর্ণনার উল্লেখ করেছেন বস্তুবাদীদের বিচারে যা অলীক কল্পনা বলে মনে হতে পারে। ধর্ম, বিশ্বাস এমনি এক বিষয় তর্কের মাধ্যমে যার সমাধান অসম্ভব ।

এর আগে পর্যন্ত লেখকের যে ২৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে তার বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে লেখক পরিচিতির সঙ্গে দেওয়া হলো। হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি লেখকের ২৪তম গ্রন্থ । গ্রন্থটি পড়ে পাঠক/ পাঠিকাগণ আনন্দ পেলেই পরিশ্রম সার্থক হবে ।

বিনীত
শ্রীকৃষ্ণ আচার্য
প্রকাশক ।

লেখক পরিচিতি

ডাঃ প্রদীপ আচার্য একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, হস্তরেখাবিদ, জ্যোতিষশাস্ত্রী এবং চিকিৎসক (এম ডি এইচ, রেজিস্টার্ড)।

তিনি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বাংলাদেশের অন্তর্গত গোঁসাইপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম স্বর্গীয় বগলানন্দ আচার্য। মাতা স্বর্গীয়া প্রিয়বালা দেবী। ১৯৫১ইং থেকে ত্রিপুরার বাসিন্দা।

তিনি ন'বছর বয়সেই লেখার কাজে হাত দেন। ইতিমধ্যেই কলিকাতা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে তেইশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া দু'শোর বেশী গল্প, শতাধিক কবিতা, চারটি একাঙ্ক নাটক এবং চার হাজার একশত বাষট্টিটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ত্রিপুরার এবং কলিকাতার সংবাদপত্রে এবং সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকের প্রথম উপন্যাস পথের প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খৃঃ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৬। মূল্য— চার টাকা। প্রকাশক পি আচার্য। মধুবন, পোঃ আমতলী। পথের প্রদীপ গ্রন্থটি ত্রিপুরায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা উপন্যাস। উপন্যাসটি আগরতলার প্রিয়প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস গোমতীর স্বপ্ন। উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালে কলিকাতার বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা — সুপ্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৩৮১ বাংলার আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ২১ মদন বাড়াল লেন, কলিকাতা - ১২। পৃষ্ঠাসংখ্যা — ১৩১। মূল্য— ছয় টাকা। তৃতীয় উপন্যাস দুই অধ্যায়। প্রকাশক— সন্তোষ পুরকায়স্থ। সুকেশী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ — পঁচিশে বৈশাখ। ১৩৮২ বাংলা। পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১১৯। মূল্য — পাঁচ টাকা। চতুর্থ উপন্যাস — জীবন যে রকম। প্রথম প্রকাশ — শ্রীপঞ্চমী। ১৩৮৪ বাংলা। প্রকাশক— ডারলিং প্রকাশন। ৪৩৭/বি রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা- ৫। পৃষ্ঠা — ১৪২। মূল্য — পাঁচ টাকা। পঞ্চম উপন্যাস— হোয়াইট লিকার। প্রকাশক —প্রণব কুমার নাথ। সাহিত্যরূপা প্রকাশন। ২৬/সি বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ১২০। মূল্য — ছয় টাকা। প্রথম প্রকাশ — ২৭শে কার্তিক, ১৩৮৫ বাংলা। ষষ্ঠ উপন্যাস — অসবর্ণ। প্রকাশক — ডি. ঘোষ, সাহিত্যমন্দির। কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩। প্রথম প্রকাশ — আষাঢ়, ১৩৮৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৬০। মূল্য — দশ টাকা। সপ্তম উপন্যাস— সমশের গাজী। প্রকাশক — বর্ণমালা প্রকাশনী। আগরতলা, প্রথম প্রকাশ — ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ইং। মূল্য— কুড়ি টাকা মাত্র। অষ্টম উপন্যাস—

অমৃতলোকের সন্ধানে। প্রকাশক— বিষ্ণুপদ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন। পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৮ইং। মূল্য — কুড়ি টাকা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ২০৫। নবম উপন্যাস — ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য। প্রকাশক — বিষ্ণুপদ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন। পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ — ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ইং। পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১৫৮। মূল্য - কুড়ি টাকা মাত্র।

দশম উপন্যাস — লঙত্রাই বাবা। প্রকাশক — শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ —২২শে ভাদ্র, ১৪০২ বাংলা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৯। মূল্য— ত্রিশ টাকা।

দ্বাদশ গ্রন্থ তথা প্রথম জীবনী গ্রন্থ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ লীলা কথা। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ— ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৫ইং। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ২৫৮। মূল্য —একশত টাকা। দ্বিতীয় মুদ্রণ - ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৪০২ বাংলা। মূল্য — পঞ্চাশ টাকা।

ত্রয়োদশ গ্রন্থ তথা প্রথম ভ্রমণ উপন্যাস — মিলন তীর্থ কেদার বদ্রী। প্রকাশক — শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ— ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ১২০। মূল্য — ত্রিশ টাকা।

চতুর্দশ গ্রন্থ তথা প্রথম কাব্য সংকলন — ফুলকুমারী। প্রকাশক — অশ্বিনী কুমার আঢ্য। শকুন্তলা রোড, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ — বুদ্ধ পূর্ণিমা। ১৩৮৪ বাংলা। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৮৮। মূল্য — তিন টাকা।

পঞ্চদশ গ্রন্থ তথা দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ— শ্রীকৃষ্ণ বিরহ গাথা। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ—২৭শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং। দ্বিতীয় মুদ্রণ — জানুয়ারী ১৯৯৫ইং। মূল্য—পঁয়ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১৩৬।

ষোড়শ গ্রন্থ তথা প্রথম গল্প সংকলন — ভুবনেশ্বরী মন্দির। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ—১লা জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ১৮৯। মূল্য — পঁচিশ টাকা। সপ্তদশ গ্রন্থ তথা প্রথম নাটক — ভালবাসার মৃত্যু নেই। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ—৩০শে জুন, ১৯৯৫ইং। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। মূল্য— কুড়ি টাকা মাত্র। অষ্টাদশ গ্রন্থ তথা প্রথম কিশোর নাটক — নীরমহলের রাজা। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ— ৩০শে জুন, ১৯৯৫ইং। মূল্য — দশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৩০।

উনবিংশ গ্রন্থ তথা প্রথম পাঁচালী গ্রন্থ — জগৎ নারায়ণের পাঁচালী। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। মূল্য — তিন টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৯। বিংশতিতম গ্রন্থ তথা দ্বাদশ উপন্যাস— মান সরোবর তীরে। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ—১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৭ইং। পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৭৮। মূল্য — কুড়ি টাকা মাত্র।

একবিংশতিতম গ্রন্থ — পূর্ণকুম্ভে অমৃতের খোঁজে। প্রকাশক— শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন, পুরাতন কালীবাড়ী লেন, আগরতলা। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৪০৮ বাংলা। পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১৭৮। মূল্য — চল্লিশ টাকা।

দ্বাবিংশতিতম গ্রন্থ —প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রী দীনদয়ালানন্দ পরমহংস দেব (দাদা মহারাজ)। প্রথম প্রকাশ — ২৮শে কার্তিক দীপাবলী। ১৪০৮ বাংলা। প্রকাশক— শ্রীরবীন্দ্রনাথ অধিকারী। ২২/৩ প্রফুল্ল চ্যাটার্জী রোড। নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা। পশ্চিম বাংলা। মূল্য — সত্তর টাকা মাত্র।

ত্রয়োবিংশতিতম গ্রন্থ — 'হৃদয় মন্দিরে তুমি' ভগবান ও ভক্তের লীলা কথার কিছু কিছু স্মৃতি যা বিভিন্ন পুরাণে ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন। ছোট্ট ছোট্ট মধুর লীলাকথা লেখক ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রথিত করে অনেক বই পড়ার পরিশ্রম লাঘবের প্রয়াস নিয়েছেন। প্রথম প্রকাশ— শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। ১৪১২ বাংলা, ২০০৫ইং প্রকাশক — শ্রী কৃষ্ণ আচার্য। শ্রীহরি প্রকাশন পুরাতণ কালীবাড়ী লেন। আগরতলা, পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১৮৩, মূল্য— ত্রিশ টাকা।

২৪তম গ্রন্থ — হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। গ্রন্থটি পাঠক / পাঠিকাদের আনন্দ দিতে পারলে প্রকাশক নিজেকে ধন্য মনে করবে।

বিনীত
শ্রীকৃষ্ণ আচার্য
প্রকাশক

তাং ৮ই শ্রাবণ, ১৪১৩বাংলা
২৫শে জুলাই, ২০০৬ ইংরেজী

প্রাক্‌কথন

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবীর স্তুতি করার সময় মার্কণ্ডেয় ঋষি দেবীকে বিষ্ণুমায়া বলে অভিহিত করেছেন। দেবী চণ্ডী আবির্ভূতা হয়েছেন ভগবান বিষ্ণুর শরীর থেকেই। দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন ভগবান বিষ্ণুর জিহ্‌বা বা বাক্‌ থেকে।

ভগবান বিষ্ণুর বামভাগ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন দেবী রাধারাণী। রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ দিব্য হাজারো বছর রতিক্রিয়া করেন। রাধারাণী অন্তস্বত্বা হন। দিব্য সহস্র বছর গর্ভ ধারণ করার পর তিনি একটি ডিম্ব প্রসব করেন। রাধারাণী ডিম দেখে ঘৃণায় সেই ডিম সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতে খুব দুঃখিত হন এবং রাধাকে সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিশাপ দেন। তখনি সরস্বতীর প্রকাশ। দিব্য সহস্র বছর সেই ডিম সমুদ্রের তলদেশে থাকার পর এক দিব্য পুরুষের জন্ম হয়। তিনিই নারায়ণ বা মহা বিষ্ণু।

অতি প্রধান দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আর মহাশক্তি দেবীগণের মধ্যে রাধা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং সাবিত্রী। দেবসমাজ লক্ষ্মীকে ধন, সম্পদ, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের ভার দেন। আধুনিক ভাষায় দেবী লক্ষ্মীকে অর্থ, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বলা যেতে পারে। দুর্গাকে ত্রিভুবন রক্ষার দায়িত্ব দান করেন আধুনিক ভাষায় দেবী দুর্গাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর দেবী সরস্বতীকে তথ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ দেব সমাজে দেবীগণকে শ্রদ্ধার আসন দান করা হয়েছিল।

বৈদিক যুগে নারীদের বেদ পাঠের অধিকারসহ বেদ এর মন্ত্র রচনারও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সাতজন ঋষি কন্য বেদ এর শতাধিক মন্ত্র বা ঋক্‌ রচনা করেছেন। শক্তির আরাধনা তাই চিরন্তন। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাও চিরন্তন ব্যবস্থা রূপেই বৈদিক যুগ থেকে গণ্য হয়ে এসেছে। নারী যদি শৃঙ্খলা পরায়ণ না হন সেবা পরায়ণ না হন, স্নেহময়ী না হন, তাহলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। ভোগ বিলাস নারীকে ধর্মহীন করে তুলে। সমাজ তথা সৃষ্টি রক্ষা এবং ধ্বংসের প্রধান কারণ নারীর ভূমিকা। নারী ধর্মপরায়ণ না হলে গুণবান ও গুণবতী সন্তানের জন্মদিতে ব্যর্থ হন। ভোগ বিলাস সমাজ জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। তাই সমাজ রক্ষায় দেবী ও নারীর কৃপা একান্ত কাম্য।

মা সন্তানের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। মায়ের দয়া এবং ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া

কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মা শব্দের কোন বিকল্প নেই। আধুনিক বিশ্বে মা ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকায় মা শব্দটির বিকৃতি ঘটতে শুরু করেছে। মা হয়ে যাচ্ছেন— মাম্, মাম্মা, মাম্মী। সমাজে দেখা দিচ্ছে চরম নৈরাজ্য। মা শুধু স্নেহময়ী জননীই নন তিনি হৃদয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, করুণা, দয়া, মমতা প্রভৃতি রূপে বিরাজিতা। মায়ের কৃপাধারা সহস্ররূপে সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়। ভারতে তাই মায়ের আরাধনা সর্বত্রই প্রচারিত। ত্রিপুরাতে দুই শক্তিপীঠ উদয়পুর এবং কমলাসাগরের মা ত্রিপুরেশ্বরী এবং মা কালী ত্রিপুরাবাসীর প্রতি সহস্র ধারায় কৃপা বিতরণ করে চলেছেন। মায়ের করুণা ধারার মহিমা কেউ স্বীকার করেন কেউ চুপ করে থাকেন। ব্যাসদেব শক্তির মহিমা দেবী ভাগবত এবং কালীকা পুরাণে বর্ণনা করেছেন। গত পাঁচশো বছরেরও বেশী সময় ধরে মা ত্রিপুরেশ্বরী এবং মা কালী যে কৃপা বিতরণ করে চলেছেন তারই দু'চার কথা নিয়ে রচিত হলো— হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। মায়ের অনন্তরূপ; অনন্ত লীলা, দেবসমাজও মা আদ্যাশক্তির লীলা কথা বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন নি। আমার পক্ষে তা কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র।

মায়ের স্নেহের দু'চার কথা লিখে না গেলে আমার আত্মা অতৃপ্ত থেকে যেতো। তাই ক্ষুদ্র প্রয়াস নিলাম। মায়ের কৃপার কথা পাঠ করে কোন পাঠক/ পাঠিকার যদি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহ কিংবা ভালোবাসা জাগ্রত হয় তাহলে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই আমার আত্মা তুষ্ট হবে।

আমার প্রথম গন্থ তথা ত্রিপুরার প্রথম বাংলা উপন্যাস পথের প্রদীপ উৎসর্গ করেছিলাম পরমারাধ্য পিতার শ্রীচরণে। এরই মধ্যে আমার তেইশটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কালের নিয়মেই একদিন আমার লেখনী থেমে যাবে। আমার স্থূলদেহ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবে। কখন ডাক আসবে জানি না। মায়ের এবং ভগবান শ্রীহরির অহৈতুকি কৃপায় বারবার মন পুলকিত হয়েছে। তাই কান পেতে আছি তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার ডাক কখন আসবে সেই আশায়। স্বামী বিবেকানন্দ যে গানটি প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন সেই গানটির প্রথম দু-লাইন এই মুহূর্তে খুব বেশী করে মনে পড়ছে। "মন চল নিজ নিকেতনে। সংসারবিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে"। মনে পড়ছে সাধক কবির গাওয়া সেই চিরন্তন গানের কলি— "হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকি-হে তোমারে"।

গর্ভধারিনী মা প্রিয়বালা দেবী দু'বছর চার মাস সময়ে আমায় ফেলে রেখে মহাকালের নিষ্ঠুর খেলায় অমৃত লোকে চলে গেছেন। কৈশোর বয়স পর্যন্ত মাকে একটিবার দেখার বড় সাধ হতো। মনে পড়ে সেই গানের কলি— ও তোতা পাখী-রে শিকল খুলে উড়িয়ে দেবো আমার মাকে যদি এনে দাও। মায়ের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

এতোদিন পর ত্রিপুরার পরম সাধিকা শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মায়ের সঙ্গে গর্ভধারিনী মা প্রিয়বালা দেবীর শ্রীচরণে আমার ২৪তম গ্রন্থ বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী রূপে দুই মায়ের চরণে অর্পণ করলাম।

আদ্যাশক্তি মহামায়ার অপরিসীম কৃপায় প্রাক্ যৌবনের সময় থেকেই মহামায়ার অংশস্বরূপা অনেক মায়ের অহৈতুকি স্নেহ পেয়েছি । তাদের মধ্যে রয়েছেন আগরতলা গান্ধীস্কুলের পাশে রঘুনাথ আশ্রমের শ্রীশ্রী রঘুনাথ মা। চৌমহনী বাজারের আনন্দময়ী কালীবাড়ীর শ্রীশ্রী গায়ত্রী মা। বড়দোয়ালীর শ্রীশ্রী অরুণাময়ী মা। দশমীঘাটের শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা।

শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মায়ের স্নেহময়ী রূপের বহু পরিচয় বহু ভক্তবৃন্দ পেয়েছেন। লেখনীর মাধ্যমে অনেকেই তা প্রকাশ করেছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য চন্দ্রোদয় রূপিনী মহোদয় মায়ের স্নেহময়ী রূপের একটি কাহিনী দৈনিক সংবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সংবাদটি পড়েই আমি মাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। একদিন আগরতলা প্রভুবাড়ীর বেনুধর গোস্বামীকে নিয়ে দুপুরে মায়ের সিদ্ধি আশ্রমের বাসভবনে গিয়ে মাকে দর্শন করি। তারপর থেকে মায়ের স্নেহ সহস্র ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মায়ের বহু ভক্ত মায়ের মানবী দেহেই বিভিন্ন দেবীর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে মায়ের আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ী কালীর বিগ্রহ সরিয়ে মায়ের কাঁচে বাঁধানো ছবি প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মতে মা সজীব দেহে আদ্যাশক্তি মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ। মা আদ্যাশক্তি মানবের হৃদয়ে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, দান করুন। মানুষ যেন মানুষকে ভালবাসতে পারে এই শক্তি প্রদান করুন। হৃদয়ে তিনি ভক্তি ও বিশ্বাসের শিখা রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। "অসতো মা সৎগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যুর্মা অমৃত গময়', ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

বিনীত—

প্রদীপ আচার্য

লেখকের বংশ পরিচয়

আদি নিবাস রাঢ় ভূমি, মৈথিলী পরগণা।
চন্দ্রশেখর অধিকারী
নবদ্বীপে বসতি স্থাপন
↓
দিলীপ অধিকারী (নবদ্বীপ)
↓
সত্যরাম অধিকারী
(সরাইল পরগণা, নদীয়াপুর)
↓

↓ জয়নন্দ অধিকারী
(সুকর্ণঘাটে বসতি স্থাপন)
↓
শিবপ্রসাদ (গোঁসাইপুর)
↓
জগন্নাথ (গোঁসাইপুর)
↓
রমা নাথ (গোঁসাইপুর)
↓
ইন্দ্র চন্দ্র, গগন চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, নবীনচন্দ্র
↓
মহানন্দ, নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ,
অখিলানন্দ, জগতানন্দ, সর্বানন্দ
বগলানন্দ
(আমতলী, বিশালগড়)
পঃ ত্রিপুরা।

↓ যামিনী (গোঁসাইপুর)

↓ শ্রী নন্দ অধিকারী
(গোঁসাইপুরে বসতি স্থাপন)

বৈশাখ মাসের অমাবস্যায় কমলাসাগর কালী বাড়ীতে মেলা। কয়েকদিন আগে থেকেই সত্যবতী শান্তনুকে ঐ মেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে আসছিল। শান্তনু দিদিমার কাছে কমলাসাগরের মেলার ঐতিহ্যের কথা শুনেছে। দেশ ভাগের পর কমলাসাগরের কালীবাড়ীর ঐতিহ্য ক্রমেই ম্লান হয়ে পড়েছিল। উদয়পুর মহকুমা হবার কারণে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উন্নতি হতে থাকায় চন্দ্রপুরে রাস্তার পাশে অবস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের ঐতিহ্য আবার ফিরে আসতে থাকে ।এ যেন জোয়ার ভাটার মতোই পরিস্থিতি । উদয়পুর এখন জেলা।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য রাজধানী উদয়পুর থেকে পুরাতন আগরতলায় সরিয়ে আনার পর মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের জাক্‌জমক ক্রমে হারিয়ে যায়। কসবার কালী মন্দিরের জাক্‌জমক বাড়তে থাকে ।চাক্‌লা ও রোশনাবাদের প্রজাগণ বৈশাখ ও ভাদ্র ঐ দুই মাসের দুই অমাবস্যা তিথিতে হাজারো সংখ্যায় পূর্ণার্থী উপস্থিত হয়ে মায়ের রাতুল চরণে প্রণাম নিবেদন করতেন ।

ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহন্ত মহারাজ ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। আশ্রমে পুরোহিতদের বাসস্থান গড়ে উঠে। কালের কবলে হারিয়ে যায় বিশাল ফুল বাগান। কসবা ও উদয়পুর এই দুই স্থানের দুই শক্তিপীঠকে নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর গর্ব। শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ।

সত্যবতীকে মেলায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে সাড়া দেয় শান্তনু । ঠিকহয় দু'জনেই সেদ্ধ ভাত খেয়ে শান্তনুর বাইক্-এ করে কসবা তথা কমলাসাগর যাবে। সারাদিন থকে সন্ধ্যায় ফিরবে।

সত্যবতী বাড়ী থেকে রুটি আর সুজি বানিয়ে বড় একটা টিফিন বাটিতে ঢুকিয়ে ব্যাগে নিয়ে নিয়েছে। দুপুরে খাবে।

দু'জনে যাওয়ার পথে আগরতলার এক মিষ্টির দোকান থেকে প্যাড়া কিনে নিয়েছে। পৌঁছে মায়ের কাছে ভোগ নিবেদন করে বটগাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে বসে কলেজ জীবনের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি চারণা শুরু করে।

কলেজে রিগিং তথা জুলুম ভারতে শিক্ষা জগতে এক কলঙ্ক জনক অধ্যায়। শান্তনু আর সত্যবতী কলেজে বি-এতে প্রথম বর্ষে বীরবিক্রম কলেজে ভর্তি হবার পর সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের এমনি এক কারণেই একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়েছে। শান্তনু আর সত্যবতী মহা ভারতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র । প্রথম বর্ষে অর্থাৎ কলেজে নূতন ভর্তি হলে অগ্রজ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা জুলুমবাজীর শিকার হবার ঘটনা প্রতিটি কলেজেই ঘটে চলেছে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ঐ জুলুমবাজীকে রিগিং নামক ইংরেজী শব্দে অভিহিত করছে। তাদের মতে রিগিং এর মাধ্যমে সিনিয়র বা অগ্রজ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নূতন বা নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে ।

অন্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণ গিরিং বা জুলুমকে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির উদাহরণ বলে মনে করেন। ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয় এক মধুর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। নবীন ছাত্র-ছাত্রী মুনি ঋষিগণের আশ্রমে এসে পা রাখার পর অগ্রজ ছাত্র-ছাত্রীগণ আশ্রম ও শিক্ষাজগতের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে নবীনদের সহায়তা করতো। আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এসে কিশোর-কিশোরীদের মন যাতে প্রিয়জনের বিরহে কাতর না হয় সে জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালাতে মহর্ষি ব্যাসদেব এবং মহর্ষি বাল্মিকী আশ্রম জীবনের যে চিত্র মহাভারত, রামায়ণে এবং বিভিন্ন পুরাণে তুলে ধরেছেন তা থেকেই এই তথ্য জানা যায়।

আধুনিক যুগে সংবাদ মাধ্যমের কারণে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার কথা মানুষের জানা হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্ব এখন চলে এসেছে দূরদর্শনের ছোট্ট পর্দায়। নবীন ছাত্র-ছাত্রীরা নূতন শিক্ষাঙ্গণে ভর্ত্তি হবার পর এবং ছাত্রাবাসে ঢোকার পর কেমন নির্মমভাবে অগ্রজ বা সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের জুলুমের শিকার হয় তা অনেকেরই জানা আছে। তাঁই ঘর ছেড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নূতন পরিবেশে নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুরু দুরু বুকে ঢুকে। রিগিং বা জুলুমের মাত্রা সহ্য না করতে পেরে অনেকে উচ্চ শিক্ষা কিংবা উচ্চ কারিগরি শিক্ষার অঙ্গণ থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। শান্তনু আর সত্যবতী প্রথম বর্ষে কলা বিভাগে ভর্ত্তি হবার পর অগ্রজ ছাত্র-ছাত্রীদের একজন যার নাম পারমিতা তাদের নাম জেনে বললো বাঃ, তোমাদের নাম তো মহাভারতের বিখ্যাত কুরুবংশীয় রাজা শান্তনু আর তার স্ত্রী সত্যবতীর নাম অনুসারে রাখা হয়েছে। তোমাদের মায়েরা কি দু'জনে সখী ছিলেন ? নাকি তোমাদের দু'জনের বাড়ী এক পাড়ায় অবস্থিত ?

কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেককেই বিভিন্ন কারণে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সেই ছাত্রীটিরও শান্তনু ও সত্যবতীর কাহিনী জানা আছে। হয়তো ঠাকুমা কিংবা দিদিমার মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনেছে। সিনিয়রদের এক ছাত্র পারমিতাকে জিজ্ঞেস করলো — তুমি শান্তনু আর সত্যবতীর নাম কেমন করে জানলে ?

— বাঃ দূরদর্শনে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী প্রতি রবিবার সকাল ও রাতে কতবার দেখিয়েছে। রামানন্দ সাগর আর চোপরা মশায় বিরাট উপকার করেছেন হিন্দু সমাজের।

— আমি ঐসব পৌরাণিক কাহিনী পড়তে কিংবা দূরদর্শনের পর্দায় দেখা পছন্দ করি না। নূতন কত কি জানার আছে।

— আমার ভালই লাগে। এখন আধুনিক লেখকরা এমন সুন্দর কাহিনী কল্পনায় আনতে পারছেন না। যা হউক, আমাদের নবীন শান্তনু ও সত্যবতীর নিশ্চয়ই মহাভারতের শান্তনু ও সত্যবতীর কাহিনী জানা আছে। কি বলো তোমরা ?

শান্তনু ও সত্যবতী নামে যে ঐতিহাসিক চরিত্র রয়েছে তা দু'জনের কারুরই জানা নেই। তারা অকপটে সে কথা পারমিতাদের জানালো। পারমিতা বললো— কাল যখন কলেজে আসবে তখন শান্তনু আর সত্যবতীর কাহিনী আমাদের শোনাতে হবে। না হলে দু'জনেরই কপালে দুঃখ আছে।

ত্রিপুরায় অবাঞ্ছিত অনেক বই এর বোঝা ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপানো হয়েছে। এতে কিছু প্রকাশক বই প্রকাশ ও বিক্রি করে ভাল লাভ করছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা সে যেকোন বিভাগেরই হউক খেলা-ধূলা কিংবা গল্পের বই পড়ার সময় পাচ্ছে না। এমন ঘটনাই ঘটেছে শান্তনু এবং সত্যবতীর ক্ষেত্রে। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্র পড়ার চেয়ে এখন আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন নেতার চরিত্র পড়তে ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্য করা হচ্ছে। তারাও সে দলেরই ছাত্র-ছাত্রী।

শান্তনু ও সত্যবতী বাড়ী গিয়ে পরিজনদের কাছ থেকে শান্তনু ও সত্যবতীর কাহিনী জেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। বাড়ীর পরিজনরা এই কথা শুনে পারমিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। মেয়েটি নিশ্চয়ই ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভাল বাসে। না হলে শান্তনুদের অন্য কায়দায় হেনস্তা করার ব্যবস্থা করতো। শান্তনু আর সত্যবতী কলেজের হলঘরে পারমিতা ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর কাছে শান্তনু ও সত্যবতীর কাহিনী শুনিয়েছে। প্রথম শান্তনুর পালা ছিল। শান্তনু তাদের সংক্ষেপে মহারাজ শান্তনুর কাহিনী শুনিয়েছে। গরু চুরির অপরাধে স্বর্গের অষ্ট বসুদের মানব কুলে জন্ম নিতে হয়েছিল। কেমন করে অষ্টবসু শাপ থেকে পরিত্রাণ পাবেন সে কথা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞেস করলেন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ জানালেন — যদি গঙ্গা দেবী তাদের জন্ম দিতে রাজী হয় তা হলে গঙ্গাদেবী সাত বসুকে জন্মের পরই গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারবেন। অষ্টম বসুকে দীর্ঘকাল মানবকুলে থাকতে হবে। পাপের ফল ভোগ করতে হবে।

অষ্টবসু দেবী গঙ্গাকে ধরলেন তাদের মা হবার জন্য। গঙ্গাদেবী রাজী হলেন, ঠিক করলেন অংশরূপে তিনি কোন রাজাকে বিয়ে করবেন। কাকে বিয়ে করতে পারেন ? মনে হলো কুরুবংশীয় রাজা শান্তনুর কথা। তিনি মহা পূণ্যবাণ। দেবী গঙ্গা নিজের শরীর থেকে এক অ পরূপা কুমারী কন্যার সৃষ্টি করলেন।

একদিন গঙ্গাতীরে মহারাজ শান্তনু যখন ভ্রমণ করছিলেন তখন সেই কন্যা রাজাকে দর্শন দিলেন। মহারাজ শান্তনু অপরূপা দেবীর রূপে মুগ্ধ হলেন। তার নাম জিজ্ঞেস করলেন, কন্যাটি জানালেন তার নাম গঙ্গা। মহারাজ শান্তনু গঙ্গা দেবীকে বললেন — তিনি কুরু রাজ। এখনো বিয়ে করেন নি। গঙ্গা দেবী কি তাকে বিয়ে করতে রাজী আছেন? গঙ্গা দেবী বললেন তিনি মহারাজের প্রস্তাবে রাজী আছেন। তবে একটি শর্ত আছে। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন — কি সেই শর্ত? গঙ্গা দেবী বললেন — মহারাজ তাঁর কোন ইচ্ছেতেই বাঁধা দিতে পারবেন না। যদি বাঁধা দেন তা হলে তিনি এক মুহূর্তও মহারাজের সঙ্গে থাকবেন

না। মহারাজ রাজী হলেন । গঙ্গার সঙ্গে মহারাজ শান্তনুর বিয়ে হলো। তারপর একে একে এক একজন বসু গঙ্গার ঘরে জন্ম নিলেন । জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদেবী সদ্যজাত শিশুকে গঙ্গায় এনে বিসর্জন দিতে লাগলেন । প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা গঙ্গাদেবীকে বাঁধা দিতে পারলেন না। অষ্টম সন্তানকে যখন গঙ্গায় বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন তখন শান্তনু গঙ্গাকে বাঁধা দিলেন।' গঙ্গাদেবী সদ্যজাত শিশুকে রাজার কোলে তুলে দিয়ে গঙ্গায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন । সেই অষ্টম সন্তানই হচ্ছে মহাভারত খ্যাত ভারত বিখ্যাত বীর মহাবীর ভীষ্ম।

ছাত্রীটির সঙ্গে আরো চার পাঁচজন সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রী ছিঁলো। এবার সত্যবতীর পালা । সত্যবতী কেশে গলা পরিষ্কার করে বললো — মহারাজ শান্তনুর রাজ্যের মধ্যে একদল ধীবরের বাস ছিলো। সেই ধীবর গ্রামের সর্দারকে ধীবরগণ রাজা বলে ডাকতেন ।

চেদি রাজ্যের রাজা উপরিচর বসু একবার শিকারে যাবার পর তার প্রধান মহিষী গিরিকা এক কবুতরকে দূত করে খবর পাঠালেন যে তিনি ঋতুবতী হয়েছেন; মহারাজ যেন তার ঋতু রক্ষার ব্যবস্থা করেন। মহারাজ কবুতর মারফত মহারাণীর চিঠি পেয়ে পরদিন সযত্নে নিজ বীর্য প্যাকেট করে এক বাজ পাখীর মাধ্যমে মহারাণীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাজ যখন যমুনানদীর উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন আর এক বাজপাখী সেই বাজকে আক্রমণ করলো । বাজের কাছে রক্ষিত মহারাজের বীযের্র প্যাকেটটি পড়ে গেলো নদীতে । ব্রাহ্মণের অভিশাপে এক বিশাল বোয়াল মাছ রূপী অপ্সরা ইদ্রিকা প্যাকেট সহ সেই বীর্য খেয়ে ফেললো। সেই বীর্য থেকে এক পুত্র ও এককন্যা বোয়াল মাছের পেটে বড় হতে থাকলো । একদিন ধীবর রাজের জালে সেই বোয়াল মাছ ধরা পড়লো । মাছের পেট চিড়তেই এক অপূর্ব সুন্দরী শিশু কন্যা ও এক অপূর্ব সুন্দর শিশু পুত্র বেরিয়ে এলো। শিশুদুটি জীবিত । ধীবররাজ সেই শিশু কন্যা ও পুত্রটিকে কাপড়ে মুড়িয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন ।এমন অদ্ভুত উপায়ে পাওয়া শিশুদুটি অভিশপ্ত কোন দেব-দেবী মনে করে ধীবর পাড়ার সকলেই সযত্নে এবং সংপ্রেমে তাদের বড় করে তুলতে লাগলো। রাজা উপরিচর বসু খবর পেয়ে ছুটে এলেন। পুত্রটিকে নিয়ে গিয়ে পুত্র রূপে পালন করতে লাগলেন। সেই পুত্রটি মৎস্যরাজ নামে জগতে পরিচিত হলেন। এক সময় সেই কন্যাটি যুবতী হলো । তার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু, মেয়েটির গায়ে উৎকট মাছের গন্ধ থাকায় কোন যুবকই তাকে বিয়ে করতে রাজী হলো না। সেই মেয়েটির নাম রাখা হলো মৎস্যগন্ধা ।

ধীবররাজ মাছ ধরার পাশাপাশি মাঝির কাজ করতেন। একদিন তিনি অসুস্থ হলেন । তার মেয়ে মৎস্যগন্ধা খেয়ায় মাঝির কাজ করতে গেলেন। ধীবর রাজের আর কোন সন্তান ছিলনা। এমন সময় খেয়া ঘাটে এক ঋষি এলেন। একপরমা সুন্দরী কন্যাকে যাত্রী পারাপারের কাজ করতে দেখে বিস্মিত হলেন। তার অপরূপ রূপ দেখে ভাবলেন এ কন্যা কখনো ধীবরের কন্যা হতে পারে না। তিনি কন্যার জন্ম পরিচয় জানতে চাইলেন ।

মৎস্যগন্ধা সব বললেন। সেই ঋষি ছিলেন তিনলোকে বিখ্যাত। নাম পরাশর ঋষি। তিনি কন্যার কাছে রতি প্রার্থনা করলেন। কন্যা বললেন — তিনি কুমারী। ঋষির সঙ্গে রতি ক্রিয়া করলে অবশ্যই তিনি মা হবেন। সেই পুত্রও পিতার পরিচয় থেকে বঞ্চিত হবে. দ্বিতীয়ত তার গায়ে উৎকট মাছের গন্ধ। এই পরিস্থিতিতে ঋষি তার সঙ্গে রতিক্রিয়া করে আনন্দ লাভ করবেন না। এখন ঋষি যা ভাল মনে করেন তাই করুন।

পরাশর ঋষি বললেন — মৎস্যগন্ধা তার স্পর্শ পাওয়া মাত্রই তার গায়ে পদ্মগন্ধ বের হতে থাকবে। সে জগতে পদ্মগন্ধা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করবে। সে যে সন্তানের জন্ম দেবে সে তিনলোকে খ্যাত হবে। সন্তানের জননী হয়েও সে কুমারী সদৃশ্য থাকবে এবং রাজরাণী হয়ে সুখে বাকী জীবন কাটাবে।

মৎস্যগন্ধা ঋষির কথায় খুব আনন্দিত হলেন। তিনি এক নির্জন দ্বিপে গিয়ে ঋষির সঙ্গে রতিক্রিয়ায় মিলিত হলেন। ক্রমে তার এক পুত্রের জন্ম হলো। দ্বীপে জন্ম হলো বলে তার নাম হলো দ্বৈপায়ণ। আর কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় তার নাম হলো কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ঋষিই হলেন ভবিষ্যতের মহাকবি ব্যাস দেব।

রাজা শান্তনু স্ত্রী গঙ্গাকে হারিয়ে গঙ্গার বিরহে উন্মাদের মতো ঘুরতে ঘুরতে ধীবর গ্রামে এসে পদ্মগান্ধার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। পদ্মগন্ধা সব ঘটনা রাজা শান্তনুকে বললেন। রাজা শান্তনু ধীবর কন্যার সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হলেন। তার নামাকরণ করলেন সত্যবতী।

প্রথমবর্ষে ভর্ত্তি হবার পর অগ্রজ ছাত্র-ছাত্রীদের জুলুমের শিকার হবার ভয়ে শান্তনু ও সত্যবতী মহাভারতের ঐ দুই মহান চরিত্র সম্পর্কে তাদের ঠাকুমা ও দিদিমার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল। ভীষ্ম মা সত্যবতীকে কথা দিয়েছিলেন তিনি নিজে কখনো বিয়ে করবেন না। রাজা হবার চেষ্টা করবেন না। সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তান রাজা হলে তার সুরক্ষায় নিজে ব্যস্ত থাকবেন। ভীষ্ম তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। সত্যবতী ক্রমে দুই ছেলের জন্ম দেন। একজনের নাম বিচিত্রবীর্য আর ছোট ছেলের নাম চিত্ররথ।

বিচিত্রবীর্য বড়। তাই মহারাজ শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসালেন। তার জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করতে করতে এক স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলেন। সেখানে তিন রাজকন্যা অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকা নামক তিন বোনের স্বয়ম্বর সভা চলছিল। ভীষ্ম ঐ তিন কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে তুলে নিয়ে আসেন। অন্য রাজগণ তাকে বাঁধা দিতে গিয়ে যুদ্ধে পরাজিত হন। তিন রাজকন্যার মধ্যে একজন অম্বা জানালেন যে তিনি মহারাজ শাল্বকে মনে মনে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে কথা শুনে ভীষ্ম সেই কন্যাকে ত্যাগ করেন। সেই কন্যা ফিরে এসে শাল্বকে সে কথা জানালেন। শাল্ব তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেন। তখন অপমানে, ক্রোধে সেই রাজকন্যা অম্বা পরজন্মে জন্মগ্রহণ করে ভীষ্মকে বধ করার সংকল্প নিয়ে কাম্যক কুপে আত্মহত্যা করেন। সেই কন্যাই

পরবর্তীকালে মহারাজ দ্রুপদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নপুংসক রূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মহারাজ দ্রুপদ সেই নপুংসক সন্তানের নাম রাখেন শিখণ্ডী। যুদ্ধের দশম দিনে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মহাবীর অর্জুন তাঁর রথে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। মহাবীর ভীষ্ম শিখণ্ডীর প্রতি একটি তীরও নিক্ষেপ করেন নি। শিখণ্ডীর শতবানে দিনের শেষে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন। তাই তিনি উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন।'

কমলাসাগর কালী মন্দিরে দু'বার মেলা হয়। একটি বৈশাখ মাসে অমাবস্যায়। অপরটি ভাদ্রমাসে অমাবস্যায়। বৈশাখ মাসে কমলাসাগর দীঘি মা কালীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন মহারাজ ধন্য মাণিক্য। তখনো মন্দিরে শিলা পূজো হতো। সেই শিলারূপী কালী ছিলেন খুবই জাগ্রত। বহু ভক্ত মায়ের কাছে প্রার্থনা করে সন্তান, ধন, হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছেন।

পরবর্তীকালে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সেই শিলা থেকেই কালীর বিগ্রহ তৈরূ করিয়ে মন্দির পাকা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা যশোধর মাণিক্যের সময়ে মুসলমান আক্রমণ হয়। দেবীর বিগ্রহ দীঘির জলে লুকিয়ে রাখা হয়। যুদ্ধ শেষে সেনাপতি কল্যাণদেব যখন ত্রিপুরার রাজা হলেন তখন দীঘির জলে বহু খোঁজাখুঁজি করেও দেবীর বিগ্রহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য এটাকে দেবীর ইচ্ছে বলে ধরে নিয়ে ঐ মন্দিরে আর নূতন বিগ্রহ স্থাপন করেন নি। পুনরায় মাটির বিগ্রহ পূজা শুরু হয়। তারপর মহারাজ দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য স্বপ্নাদেশ পেয়ে ধর্মনগর থেকে বর্তমান বিগ্রহ আনিয়ে মন্দির সংস্কার করে ভাদ্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

সত্যবতী বললো, শান্তনু তুমিতো ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছো। সংক্ষেপে কসবার কালী এবং ত্রিপুরা সুন্দরী সম্পর্কে কিছু বলো। শুনেছি দেশ ভাগের আগে বৈশাখ ও ভাদ্রমাসে মায়ের মন্দিরে লক্ষ লোকের সমাবেশ হতো।— তুমি ঠিকই শুনেছ। পার্বত্য ত্রিপুরার মন্দির সমুহের মধ্যে কসবা কালীবাড়ী সমতল ও পার্বত্য ত্রিপুরার সন্ধিস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বর্তমান বাংলাদেশ তথা চাকলা ও রোশনাবাদ এলাকার হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ মানুষ কসবা কালী মন্দিরে আসতেন। পূর্বের চাক্‌লা রোশনাবাদ ত্রিপুরার মধ্যে থাকলে ত্রিপুরা এতদিনে পূর্বাঞ্চলের অন্যতম সমৃদ্ধশালী রাজ্যে পরিণত হতো।

—সত্যবতী, মহারাজ ধন্যমাণিক্য মহারাণী কমলা দেবীর অনুরোধে এই দীঘি খনন করিয়েছিলেন। দীঘিটি উৎসর্গ করা হয়েছিল দেবী কালীর নামে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে। তারপর কয়েকবার এই স্থানে অবস্থিত অন্যতম প্রধানগড় বলে পরিচিত কৈলাগড়ে মুসলমান আক্রমণ ঘটেছে। অধিকাংশ সময়েই ত্রিপুর বাহিনীর পরাজয় হয়েছে। ত্রিপুরার মন্দির ধ্বংস হয়েছে। আবার মন্দির গড়ে উঠেছে। রাজমালার তৃতীয় লহরের রত্নমাণিক্য খণ্ডে কসবা কালীর বিগ্রহ সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় — মহারাজ ২য় রত্ন মাণিক্যেকে

একরাতে দেবী কালী স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাজাকে জানালেন যে ধর্মনগর মহকুমার কাসীম নগরে এক ব্রাহ্মণের ঘরে দেবী কালী পূজিত হচ্ছেন। ব্রাহ্মণের পূজায় দেবী সন্তুষ্ট নন। মহারাজ রত্নমাণিক্য (২য়) যেন তাঁকে এনে স্থাপন করে পূজার ব্যবস্থা করেন।

মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে মহারাজ রত্নমাণিক্য প্রথমেই কল্যাণ মাণিক্য কর্তৃক নির্মিত পাকা মন্দিরটির সংস্কার সাধন করেন। পরে সেনাপতি বলিভীম দ্বারা বিগ্রহ আনিয়ে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে বিগ্রহটি কালো দেখালেও কষ্টি পাথরের তৈরী নয়। বেলে পাথরের তৈরী। দীর্ঘকাল তৈল ও ঘি মাখানোর ফলে বেলে পাথর কালো রঙ ধারণ করেছে। মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে ১ মিটার ৭২ সেন্টিমিটার। প্রস্থে ৬৩ সেন্টিমিটার। মূর্ত্তিটির পেছনে চালা নেই এবং বিগ্রহ অলংকার শূন্য। ভক্তদের দানে দেবীর চোখ ও জিহ্বা সোনা ও রূপায় তৈরী হয়েছে।

দেবী ডান পা মহিষাসুরের দেহে স্থাপন করেছেন এবং বাঁ পা মহিষাসুরের মাথায় স্থাপন করেছেন। দেবী তৃতীয় নয়না এবং দশভূজা। মহিষাসুর অঞ্জলী বদ্ধ। মায়ের কৃপা প্রার্থী। মহিষাসুরের বাম দিকে ভদ্রপীঠের উপর মহিষের কাটামুণ্ডু খোদিত রয়েছে। ভদ্রপীঠের উপরে মহিষাসুরের দুই উরুর মাঝখানে রয়েছে ছোট্ট একটি শিবলিঙ্গ। মূর্ত্তিটি কালীর না দশভূজা দুর্গার এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এমন দু-তিনটি বিগ্রহের কথা জানা যায়। ঐসব স্থানে ঐসব বিগ্রহ মহিষাসুর মর্দিনী রূপেই পূজিতা হচ্ছেন। স্কন্দ পুরাণের বর্ণনা অনুসারে শিবপার্বতীর বিয়ের পর একদিন শিব সন্ধ্যার সময় দেবী সন্ধ্যার স্তব করছিলেন। শিবের স্তব শুনামাত্রই দেবী সন্ধ্যা শিবের সামনে এসে উপস্থিত হন। শ্যামবর্ণা পরমাসুন্দরী কন্যাকে শিবের সামনে দেখে দেবী পার্বতী ভাবলেন শিব বোধহয় ঐ দেবীর প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। দেবী পার্বতী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে শিবকে ত্যাগ করে কৈলাশ পাহাড়েগিয়ে পরম ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হলেন।

মহিষাসুর ঘুরতে ঘুরতে সে স্থানে এসে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে দেবীকে বিয়ে করতে চাইলেন। দেবী রাজী হলেন না। বলপূর্বক দেবীকে বিয়ে করতে চাইলে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। মহিষাসুর বধ হলো। দেবী মহিষাসুরকে বধ করে স্নান করে পুনরায় তপস্যা করার জন্য ধ্যানে বসার উদ্যোগ নিতে গিয়ে দেখেন মহিষাসুরের কাটা কাঁধের উপর এক শিব লিঙ্গ বিরাজমান। শিবের পরম ভক্ত এবং অংশ স্বরূপ বলেই এমনটা হয়েছে বলে দেবী মনে করলেন।

মহিষাসুরের মৃত্যুতে বিপদমুক্ত দেবসমাজ দেবীকে পূজো করতে এলে দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের আরাধনা করার জন্যও দেবতাদের বললেন। স্কন্দ পুরাণের ঐ কাহিনীর সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী ভগবতী কর্তৃক মহিষাসুর বধের অনেকটাই মিল রয়েছে। পুরোহিতগণ দেবীর পদতলে শিব লিঙ্গ থাকায় দেবীকে কালী বলেই অভিহিত করেছেন। এই মায়ের প্রায় শত বছর আগের এক লীলার কথা বলে দেবীর কথা শেষ করবো।

কমলা সাগরের কয়েক কিঃমিঃ দূরে বর্তমান বাংলাদেশের খেউড়া গ্রামের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নাম বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য। বৈশাখ ও ভাদ্র মাসের মেলায় বিপিন বাবুর মা এই কালীবাড়ী আসতেন। মেলায় দুর দূর থেকে বিভিন্ন ধরণের পসরা নিয়ে বহু ব্যবসায়ীও ঐ দুই মেলায় আসতেন। বিপিন বাবুর ঘরে চারটি সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল। স্বল্পকালীন সময়ের পর সকলেই অকালে মারা গেছেন। বিপিন বিহারী ছিলেন বংশের একমাত্র পুরুষ। বংশ লোপ পাবার আশংকায় একটি সন্তানের জন্য বিপিন বাবুর মা দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতেন। মেলায় মায়ের মন্দিরে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। মায়ের কাছে শান্তভাবে প্রার্থনা জানানো যায় না। বিপিন বাবুর মা একদিন বিশেষ তিথি উপলক্ষে মন্দিরে মায়ের কাছে একটি পুত্রের কামনায় আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক পড়শিসহ তিনি মায়ের কাছে বিপিনের জন্য একটি পুত্র সন্তান কামনায় মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতে গিয়ে বললেন— মা, বিপিনকে একটি কন্যা সন্তান উপহার দাও।

প্রার্থনা জানিয়ে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। মেয়ে সন্তান হলে বংশ রক্ষা হবে না। বাড়ী এসে ছেলে ও ছেলের বউকে সে কথা জানালেন। বিপিন বললেন— মা, এই ঘরে ছেলে কিংবা মেয়ে যেই আসুক সে যেন দীর্ঘজীবি হয় মায়ের কাছে সেই প্রার্থনা রাখুন। রাত্রিতে দেবী কালী বিপিনের মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন— তোমাদের ঘরে আমি আসবো। তোমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে। বংশের নাম অমর হয়ে যাবে।

দশ মাস পর তাদের ঘরে অংশ রূপে আবির্ভূত হলেন মা কালী। বিপিনের পরিবার জানতেন এই কন্যা একদিন বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কেমন করে তা কেউ জানতেন না। সেই কন্যাই পরবর্তীকালে ভারত বিখ্যাত সাধিকা আনন্দময়ী মা রূপে পরিচিতা হয়েছেন। মায়ের মন্দিরে নিত্য প্রার্থনা নিয়ে যারা এসেছেন, যাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে তাদের সংখ্যা কেউ বলে শেষ করতে পারবে না।

ত্রিপুরা সরকার মায়ের এই সুন্দর ও সুগভীর দীঘিটিকে শ্রীহীন করে ফেলেছে। এই দীঘিতে সব সময় পঁচিশ ত্রিশফুট জল থাকতো। বুনো হাঁসেরা সব সময় দীঘির জলে খেলা করতো। দীঘির জল কমিয়ে দীঘির ভেতরে বনভোজনের স্থান করে দেওয়ায় দীঘির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। মায়ের মন্দিরকে যেভাবে সুন্দর করা হয়েছে দীঘির ছবিটিও আগের মতো থাকলে অপূর্ব মনে হতো।

—সত্যবতী, ত্রিপুরেশ্বরী বিগ্রহ ও মন্দির সম্পর্কে যে তথ্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে আমরা সবাই জানতে পেরেছি দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহ মহারাজ ধন্য মাণিক্যের প্রধান সেনাপতি রায় কচাক্ চট্টগ্রাম পাহাড় থেকে নিয়ে এসেছিলেন। রাজমালার ধন্য মাণিক্য খণ্ডে কালীপ্রসন্ন সেন মহোদয় পয়ার ছন্দে দেবীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে লেখা হয়েছে—

চট্টগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আছি আমি আমার প্রকট।
সেই স্থান হতে আনি রাজা এইমঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর সেই মতে ভজ।।

আরাকান রাজার সঙ্গে ত্রিপুরার যুদ্ধ শুরু হবার কয়েক মাস পরও ত্রিপুর বাহিনী জয়ের কোন সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না। ত্রিপুর বাসিনী হতাশ হয়ে পড়লেন। ত্রিপুর বাহিনী যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন তার সামান্য দূরে পর্বতের উপর এক দেবী রয়েছেন। রায় কচাক্ ঠিক করলেন পরদিন যুদ্ধে যাওয়ার আগে সেই দেবীর পুজো দিয়ে তারপর যুদ্ধে যাবেন। রাতে রায় কচাক্‌কে দেবী কালী স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন— দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধে গেলে ত্রিপুর বাহিনীর মঙ্গল হবে।

রায় কচাক্ পরদিন ভোরে ছাগ বলি দিয়ে দেবীর পুজো করলেন তারপর যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধে ত্রিপুর বাহিনী সাফল্য পেলো। আরাকানের রাজা সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। দেবীর কৃপাতেই ত্রিপুর বাহিনী সাফল্য পেয়েছে সে কথা বুঝতে পেরে রায় কচাক্ ঠিক করলেন দেবীকে সেই পাহাড় থেকে রাজধানী রাঙ্গামাটিতে নিয়ে আসবেন। মহারাজের অনুমতি চেয়ে মহারাজের কাছে দুত পাঠালেন। দুত রাজধানীতে আসার আগে দেবী ত্রিপুরেশ্বরী মহারাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চন্দ্রপুরে ভগবান বিষ্ণুর জন্য নির্মিত মঠে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দিলেন। পরদিন রায় কচাকের পাঠানো দূতের কাছ থেকে দেবীর মাহাত্মের কথা শুনে ভগবান বিষ্ণুর জন্য নির্মিক মঠেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ধন্যমাণিক্য যদি জানতেন সেখানে দেবী সতীর দক্ষিণ পাদ রাঙ্গামাটির চন্দ্রপুর নামক কুর্মাকৃতি টিলার উপর পড়েছে তাহলে তিনি রাজগুরুর পরামর্শ অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর জন্য মন্দির তৈরী করাতেন না। স্থানটি মন্দির তৈরীর এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রীয় বিচারে উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছিল। ঐ উঁচুভূমির পশ্চিমে অবস্থিত ছিল বিশাল শুক সাগর। শুক সাগরে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের নৌবাহিনী সর্বদা পাহাড়ায় নিযুক্ত থাকতো। পূর্ব ও দক্ষিণে বনবাসীদের বাসস্থান। গভীর জঙ্গল এবং উঁচু নীচু পাহাড়। মন্দির নির্মাণের আগে অন্য কোন দেব-দেবী সেই টিলার উপর পূজিত হলে ভগবান বিষ্ণুর জন্য মন্দির নির্মাণ করতেন না। ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি বাইরে থেকে আনিয়ে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ার সময়েই দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপা ত্রিপুরার উপর পড়েছিল। রাজার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে সেনাপতি রায় কচাক্ আরাকান রাজের সম্মতি নিয়ে দেবীর পূজকসহ ১৫০১ খৃঃ মহা ধুমধাম সহকারে দেবীর বিগ্রহ উদয়পুর নিয়ে আসেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য সেই বিগ্রহ বিষ্ণু মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫০১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো বছরে দেবী ত্রিপুরেশ্বরী বহু বিপদের হাত থেকে ত্রিপুরাবাসীকে রক্ষা করেছেন। শাস্ত্রমতে যে স্থানে লক্ষ বলি হয় সে স্থান সিদ্ধ

শক্তিপীঠ হিসেবে গণ্য হয়। সে হিসেব করলে ত্রিপুরার দেবী ত্রিপুরেরশ্বরীর স্থান সিদ্ধ শক্তিপীঠ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেবী সতীর দেহ ত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগে। ডুম্বুরু ফা রাঙ্গামাটিদখলের আগে সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরাতেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। সতীপীঠ থাকলেও তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিতগণ পীঠ তন্ত্রমালা, কুব্জিকা তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের সূত্র ধরে উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের স্থানটিকে সতীপীঠ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ও বিগ্রহ রয়েছে। আমাদের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা নামের উদ্ভব মহারাজ ত্রিপুর থেকে হয়েছে। মহারাজ ত্রিপুর ছিলেন মহারাজ দৈত্যের পুত্র। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে ত্রিপুর রাজগণের পরিচয়। চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির উত্তর পুরুষ মহারাজ ত্রিপুর।

ত্রিপুরা বর্তমান আসামের বরবক্র বা বরাক নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ছিল। সেখানে দীর্ঘকাল ত্রিপুর রাজবংশ রাজত্ব করেছেন। মহারাজ ত্রিপুর খুব অত্যাচারী ছিলেন। প্রজার কল্যাণে প্রজাদের আকুল প্রার্থনায় ভগবান শিব ত্রিপুরকে বধ করেন। তখন ত্রিপুরার মহারাণী হীরাবতী অন্তঃসত্বা ছিলেন। শিব মহারাণীকে বর দিলেন তারগর্ভে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সে পরম শিবভক্ত ও প্রজানুরঞ্জক হবে। শিবের বরে মহারাণীর গর্ভে পরম শিবভক্ত, প্রজানুরঞ্জক মহারাজ ত্রিলোচন জন্মগ্রহণ করেন।

মহারাজ ত্রিলোচন হেরম্ব রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। হেরম্বরাজ অপুত্রক ছিলেন। হেরম্বরাজ কন্যার প্রথম সন্তানকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং হেরম্ব রাজ্যের সিংহাসন দান করেন। হেরম্বরাজ দৃক্ পতির সঙ্গে ত্রিপুররাজ দাক্ষিণের মনোমালিন্য এবং সংঘর্ষ হয়। ত্রিপুররাজ দাক্ষিণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজধানী বরাক উপত্যকা থেকে খলংমা নামক স্থানে নিয়ে আসেন। তারপর রাজা প্রতীত আরো দক্ষিণে ধর্মনগরে এবং ক্রমান্বয়ে রাজা ছেংথুংফার সময়ে ছাম্বুল নগরে এবং রাজা ডুম্বুর ফার সময়ে রাজধানী রাঙ্গামাটিতে স্থাপিত হয়। রাঙ্গামাটিতে প্রায় পাঁচশো বছর ত্রিপুররাজগণ রাজত্ব করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য রাজধানী পুরাণ হাভেলীতে নিয়ে আসেন। মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য ১৮৩৮খৃঃ রাজধানী স্থাপন করেন বর্তমান আগরতলায়। মা ত্রিপুরেশ্বরী চট্টেশ্বরী পাহাড়ে কোথা থেকে এসেছিলেন কি নামে তিনি পূজিত হতেন সে ইতিহাস অজানা। মুসলমান শাসকদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু বিদ্বেষী। হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহ এবং মন্দির ধ্বংসকারী। দেবী এক সময় হয়তো কোন বিখ্যাত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। যে একান্ন পীঠের পরিচয় পাওয়া যায় সেই ৫১ পীঠের কয়েকটিতে দেবীর বিগ্রহ নেই। শুধুমাত্র বেদী রয়েছে। ঐ সব পীঠস্থানের বিগ্রহ হয় ধ্বংস করা হয়েছে না হয়তো ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে বিগ্রহ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কসবার বর্তমান বিগ্রহও তেমনি কোন পীঠস্থানের দেবী ছিলেন কিনা কে জানে। এই বিগ্রহ সাধারণ এক ব্রাহ্মণের ঘরে কেমন করে এসেছিলো তার ইতিহাসতো আমাদের কারো জানা নেই।

ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরী বিগ্রহ কষ্টিক পাথরের। উচ্চতা ১ মিটার, ৫৭ সেন্টিমিটার। প্রস্থ ৬৪ সেন্টিমিটার। ধন্যমাণিক্যের গুরুদেব দেবীর সামনে পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবী চতুর্ভূজা। ডানদিকের উপরের হাতে বরমুদ্রা। ডান দিকের নীচের হাতে অভয় মুদ্রা। বাঁ দিকের উপরের হাতে খড়্গ। বাম দিকের নীচের হাতে অসুরমুণ্ড। গলায় ১৩টি নরমুন্ডের মালা।

তন্ত্রসার গ্রন্থে দেবী কালীর বিভিন্ন রূপের এবং ধ্যানের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে উদয়পুর মাতা বাড়ীতে ধন্যমাণিক্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবীকে কালী বলেই অভিহিত করা যায়। তন্ত্রসার গ্রন্থ অনুযায়ী দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী চতুর্ভূজা হলেও গোধাসনা। ডান দিকের উপরের হাতে অভয়মুদ্রা, নীচের হাতে বরমুদ্রা, বা দিকের উপরের হাতে পাশ এবং নীচের হাতে অঙ্কুশ। ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী দ্বিভূজা। শিব ও শক্তির যুগল বিগ্রহ। মাকে শিবকালী মূর্ত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেবীর এক হাতে বই। অন্য হাতে তথা ডান হাতে জপ মালা। ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী দ্বিভূজা। শিবের কোলে উপবিষ্টা। শিব উলঙ্গ অবস্থাতে বাঁ হাতে দেবীর কাঁধ ধরে রেখেছেন। দেবী কালী ও বিবসনা। অনেকে দেবী কালী ও শিবের এই রূপকে হর-পার্বতীর রতিক্রিয়ার রূপ বলে অভিহিত করেছেন। দেবীর নামকরণ নিয়েও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। তবে গত পাঁচশো বছর ধরে উদয়পুরের দেবী ত্রিপুরেশ্বরী নামে অভিহিতা হয়ে আসছেন। ঐ সময়ের মধ্যে বহু ভক্ত মায়ের বিভিন্ন লীলা প্রতক্ষ্য করে জীবন ধন্য করেছেন।

ধন্যমাণিক্য কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার পর অনেকবার মন্দির সংস্কার করা হয়েছে। অমর মাণিক্যের সময়ে আরাকানরাজ কর্তৃক উদয়পুর অধিকৃত হবার পর মন্দির থেকে বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে মায়ের আশ্রমের এক সেবকের ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আর একবার প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মন্দিরের প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়ায় পূজারীর পরামর্শে বিগ্রহ মন্দির থেকে সরিয়ে নিয়ে মায়ের আশ্রমেই বেশ কয়েকবছর পূজিতা হয়েছিলেন। মন্দিরে বড় বড় বটগাছ জন্মেছিল। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রামদেব মাণিক্য পুরোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী মন্দিরটির আমুল সংস্কার করান এবং ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে দেবীকে পুনরায় ধন্যমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে দেবীকে এনে স্থাপন করা হয়।

দেবী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির যারা সংস্কার করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন উদয় মাণিক্যের সেনাপতি রনাগণ। অমর মাণিক্যের পৌত্র যশোধর মাণিক্য, মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য, মহারাণী সুমিত্রা জগদীশ্বরী, রামদেব মাণিক্য। মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্য। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য মেয়ের অনুরোধে দেবীর মন্দিরের পূর্ব-উত্তর কোণে এক বিশাল দীঘি খনন করান। ঐ দীঘি দৈর্ঘ্যে ২২৪ গজ এবং প্রস্থে ১১৬ গজ। সেই দীঘি কল্যাণ সাগর নামে পরিচিত।

দীঘির পূর্বদিকে ছিলো বিশাল ফুলের বাগান। মায়ের মন্দিরের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ পূর্ব এলাকা নিয়ে ছিলো বিশাল আশ্রম। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সময়েই মহন্ত রামানন্দ

সরস্বতী আশ্রমের মহন্ত হয়েছিলেন। তার নির্দেশেই পূজা পার্বণ সম্পন্ন হতো। তিনিই গদাধর পাণ্ডাকে প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সহকারী পুরোহিতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো রত্নেশ্বর পাণ্ডাকে। রত্নেশ্বর পাণ্ডা তখন কিশোর ছিলেন।

আশ্রম, মন্দির এবং দীঘি মিলিয়ে মা ত্রিপুরেশ্বরীর নামে ভূমির পরিমাণ ছিলো প্রায় ১৬৮ একর। বর্তমানে সব মিলিয়ে প্রায় ১৮ একর ভূমি রয়েছে। বাকী ১৫০ একর ভূমি বেদখল হয়ে গেছে। বেদখলের কাজ শুরু হয়েছিল মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্যের সময় থেকে, আজো তা অব্যাহত রয়েছে। মায়ের ভূসম্পত্তির একটা বড় অংশ মায়ের পূজারীদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়।

মাতাবাড়ীর এক পুরোহিতের কাছ থেকে জানতে পারলাম গদাধব পান্ডার বংশধরগণ এবং রত্নেশ্বর পান্ডার বংশধরগণই বর্তমানেও দেবী পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন। অমর মাণিক্যের পৌত্র তথা রাজধর মাণিক্যের পুত্র যশোধর মাণিক্য মাতা বাড়ীর পুরোহিতদের অনুরোধে তাদের পাণ্ডা উপাধীর পরিবর্তে চক্রবর্ত্তী উপাধী প্রদান করেন।

গদাধর পাণ্ডার বংশধরগণ বাইশ পুরুষে পড়েছে আর রত্নেশ্বর পাণ্ডার বংশধরগণ কুড়ি পুরুষে পড়েছে। তাদের বংশধর ও পরিবারের সংখ্যাও অনেক হয়েছে। দুই পরিবারের বংশধরগণ সারা বছর হিসেব করে পুজোর দিন ঠিক করে নিয়েছে। দুই পরিবারের ভাগেই ছয়মাস করে দিন পড়েছে। বিশেষ তিথিতে দুই পরিবার মিলিতভাবে পূজার কাজ করেন।

মহন্তগণের হাত থেকে মন্দিরের কর্তৃত্ব পুরোপুরি পুরোহিতদের হাতে এসেছিল মহারাজ যশোধর মাণিক্যের সময় কালে। আশ্রমের পরিপূর্ণ রূপটি ধীরে ধীরে পুরোহিতদের সংসারাশ্রমের রূপ গ্রহণ করে। যে সমস্ত মহন্তগণ মায়ের আশ্রমের মহন্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের সকলের নাম যেমন পাওয়া যায় না তেমনি তাদের আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণও জানা যায় না। গবেষকদের অনুমান পুরোহিত এবং মহন্তগণের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিলো। যার পরিণতি ঘটেছে আশ্রমের অবলুপ্তির মাধ্যমে। যে কয়েকজন মহন্তের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন— রামানন্দ সরস্বতী, দয়ানন্দ সরস্বতী, মাধবানন্দ গিরি কেশবানন্দ গিরি, বালকানন্দ গিরি, মথুরা চৈতন্য সরস্বতী, সর্বানন্দ গিরি এবং পরমানন্দ গিরি বা অঘোরী বাবা। মায়ের মন্দিরের পুরোহিতগণ কান্যকুব্জের বা কনৌজের ব্রাহ্মণ।

রায় কচাক্ ছিলেন রিয়াং সম্প্রদায়ের। সে জন্য রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকদের মায়ের মন্দিরে সেবার ভার দেওয়া হয়েছিলো। তাদের জোলা নামে অভিহিত করা হতো। রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে রাজধানী উদয়পুর থেকে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের সময়ে আগরতলায় স্থানান্তরিত হবার পর থেকে মন্দিরে জোলাদের সংখ্যা কমতে থাকে। পুরুষানুক্রমে মায়ের সেবা পূজায় নিযুক্ত জোলাগণ একযোগে বিলোনীয়া মহকুমার জোলাইবাড়ী নামক স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং জুম চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জোলাদের নাম অনুসারে ঐ এলাকা জোলাইবাড়ী নামে পরিচিত লাভ করেছে।

মহন্ত রামানন্দ সরস্বতী মায়ের মন্দিরের আরতির যে সময় স্থির করে দিয়েছিলেন পাঁচশো বছর পরও সেই ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। শীত ও গরম দুইভাবে দিনগুলোকে ভাগ করে শীতের সময়ে অর্থাৎ কার্তিক মাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত সময়ে মায়ের মন্দির খোলা হয় ভোর সাড়ে চারটায়। সন্ধ্যারতি করা হয় সন্ধ্যা ছয়টায়। গরমের সময়ে বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সময়ে ভোর চারটায় মায়ের মন্দির খোলা হয় তারপর আরতি করা হয়। আর কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস সময় কালে মায়ের আরতির ব্যবস্থা করা হয় সন্ধ্যা সাতটায়। মায়ের শয়নারতি সব সময়েই রাত দশটায় করা হয়ে থাকে। দীপাবলী উৎসবের সময় তিনদিন মায়ের মন্দির সারা রাত ভক্তদের দর্শনের জন্য খোলা রাখা হয়।

ভারত ভাগ হবার আগের সময়পর্যন্ত ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরের তুলনায় কসবা কালীমায়ের মন্দিরে ভক্তের সমাগম হতো অনেকগুণ বেশী। বাঙ্গালী হিন্দু ভক্তগণ পূর্ববাংলার বর্তমান বাংলাদেশের দূর দূরান্ত থেকে আসতেন। ভক্তদের সুবিধার কথা ভেবে ইংরেজ সরকার কমলাসাগরে একটি রেলস্টেশন স্থাপন করে দিয়েছিলো। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কমলাসাগরের মায়ের মন্দির প্রায় জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাজধানী আগরতলা থেকে যানবাহনের চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় ভক্তের সংখ্যা সারাদিনে কয়েকজনের বেশী হতো না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাঝে মাঝে কোন কোন ভক্ত পাকিস্তানী সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাকে দর্শন এবং পূজো দিয়ে যেতেন।

রাজ্যের মহকুমাগুলোকে প্রথমে রাজধানীর সঙ্গে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তোলা শুরু হয়। বাঙ্গালী হিন্দুরা ধর্মরক্ষার কারণে ব্যাপক হারে ত্রিপুরায় আসতে শুরু করেন। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মহিমা ভারতব্যাপী প্রচার হতে থাকে। দীপাবলীতে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সন্ন্যাসীগণ আসতে থাকেন। পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে কসবায় ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে।

গত একশত বছরে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে যারা পুরোহিতের কাজ করেছেন তাদের মধ্যে সাধক জয় কুমার চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যৌবনে বহু তীর্থ ঘুরেছেন। মায়ের বাড়ীর এক পুরোহিত জয় কুমার চক্রবর্ত্তীর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে জানালেন যে তীর্থ পরিক্রমার সময় প্রায় এক বছর তিনি কামরূপ কামাক্ষায় ছিলেন, কামরূপ কামাক্ষায় তিনি দেবী কুমারীর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তীর্থ পরিক্রমা শেষে বাড়ী ফিরে আসার পর আবার পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তার দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা সব পুরোহিতেরই জানা আছে। একটি হলো— একবার মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্য আগরতলা থেকে পাত্রমিত্রসহ মায়ের মন্দিরে মাকে দর্শন করতে আসেন। মায়ের ভোগের সময় হয়ে গেছে। পুরোহিত জয়কুমার নির্বিকার ভাবে মন্দিরে বসে রয়েছেন। সহকারী পুরোহিতগণ জয়কুমারকে মায়ের কাছে ভোগ নিবেদনের অনুরোধ জানিয়েও কোন সাড়া পান নি।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য মায়ের মন্দিরে এসেছেন। সিপাই-শান্ত্রী থেকে শুরু করে মায়ের মন্দিরে এবং উদয়পুরে কর্মরত নাজির, দেওয়ান ও কর্মীদের মধ্যে খুব তৎপরতা শুরু হয়েছে। শুধু জয়কুমার একেবারে নির্বিকার।

পুরোহিত জয়কুমার একজন সিদ্ধ পুরুষ একথা মহারাজ শুনেছেন। কিন্তু সেরকম কোন পরিচয় তিনি পাননি। মহারাজ এসেছেন দেখেও জয়কুমারের মনে কোন বিকার না দেখা দেওয়ায় জ্ঞানী-গুণি মহারাজ রাধাকিশোর বুঝতে পারলেন সাধকের মন হয়তো অন্য কোন লীলায় ব্যস্ত রয়েছে। তাই মহারাজের আগমনেও সাধকের মন মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। তিনি সাধককে পরখ করে দেখার জন্য জিজ্ঞেস করলেন— পুরোহিত মশায়, মায়ের দুপুরের ভোগের সময় বয়ে যাচ্ছে আপনি মায়ের কাছে ভোগ নিবেদন করছেন না কেন ?

মহারাজের ডাকে জয়কুমার জাগতিক চেতনায় ফিরে এলেন। উঠে দাঁড়িয়ে স্বস্তিবাচন করে বললেন — মহারাজের জয় হউক। মহারাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক।

—পুরোহিত মশায়কে প্রণাম। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে মায়ের কাছে ভোগ নিবেদন না করে আপনি বসে রয়েছেন এতো আশ্চর্য ব্যাপার মনে হচ্ছে।

— মহারাজ, এতক্ষণ আমি যে পরমানন্দে ছিলাম এবং মা যে পরমানন্দে ছিলেন আমাদের দু'জনকেই সে আনন্দ থেকে আপনি বঞ্চিত করলেন।

জয়কুমারের কথা শুনে মহারাজ বিস্মিত হলেন। কৌতুক বোধ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন— আমি আপনাদের আনন্দে কেমন করে ব্যাঘাত ঘটালাম ?

—মহারাজ, মন্দিরের সেবক মোহনবাঁশী জোলা পাড়ার পাশে বিশাল এক বটগাছ রয়েছে। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের সময়ে ঐ বটগাছ তার মেয়ে ভক্তি লাগিয়ে ছিলেন। মোহনবাঁশী জোলা খুব ভালো বাঁশী বাজায়। রাতে, দুপুরে, সকালে যখন তার ইচ্ছে হয় তখনি সে বাঁশীতে সুর দেয়। সেজন্য আমরা সবাই তার নাম রেখেছি মোহনবাঁশী। মোহনবাঁশী বটগাছের নীচে বসে যখন বাঁশী বাজায় তখন কোথা থেকে কয়েকজন পরমাসুন্দরী কিশোরী এসে বাঁশীর সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ করে। তারা কারা আমি আর মোহনবাঁশী ছাড়া কেউ জানে না। কোন কোন সময়ে মা তার বাঁশী শুনতে সেখানে চলে যান। মায়ের সখীদের সঙ্গে নৃত্য করেন। মা মোহনবাঁশীকে খুব স্নেহ করেন। পরমভক্ত এই মোহনবাঁশী। আপনি মহারাজ, আপনি মায়ের মন্দিরে মায়ের বিগ্রহের সামনে জিজ্ঞেস করলেন তাই এই অতি গোপনীয় কথা আপনাকে বলতে হলো। আমি এখানে বসে মায়ের নাচ দেখছিলাম। মা মন্দিরে ছিলেন না। আপনি যে সময় আমাকে ডাকলেন সে সময়ে তিনি মন্দিরে এসে ঢুকলেন। এখনি মায়ের কাছে ভোগ নিবেদন করছি। পূজো শেষ হলে আপনি মোহনবাঁশীর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন এই সময়ে সে কি করছিলো, কোথায় ছিলো।

মহারাজ লোক পাঠালেন মোহনবাঁশীকে মন্দিরে নিয়ে আসার জন্য। মহারাজ

ডেকেছেন শুনে সে ভয় পেলো। বাঁশী বাজানোতে বেশী মনোযোগী হওয়ায় মায়ের সেবার কাজ সে সব সময় সঠিকভাবে করতে পারে না।

মোহনবাঁশীকে নিয়ে আসা হলো। মহারাজ মোহনবাঁশীর কাছে জানতে চাইলেন কিছু সময় আগে সে কি কাজে ব্যস্ত ছিলো। মোহনবাঁশী মহারাজের কাছে সব কথা বললেন। মহারাজ জয়কুমারকে বললেন— পুরোহিত মশায়, ভক্ত ও ভগবানের লীলা বুঝার সাধ্য আমাদের নেই। না বুঝে আপনাকে ও মাকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলাম, মা যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমি দেওয়ানকে বলে দেবো আপনার পূজার ব্যাপারে কেউ যেন হস্তক্ষেপ না করেন। মহারাজ নাজির ও দেওয়ানকে বললেন— পুরোহিত জয়কুমারকে যেন বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। তাকে তার বাড়ী থেকে পাল্কি করে যেন নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয় আর মোহনবাঁশীকে যেন কখনো কোন কাজের আদেশ না দেওয়া হয়। মহারাজের ঐ আদেশের পর থেকে পুরোহিত জয়কুমার তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পেয়েছিলেন।

জয় কুমার চক্রবর্ত্তী কামাক্ষা তীর্থে প্রায় এক বছর ছিলেন। তন্ত্র সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একবার তিনি মায়ের মন্দিরের দীঘির পাড়ে এক ভৈরবী চক্রের আয়োজন করেছিলেন। দীপাবলী উপলক্ষে আগে থেকেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিদের আগমন ঘটে। তারা দীপাবলীর দু'চারদিন আগে থেকেই উদয়পুর মাতাবাড়ীর আশ-পাশ এলাকায় থেকে যান। এই সুযোগেই সাধক জয়কুমার চক্রবর্ত্তী ভৈরবী চক্রের আয়োজন করেছিলেন।

তন্ত্র সাধনায় স্থূল জগতের মাছ, মাংস, মদ, মুদ্রা এবং মৈথুন প্রক্রিয়ার ব্যবহার রয়েছে। সত্যবতী, তুমি তো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এর জীবনী পড়েছ। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর অনুগামীগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত রূপ বলে মনে করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্যই হউক কিংবা অন্যকোন কারণেই হউক প্রায় ছয় বছর ব্রাহ্মণী ভৈরবীর তত্ত্বাবধানে তন্ত্র সাধনা করেছেন। শক্তিপূজা করতে হলে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হয়। জেষ্ঠ ভ্রাতা রাম কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তার ভবতারিনী দেবীর পূজার দায়িত্ব কে নেবেন তা নিয়ে রাসমণি দেবী ও মথুর বাবু ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন। জাত-পাতের কারণে কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভরতারিনী মন্দিরের পূজোর দায়িত্ব নেন নি। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি ভবতারিনী মন্দিরের পূজোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ছোট ভাই গদাধরকে। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ভবতারিনীর পূজোর পুরোহিত নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কারণ রামকৃষ্ণ শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন না। ব্রাহ্মণদের পরামর্শে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হয়েছিলো। হয়তো লোকাচারকে বজায় রাখতেই জন্মসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণী ভৈরবীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় ছয় বছর ধরে যে স্থুল তন্ত্র সাধনা করেছেন

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীগণ একে রামকৃষ্ণের একটি লীলা বলে অভিহিত করেছেন। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এগার মাস ছিলেন। তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণী ভৈরবীর সঙ্গ ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। লীলাময় রামকৃষ্ণ ভৈরবীর সঙ্গ ত্যাগ করে তোতাপুরীর কাছ থেকে এগার মাস যে অদ্বৈতবাদে উপাসনা করেছেন তাকেও রামকৃষ্ণের ভক্তগণ একে লৌকিক লীলা বলেই অভিহিত করেছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কামকে জয় করেছেন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভৈরবী ব্রাহ্মণী এক সুন্দরী বাঈজীকে নিয়ে এসেছিলেন। মৈথুন সাধনার সময় উলঙ্গ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কোলে বসিয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী কার অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন সেই বাঈজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ মা সম্বোধন করে সন্তানভাবে বসে থেকে মৈথুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণী এক মৃত দেহের একটুকরো এনে সেই মাংস মদে সিক্ত করে শ্রী রামকৃষ্ণকে খাইয়ে ছিলেন। মদ ও মাংস খাওয়ার পরীক্ষাতেও ব্রাহ্মণীকে খুশী করতে পেরেছিলেন বলে অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তের লেখায় উল্লেখ রয়েছে। বেলুর মঠের সন্ন্যাসীগণ ভক্তদের একমাত্র শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বইটি পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাদের মতে অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তের লেখা বই পড়ে মানুষের মনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা জন্মাতে পারে এবং তাদের ভাব নষ্ট হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহাপুরুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যবতী, জয়কুমার চক্রবর্ত্তীর ভৈরবী চক্রের কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভৈররীর তন্ত্র সাধনার কথা মনে পড়ে গেল বলে তোমার কাছে উল্লেখ করলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মসিদ্ধ। তাঁর সরল ও মধুর বাণীর আকর্ষণে কোটি কোটি মানুষ তাঁর চরণতলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাকে শতকোটি প্রণাম জানাই।

তন্ত্রে ভৈরব চক্রের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে পাঁচ, সাত বা নয়জন ভৈরব ও নয়জন ভৈরবী একনিষ্ট চক্রে সাধনায় লিপ্ত হয়ে তাদের কামভাব দূর হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করেন। ঐ চক্র যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি যদি তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ না হন তাহলে ভৈরব চক্র নিষ্ফলা হয়। চক্রে ভৈরব ও ভৈরবীগণ উলঙ্গ হয়ে অবস্থান করেন। উলঙ্গ ভৈরবের কোলে উলঙ্গ ভৈরবী বসে ধ্যান করেন। সাধনা কত সময় চলবে তা ঠিক করে দেন চক্রাধিপতি। সাধক জয়কুমার চক্রবর্ত্তী যে ভৈরবী চক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন সেই চক্রের অধিপতি তিনিই হয়েছিলেন। তাই কামাক্ষায় তিনি যে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তার সময়ে মায়ের বহু লীলা ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছেন।

সত্যবতী, ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকলে ভগবান লাভ করা যায় না। মুসলমানরা প্রায় অটশো বছর ভারত শাসন করেছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর-নারী গভীর সংকটের মুখে পড়েও ধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পর ক্লাইভের নেতৃত্বে বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন চালু হয়। হিন্দু এবং মুসলমানদের

একটা অংশ ইংরেজদের সাহায্য করায় ইংরেজরা প্রায় দু'শো বছর ভারত শাসন করে গেছে। ইংরেজ শাসনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শাসক মুসলমান সম্প্রদায়।

ধর্মের নামে দেশ ভাগ হলো। ধর্ম নিরপেক্ষ নেতারা বাকী ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ঘোষণা করলো। তারা এমনসব আইন চালু করেছেন যা সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের চলার পথে প্রতি পদে পদে বাঁধার সৃষ্টি করছে।

একজন সাধারণ অফিসারের আদেশেই হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুদের আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান সরকার অধিগ্রহণ করতে পারে কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার চট্‌করে অধিগ্রহণ করতে কিংবা ভেঙ্গে দিতে পারবে না। ভারতীয় সংবিধানের মূল ধারায় সকলের জন্য সমান আইনের কথা বলা হলেও মুসলমানদের জন্য রয়েছে শরিয়তি আইন দেওয়ানী আইন মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য নয়। সংবিধান রচয়িতাদের এই রকম হেয়ালী পূর্ণ আইন ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি করেছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব দেখা দিয়েছে।

ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছি। তার কারণও রয়েছে। দেখো, মা দৈবকীর সপ্তম গর্ভে এসেছিলেন ভগবান অনন্তদেব। আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রভাবে এবং জগতের কল্যাণে দৈবকীর সপ্তম গর্ভ সাত মাসে বাসুদেব এর দ্বিতীয়া মহিষী রোহিনীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়। স্বামী কংসের কারাগারে বন্দী। তা সত্ত্বেও কেমন করে রোহিনী গর্ভবতী হলেন সমাজে এনিয়ে কানাঘুষা চলছিল। এই রহস্য মহর্ষি সন্দীপন প্রকাশ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন সংস্কারের সময়।

সন্দীপন ঋষির কথা সে সময়ের মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন। বর্তমান জগতের মানুষ সে সব কথাকে গালগল্প বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

দেখো, যোশেফ মেরীকে বিয়ে করার কিছুদিন পরই জানতে পারে মেরী গর্ভবতী। যোশেফ অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং মেরিকে ত্যাগ করার চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। একদিন এক দিব্য পুরুষ স্বপ্নে যোশেফকে দেখা দিয়ে বললেন, মাতা মেরি, দৈবভাবে গর্ভবতী হয়েছেন। তার গর্ভে বড় হচ্ছে মানুষের পরিত্রাতা রূপী এক দিব্যপুরুষ। তিনি যেন সেই সন্তানকে সযত্নে রক্ষা করেন এবং ঐ দিব্য শিশুর নাম যেন রাখা হয় যীশুখ্রীষ্ট।

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ মাত্রই মাতা মেরীকে শ্রদ্ধা করেন। প্রভু যীশুর আবির্ভাবকে দৈব ঘটনা বলেই মনে করেন। রোহিনীর গর্ভে জন্ম নেওয়া বলরাম একইভাবে আবির্ভূত হন। খ্রীষ্টানরা ঐ গর্ভকে দিব্য গর্ভবলে বিশ্বাস করলেও আধুনিক হিন্দু সমাজের একটা অংশ রোহিনীর গর্ভকে দৈব গর্ভবলে মেনে নিতে নারাজ। যারা নিজের ধর্মকে বিশ্বাস করে না তারা অন্যের ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। এই ধরনের লোকেদের বিনাশ অবশ্যই ঘটে থাকে। বহু ছলা কলার আশ্রয় নিয়েও রাক্ষস ও দানবেরা পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শাসন কায়েম

করতে সমর্থ হয়নি। কালের গতিতেই হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে এবং হিন্দু ধর্মের অনিষ্ট করে তারাও কংস, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির মতোই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হজরত মহম্মদ আকাশবাণী থেকে দিব্যবাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায় হজরতের কথা বিশ্বাস করেছেন। হিন্দু ধর্মের একাংশ দৈববাণীকে উপহাস করছে। অবিশ্বাস করছে। ঐসব অবিশ্বাসীদের স্থান কোথাও হবে না।

শান্তনু ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছে। তাই প্রথম থেকে তৃতীয় লহর পর্যন্ত রাজমালা সে ভাল করে পড়েছে। প্রথম লহরে ত্রিপুরার প্রাচীন জায়গার নাম দেওয়া হয়েছে। রাজ পরিবারের ব্যবহার, সৈন্য, অর্থনীতি, বিদেশনীতি সুন্দরভাবে কালীপ্রসন্ন সেন তুলে ধরেছেন। কৈলাশ চন্দ্র সিংহের রাজমালা এবং মহিম চন্দ্র ঠাকুরের দেশীয় রাজ্য বইটিও শান্তনু পড়েছে। বৈশাখ মাসে অমাবস্যায় কসবা কালী বাড়ীতে মেলা বসে। মেলার অতিত ইতিহাস সে স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। আনন্দময়ী মায়ের জীবনীকারও কসবা কালীবাড়ীর ছোট ইতিহাস তার লেখায় তুলে ধরেছেন।

তিন বছরের কলেজ জীবন আর দু'বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে শান্তনু আর সত্যবতী আরো কাছাকাছি এসেছে। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী পারমিতা রিগিং এর নামে দু'জনের জীবনে চলার পথ বদলে দিয়েছে। পাঁচ বছর পর দুই যুবক যুবতী কমলাসাগর দীঘির কমলা দেবীর লাগানো বটগাছের নীচে বসে পাঁচ বছর আগের কলেজের সেই নবীন বরণের দিনটির কথা স্মরণ করে সেই পারমিতাকে ধন্যবাদ জানায়। পরবর্তী কালে পারমিতার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ছোট শহর আগরতলায় পথে বের হলেই প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কামান চৌমুহনী থেকে পোষ্ট অফিস চৌমুহনী আর তুলসীবতী স্কুল থেকে গোলবাজার এই হলো আগরতলা শহর।

পারমিতা বি-এ পাশ করতে পারেনি। বিয়েও হয়নি। একটা কোম্পানীতে কম্পিউটারের কাজ করে সময় কাটায়। শান্তনু ও সত্যবতী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে সত্যবতী একটা বেসরকারী দোকানে মোবাইল ফোন বিক্রির কাজ করছে আর শান্তনু ত্রিপুরার ইতিহাসের উপর গবেষণা করে অধ্যাপক হবার স্বপ্ন দেখছে।

দু'জনের অবস্থাই মোটামুটি ভালো। ত্রিপুরায় এখন বর্ণ নিয়ে অনেকেরই মাথা ব্যথা নেই। তাই জন্মসূত্রে সত্যবতী আর শান্তনু দুই বর্ণের হলেও শান্তনু এবং সত্যবতীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই দু'জনে ভবিষ্যতে সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখছে।

রাজা শান্তনু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। আর সত্যবতী ছিলেন ধীবরের মেয়ে অর্থাৎ শূদ্রানী। সত্যবতী ক্ষত্রিয় রাজার বীর্য থেকে মাছের পেটে বড় হলেও তাকে ক্ষত্রিয় কন্যা বলেই এক পক্ষ অভিহিত করার চেষ্টা করেছে। বৈদিক যুগে জন্মকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না। গুণ ও কর্ম অনুসারেই তার পরিচয় নির্ধারণ হতো। বিয়ের পর সত্যবতী ক্ষত্রিয়ই থেকে গিয়েছিলেন।

শান্তনু ও সত্যবতীর প্রতিদিনই একবার না একবার দেখা হয়। শান্তনু ও সত্যবতী পালা করে তাদের বাড়ীতে আসে। দুই পরিবারের অভিভাবক মহলও দু'জনের মেলামেশাকে মেনে নিয়েছে। দুই পরিবার পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মিয়তা গড়ে তুলতে রাজী হয়েছে। তাই কমলা সাগরের মেলায় দু'জনের আসা নিয়ে কোন গোপনীয়তা ছিলনা। দু'জনের মধ্যে লোক লজ্জার কোন ভয় ছিলনা। আলোচনাও সেজন্য স্বাভাবিক ভাবেই এগুচ্ছিল। শান্তনুর বাইক্ রয়েছে। আগরতলা থেকে বাইক্-এ মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ। বাইক নিয়েই শান্তনু ও সত্যবতী কমলা সাগরের মেলা দেখতে এসেছে। ভাঙ্গা হাঁটের এই মেলা দু'জনের কারোরই মন ভরাতে পারেনি। বিশ্রামের সময়টাতে ত্রিপুরার দুই বিখ্যাত শক্তিপীঠের কাহিনী সত্যবতীকে শুনিয়ে মনের বিষন্নতা দূর করার চেষ্টা করছিলো।

গেরুয়া বসন পরিহিতা গেরুয়া ঝোলা কাঁধে নিয়ে এক সন্ন্যাসীনি এসে তাদের পাশে দাঁড়ালেন। শান্তনুকে বললেন — বাবা, তুমিতো ইতিহাসের ছাত্র। ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছো। কল্যাণ মাণিক্যের কথাও রাজমালায় পড়েছ। কল্যাণ মাণিক্যের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে মহা সাধিকা ভক্তিমাতার কথা জান?

শান্তনু অবাক হলো মাতাজীর কথা শুনে। মাতাজীর দিকে মাথা নেড়ে বললো— না।

—গুরু পরম্পরায় আমার আদিগুরুও ছিলেন ভক্তি মাতার শিষ্যা। আমার গুরুদেব ভক্তি মাতার স্মরণে আমারও নাম রেখেছেন ভক্তিমাতা সরস্বতী।

মাতাজীর কথা শুনে শান্তনু ও সত্যবতী দু'জনেই বেশ পুলক অনুভব করলো। সত্যবতী বললো মাতাজী, আপনি আমাদের ভক্তি মাতার কথা শুনালে খুব খুশী হবো। দেশ ভাগের পর এমনিতেই এখানে ভক্তের আসা-যাওয়া কমে গিয়েছিল। কাঁটাতারের বেড়া হওয়ায় ওপারের ভক্তদের আসা একেবাবে বন্ধ হয়ে গেলো। মেলার হতশ্রী চেহারা দেখে খুব খাবাপ লাগছিলো। আর্পনি কৃপা করে ভক্তি মাতার কথা শুনালে আমরা দু'জনেই খুব খুশী হবো।

কৈলাগড়ের মায়ের কথা বলতে গেলে ধন্যমাণিক্য থেকে দ্বিতীয় বত্ন মাণিক্য পর্যন্ত ত্রিপুরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনাতে হবে। কারণ মহারাজ ধন্য মাণিক্যের সেনাপতি রায়কচাক্ চট্টগ্রাম পাহাড় থেকে যে দেবীমূর্ত্তি উদয়পুর এনেছিলেন তিনিই মাতা ত্রিপুরেশ্বরীরূপে পরিচিতা। আর দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যেব সেনাপতি বলিভীম যে বিগ্রহ ধর্মগড়ের কাসিমনগর থেকে এনেছেন তিনিই কসবার কালী নামে পরিচিতা। তাদের কথা সংক্ষেপে বলছি শোন।

কৈলাগড়ের এক সৈনিক কালীপদ একদিন রাতে মা কালীকে স্বপ্নে দর্শন করেন। মা তাকে বলছেন— মায়ের পূজো দিলে সেনাপতি দীর্ঘজীবন লাভ করবেন। স্বপ্নাদেশ শুনে সেনাপতি বিশ্বজয় ছনের ঘর তৈরী করে কারিগড় দ্বারা মাটির কালী প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা মায়ের পূজো শুরু করিয়েছিলেন। তারপর থেকে বৈশাখ মাসের

অমাবস্যা তিথিতে প্রতিবছর নূতন মাটির প্রতিমা তৈরী করিয়ে কৈলাগড়ের সেনানায়ক এবং সৈন্যগণ ধূমধাম করে মায়ের পূজো করতে থাকেন। পরবর্তীকালে ত্রিপুররাজ বিজয় মাণিক্য মায়ের নিত্যপূজোর ব্যবস্থা করেন। কৈলাগড় ছিল অন্যতম বৃহৎ গড়। পরবর্তীকালে বিশালগড়ে আর একটি দূর্গ তৈরী করা হয়। সেটি ছিল সে সময়ের ত্রিপুর রাজার সর্ববৃহৎ গড়। গড়ের বিশাল আকারের সঙ্গে স্থানের নাম জড়িয়ে পড়ে। স্থানটি পরিচিতি লাভ করে বিশালগড় নামে। বিভিন্ন সময়ে কৈলাগড়ের সৈন্যরা মায়ের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রার্থনা জানিয়ে উপকৃত হয়েছেন। মাটির প্রতিমা চিন্ময়ী প্রতিমা হয়ে ভক্তের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করেছেন। মায়ের মহিমা কৈলাগড়ের এলাকা ছাড়িয়ে ত্রিপুরার রাজ প্রাসাদেও পৌঁছেছে।

কৈলাগড় থেকে কমলা সাগরের বিস্তৃর্ণ এলাকা দেখা যায়। সুজলা, সুফলা শষ্য শ্যামলা ঐ বিস্তৃর্ণ শষ্যভূমির নামও রাখা হয়েছে শষ্য দেবী কমলা তথা লক্ষ্মীর নামে। কমলা সাগরের মানুষ মা কমলার কৃপায় গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ নিয়ে সুখে শান্তিতে রয়েছেন। মাঝে মাঝে মুসলমান আক্রমণে শান্তি বিঘ্নিত হয়। সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। মা লক্ষ্মীর কৃপায় আবার নূতন করে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য দেবী কালীর পূজো হিন্দু সৈন্যরা পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করেন। তাই সৈন্যরা মা কালীর বিগ্রহ স্থাপন করে পূজোর ব্যবস্থা করেছিলেন। মায়ের কৃপার কথা কমলানগর গ্রামে ছড়িয়ে পরায় গ্রামের মানুষও দেবী কালীর কাছে তাদের প্রার্থনা জানাতে আসতে শুরু করেছেন। প্রথমে একজন পুরোহিত দ্বারাই মায়ের নিত্যপূজা সম্পন্ন হতো। সৈন্যরা বিভিন্ন কাজে পুরোহিতকে সাহায্য করতো। এখন দু'জন সেবক সর্বদা পুরোহিতকে সাহায্য করছেন। মায়ের মহিমার কথা শুনে বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজা কৈলারগড় দূর্গ দর্শন করতে এসে মাকে দর্শন করেছেন। রাজা রাজ পরিবারের এবং রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় মায়ের পূজো দিয়েছেন। শত শত ছাগ বলি দিয়ে সৈন্যরা ছাগ মাংস মায়ের প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মায়ের স্থান সিদ্ধ শক্তিপীঠে পরিণত হয়েছে।

মায়ের মহিমার কথা শুনে একবার ধন্যমাণিক্য এবং মহিষী কমলাদেবী কৈলাগড়ের মা কালীকে দর্শন ও পূজো দিতে এসেছিলেন। কমলাদেবী মায়ের মন্দিরের পাশে বসে বিস্তৃর্ণ ধানের ক্ষেতের সবুজ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। অবচেতন অবস্থায় মৃদু বাতাসে ভাসতে ভাসতে কে যেন কমলা দেবীর কানে কানে এসে বলে গেল প্রজাদের জল কষ্ট দূর কর। দীঘি খনন করাও। চমকে উঠলেন মহারাণী কমলা দেবী। বিস্তৃর্ণ ধানের ক্ষেত। একহাত মাটি খুড়লেই জল। প্রজাদের জলকষ্ট কেন ? না, মায়ের কাছে যারা পূজো দিতে আসেন তারা দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে এসে হাত মুখ ধোয়ার জল পান না। পান করার জল পান না। মহারাণী কমলা দেবী রাঙ্গামাটিতে প্রজার কল্যাণে বিশাল দীঘি খনন করিয়েছে[illegible] মন্দিরের সামনেও এমনি একটি দীঘি খননের ব্যবস্থা করতে হবে।

[illegible]মহারাজ [illegible]মাণিক্য মহিনীর একাগ্রতা নষ্ট করলেন। জিজ্ঞেস করলেন কী ভাবছো
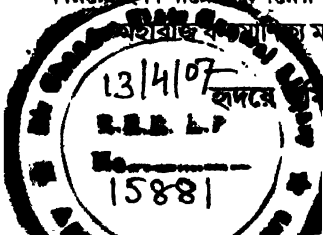
মহারাণী ? মহারাণী উত্তর দিলেন মায়ের মন্দিরের সামনে একটি বিশাল দীঘি খনন করাতে চাই। মহারাজ যদি কৃপা করেন তাহলে মায়ের দর্শনে আসা শত শত পূণ্যার্থীর জল কষ্ট দূর হতে পারে। মন্দির এলাকার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেতে পারে।

মহারাজ বললেন— মহারাণীর যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন মায়ের মন্দিরের সামনে একটি বিশাল দীঘি খনন করার ব্যবস্থা করাতেই হবে। আগামী শীতকালে খণ্ডল থেকে দক্ষ শ্রমিক এনে দীঘি খননের কাজ শুরু করা হবে।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য প্রধানা মহিষী কমলা দেবীর ইচ্ছে পূরণ করেছিলেন। খণ্ডল থেকে দক্ষ শ্রমিক আনিয়ে তিন মাসের মধ্যেই এক সুবিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সেই দীঘি দৈর্ঘ্যে ২২৪ গজ। প্রস্থে ১৭০ গজ। দীঘির পাড়ে মহারাজ ধন্য মাণিক্য এবং মহারাণী কমলা দেবী দুটো বট গাছের চাড়াও লাগিয়েছিলেন। মহারাজ ও মহারাণীর লাগানো সেই গাছ দুটো এখনো রয়েছে।

তোমরা যে প্রাচীন এই বট গাছ দেখছো এগুলোও তাদের লাগানো। মহারাজ অমর মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন রণদুর্লভনারায়ণ। তিনি ছিলেন কৈলাগড়ের সেনাপতি। কৈলাগড় ত্রিপুর রাজের অন্যতম প্রধান গড়। কিছুকাল পর পর মুসলমান আক্রমণ ঘটেছে। প্রথম আক্রমণ সামাল দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে চলেছে কৈলাগড়। কৈলাগড়ের সেনাপতি নির্বাচনে সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত সেনানায়কদের একজনকে কৈলাগড়ের দায়িত্ব দেওয়া হতো।

রণদুর্লভ নারায়ণের মেয়ে চম্পাবতীর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মহারাজ অমর মাণিক্যের এক হাজারী সেনাপতি কচুফা'র সঙ্গে। রণদুর্লভ নারায়ণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। রণদুর্লভ নারায়ণ যতদিন কৈলাগড়ের সেনাপতি ছিলেন ততদিন জামাতা কচুফাঁকে কৈলাগড়েই রেখে দিয়েছিলেন। নাতি কল্যাণের জন্ম হয়েছিল কৈলাগড়েই। বিচক্ষণ সেনাপতি রণদুর্লভ নারায়ণের নয়ণের মণি ছিলেন নাতি কল্যাণদেব। কল্যাণের পাঁচ বছর বয়সের সময় সেনাপতি রণদুর্লভ নারায়ণ কৈলাগড়ের সেনাপতি থাকাকালীনই মারা যান। এক হাজারী সেনাপতি কচুফাঁ ছিলেন অমরদেব এর বাল্য বন্ধু। দু'জনে একই সঙ্গে খেলাধূলা করেছেন। অমর মাণিক্যের অনুরোধেই তিনি সেনা বিভাগে চাকুরী নিয়েছিলেন। অমর মাণিক্য রাজা হয়েই বন্ধু কচুফাঁকে নিজ সৈন্য বাহিনীতে এক হাজারী সেনাপতির পদে বসিয়েছিলেন। সেনাপতি রণদুর্লভ নারায়ণ মারা যাওয়ার পর বন্ধু কচুফাঁকে রাজধানীতে রাজপ্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব দান করেন। কল্যাণদেব চলে আসেন বাবার সঙ্গে রাজ প্রাসাদে।

অমর মাণিক্যের পৌত্র যশোধর ছিলেন কল্যাণের আট মাসের বড়। কল্যাণদেব রাজপ্রাসাদে আসার পর কিশোর যশোধরের সঙ্গে কল্যাণের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মহারাজ অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর, রাজদুর্লভ, অমর দুর্লভ এবং যুঝার এই চার কুমারের শিক্ষার ভার একজন শিক্ষকের হাতেই দিয়েছিলেন. যশোধর এবং কল্যাণ একই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা নিতে থাকেন। ক্রমে দু'জনেই বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং অমর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ রাজদুর্লভ এর মৃত্যুর পর রাজধর ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে বসার পর মহারাজ রাজধর কৈলাগড়ের দায়িত্ব কল্যাণ দেবকে অর্পণ করেন।

কৈলাগড়ে মাটির কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সময়ে মুসলমানেরা কৈলাগড় দুর্গ আক্রমণ করেছে। মাটির কালী বিগ্রহ ধ্বংস করে দিয়েছে। মহারাজ বিজয় মাণিক্য একটি পাথর খণ্ড কালী বিগ্রহরূপে স্থাপন করেছিলেন। সেই বিগ্রহও মুসলমানদের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। সৈন্যরা আবার মাটির বিগ্রহ স্থাপন করে মায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছে। কল্যাণ দেব দূর সম্পর্কের রাজবংশের মেয়ে লতিকাকে বিয়ে করেছেন। সাত বছরে লতিকা স্বামীকে দুই পুত্র উপহার দিয়েছেন। বড় ছেলের নাম রেখেছেন গোবিন্দ ছোট জগন্নাথ। কল্যাণ এবং যশোধর দু'জনেই শৈশবে মাটি দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি বানিয়ে পূজো করতেন। রাজগুরু ভবানন্দ দু'জনকে খুবই স্নেহ করতেন। ভবিষ্যতে রাজবংশের মুখ উজ্জ্বল করার আশীর্ব্বাদ করতেন। রাজগুরুর আশীর্বাদ দু'জনের জীবনেই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ত্রিপুর রাজবংশের নিয়ম অনুসারে মহারাজের জেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হন। জেষ্ঠপুত্র অবশ্যই প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত হতে হবে। মহারাজ অমর মাণিক্যের জেষ্ঠপুত্র রাজদুর্লভ ছিলেন একাধারে বীর, বিচক্ষণ প্রশাসক এবং দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ। রাজধর পিতার দ্বিতীয় সন্তান। রাজদুর্লভ যুবরাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি জীবিত থাকলে রাজধরের ত্রিপুরার সিংহাসনে বসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাজদুর্লভ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন দ্বিতীয় পুত্র রাজধরের ভাগ্য খুলে গেল। তিনি ত্রিপুরার রাজা হলেন। রাজধরের মৃত্যুর পর যশোধর ত্রিপুরার সিংহাসনে বসার সৌভাগ্যলাভ করায় ভগবান বিষ্ণুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন কল্যাণদেব।

লতিকা দেবীর একটি মেয়ে সন্তানের বড় সখ। স্বামীকে মাঝে মাঝে সে কথা বলেন। দু'ছেলের জন্মের পর দুর্গরক্ষাকারী দেবী কালীর কাছে একটি কন্যা সন্তানের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা জানাতেন লতিকা দেবী। ধন্যমাণিক্য এবং কমলা দেবীর লাগানো দুই বটগাছের সুশীতল ছায়ায় বাতাস খেতে খেতে একদিন লতিকা দেবী স্বামীকে বললেন— মায়ের কাছে প্রতিদিন একটি কন্যা সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। স্ত্রীর কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন কল্যাণদেব। বললেন— মেয়ে হলে মা-বাবার দায়িত্ব যে কত বেশী বেড়ে যায় তা কি তুমি জানো না?

লতিকা দেবী বললেন— জানি, শুনেছি মেয়ে না হলে, মেয়ে দান না করলে মা-বাবার স্বর্গলাভ হয়না। স্ত্রীর কথায় আর একবার হেসে উঠলেন কল্যাণ দেব। বললেন— আমার লতিকা দেবী নূতন শাস্ত্র তৈরী করছেন। ভগবান বিষ্ণু সদা সর্বদা আমাকে সাহায্য করে আসছেন। তুমি যদি সত্যিই একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চাও তা হলে ভগবান বিষ্ণু অবশ্যই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

—ভগবান বিষ্ণু পালন কর্তা। তিনি সৃষ্টি কার্যে কখনো সহায়তা করেন না। মা আদ্যাশক্তি মহামায়া, সৃষ্টি কার্যে সর্বদা ব্যস্ত। তিনি প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি প্রাণীর জন্ম দিচ্ছেন। তাই তিনি বিরসনা। যিনি প্রতি মুহূর্তে প্রসব কার্যে ব্যস্ত তিনি নিম্নদেশ ঢেকে রাখার সময় কখন পাবেন? মায়ের কাছেই তাই প্রতিদিন একটি মেয়ের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।

—লতিকা, আমি সৈনিক। কৈলাগড় দুর্গ বারবার শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত এবং নষ্ট হয়েছে। কালই যদি শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করে তাহলে সেনার আগে অস্ত্র হাতে আমাকেই এগিয়ে যেতে হবে। শত্রুর হাত থেকে যদি রক্ষা পাই, ভগবান বিষ্ণু এবং মা কালী যদি দয়া করেন তাহলেই তোমার বাসনা পূর্ণ হতে পারে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ মানুষের নিয়ন্ত্রনের বাইরে।

— সে জন্যইতো মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি মা কালীর দয়ার অন্ত নেই। মা আমার ইচ্ছে পূর্ণ করুন।

শ্রাবণ মাস। কমলা সাগরের দীঘির পশ্চিমে মাইলের পর মাইল শুধু ধানের জমি। ধানের জমির মাঝ খান দিয়ে একে বেঁকে চলে গেছে মেঠো পথ। আকাশে কালো মেঘের ছুটাছুটি। কল্যাণদেব স্ত্রীকে বললেন— এবার উঠো। এক্ষুণি বৃষ্টি আসবে।

— চলো।

কালী মন্দিরের পাশে একটি বেল গাছ। বেল গাছের পাশেই পুরোহিত গঙ্গাধর, সেবক গোপাল আর রাধুনি সেবারামের ঘর। মায়ের ভোগ এবং পুরোহিত ও সেবকদের রান্না একই ঘরে হয়। পুরোহিতের ঘরের আধকাণি দূরত্বে সেনাপতি কল্যাণদেব এর ঘর। মাটির দেওয়াল দেওয়া বড় বড় চারটি ঘর। বাঁশের তরজার ছাউনি। দু'কাণি ক্ষেত দূরেই রয়েছে সেনাদের থাকার সারি সারি লম্বা লম্বা ছন বাঁশের ছাউনি দেওয়া ঘর। তিনটি টিলায় পাঁচ হাজার পদাতিক, দু'শো অশ্বারোহী এবং দশটি হাতী রয়েছে। কয়েকমাইল দূরে কসবা নামক স্থানে রয়েছে একটি ছোট্ট চৌকি। দশজন সৈনিক সেখানে এক পাহাড়ের চূড়ায় সর্বদা পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকে।

ত্রিপুর রাজগণ শত্রুদের আক্রমণের সংবাদ অল্প সময়ে রাজধানী রাঙ্গামাটি এবং অন্যান্য গ্রামে ও দুর্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক বিশেষ সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে। শত্রু আসার সংবাদ পাওয়া মাত্র এক ব্যক্তি সেই সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করার পর প্রতিবেশী গ্রামের কোন ব্যক্তি সেই সাংকেতিক শব্দ সজোরে ব্যবহার করে। এভাবে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম হয়ে সেই সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে ত্রিপুররাজ এবং ত্রিপুর বাহিনী শত্রু আসার সংবাদ পেয়ে যায়। প্রস্তুতি নেওয়া এবং সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ পায়। এ ভাবেই মহারাজ প্রথম রত্ন মাণিক্যের সময় থেকে ত্রিপুরার নাগরিকগণ সাংকেতিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের গ্রামের এবং রাজ্যের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে আসছে। মুসলমান সৈন্যদের তুলনায় ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ার ফলে অনেক সময়ই ত্রিপুর বাহিনী

মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু, রণকৌশল এবং বীরত্বের দিক থেকে ত্রিপুর বাহিনী কোন অংশেই মুসলমান সৈন্যদের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল না।

সত্যবতী, পুরোহিত গঙ্গাধরকে নিযুক্ত করেছিলেন অমর মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র রাজা রাজধর। তিনি বন কেটে একটি সুন্দর জনপদ গড়ে তুলেছিলেন যা রাজধরনগর নামে পরিচিত। এখনো সেই গ্রাম রাজধরের স্মৃতি বহন করে বেঁচে আছে। তার অমর কীর্তি কুমিল্লায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপন। সাততলা ঐ মন্দিরটি মুসলমানেরা ধ্বংস করে দিয়েছে। রাজধর উৎকল থেকে জগন্নাথের বিগ্রহ ও পুরোহিত এনে জগন্নাথ পুরে প্রতিষ্ঠা করেন। সে বিগ্রহ এখন মেলাঘরে পূজিত হচ্ছে।

রাজদুর্লভ রাজা হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। অকালে আন্ত্রিক রোগে মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় পুত্র রাজধর নারায়ণ সিংহাসনে বসেন। রাজধর নারায়ণের পুত্র যশোধর কল্যাণ দেব এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজপ্রাসাদে রাজপুত্র এবং রাজ অন্দর মহলের কুমার কুমারীদের সঙ্গে এক সঙ্গে শিক্ষা লাভের ফলে কল্যাণ দেব ত্রিপুর রাজ ঘরাণার সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন। লতিকাও রাজ ঘরাণার সঙ্গে পরিচিত এবং রাজমহলের শিক্ষা সংস্কৃতিতেই বড় হয়েছেন।

রাজধর মাণিক্য কালীবাড়ীর পুরোহিত গঙ্গাধরকে জগন্নাথপুর থেকে কসবার কালী বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন। অমরমাণিক্য থেকে রাজধর, যশোধরমাণিক্য পর্যন্ত তিন রাজার নাড়ি নক্ষত্র তিনি জানেন। কল্যাণদেব পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সময় কৈলাগড় দূর্গে মাতামহ রণদুর্লভের সঙ্গে ছিলেন। শিশু কল্যাণকে তিনি বহুবার কোলে নিয়ে আদর করেছেন। চুমু খেয়েছেন। গঙ্গাধরের কাছ থেকেই বালক কল্যাণ অধ্যাত্ম জগতের রাস্তার খোঁজ পেয়ে ছিলেন। সে ধারা অব্যাহত ছিল রাজ প্রাসাদেও। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের বেল গাছের নীচে দু'জনে বহুদিন বহু সময় ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করে কাটিয়েছেন। রাজগুরু ভবানন্দ ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত। তিনি দুই কিশোরকেই বিষ্ণুর চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত মন্ত্র জপ্ করাব উপদেশ দিয়েছিলেন। সে মন্ত্র জপ্ করে পাঁচ বছরের বালক ধ্রুব ভগবান বিষ্ণুয় দর্শন পেয়েছিলেন। সেই চৌদ্দ অক্ষণ বিষ্ণু মন্ত্র — "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা" জপ্ করতেন। কল্যাণদেব স্ত্রীকে বলেছেন নাম কীর্তনেব চেয়ে আনন্দ আর নেই। কল্যাণদেব দুর্গাধিপতি হয়ে কৈলাগড়ে আসার পর প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতি দর্শনের পর পুরোহিত গঙ্গাধরের কাছ থেকে পূর্বজ ত্রিপুর রাজাদের কাহিনী শুনতেন। মাঝে মাঝে পত্নী লতিকা দেবীও স্বামীর সঙ্গে বসে ত্রিপুব রাজবংশের কাহিনী শুনতেন। আনন্দ পেতেন। বর্ষার এক সন্ধ্যায় দীঘির পাড় থেকে দুর্গে ঢোকার আগেই ঝুমঝুমিয়ে বৃষ্টি নামে। আরতির প্রস্তুতি চলছিল। কল্যাণ দেব স্ত্রীকে বললেন, চলো ঘরে না গিয়ে একেবারে আরতি শেষ করে তারপর যাবো। ততক্ষণে বৃষ্টিও থেমে যাবে। স্ত্রী লতিকা দেবী রাজী হলেন। রাজী না হয়ে কোন উপায় ছিলনা। বৃষ্টির সঙ্গে মৃদু বাতাস মন্দিরের বারান্দায় জ্বালানো মশালের আলো অনবরত

কাঁপাতে ছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি মন্দিরের সব মশাল নীভে যাবে। মন্দির প্রাঙ্গণ অন্ধকারের করাল গ্রাসে পড়ে যাবে। কিন্তু, তেমনটা হলো না। মশালগুলো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতেই মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যেতো। স্থির আলোয় দেবী কালীর মুখ আলোকিত হয়ে উঠতো।

আরতি এক সময় শেষ হলো। বৃষ্টি বন্ধ হলো না। কল্যাণদেব বললেন — ঠাকুরমশায় আজ আমাদের কমলা সাগর দীঘির কাহিনী শোনান। কতবার শুনেছি তবু শুনতে ইচ্ছে করে। কাহিনী শুনতে শুনতে বৃষ্টিও বন্ধ হবে।

— তুমি ঠিকই বলেছ কল্যাণ। কমলা সাগর দীঘির কথা অনেকবার শুনলেও আবার শুনতে ইচ্ছে করে। অনেকটা রামায়ণ- মহাভারতের মতো। বলছি, শোন। মন্দিরের সেবক গোপাল কল্যাণদেব আর তার স্ত্রী লতিকা দেবী এই তিনজন বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় মায়ের মন্দিরের ছনবাঁশ দিয়ে তৈরী নাট মন্দিরে বসে কমলাসাগর দীঘির আত্মকথা শুনতে তৈরী হলেন। পুরোহিত বলতে লাগলেন — মহারাজ ধন্যমাণিক্যের প্রধানা মহিষীর নাম ত্রিপুরার মানুষ ভারতের পাঁচ মহাসতীর নামের সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁর মতো মমতাময়ী, স্নেহময়ী, ভক্তিমতি এবং গুণবতী মহিলা ত্রিপুরায় এর আগে আর জন্মায়নি, ভবিষ্যতেও আর জন্মলাভ করবেন না।

পরবর্তীকালে এক সৈনিক কালীপদ একদিন স্বপ্নে দেবী কালীর দর্শন পেলেন। দেবী কালী তাকে দেখা দিয়ে বলছেন, কালীপদ ধানক্ষেত এর এক কোণে জলের নীচে পাথর রূপে আমি বিরাজিত আছি। তুমি সেখান থেকে ঐ পাথরটি তুলে দুর্গেমি এনে স্থাপনের ব্যবস্থা করো। পূজোর ব্যবস্থা কবো। এতে ত্রিপুর রাজ এবং দুর্গের সৈন্যবাহিনী সকলেরই মঙ্গল হবে। বর্তমানে যেখানে কমলাসাগর দীঘি রয়েছে তার প্রায় সবটাই ছিলো ধানের ক্ষেত। ভাদ্রমাস ছিল। সবুজ ধানগাছ কোমর জলে দাঁড়িয়ে বাতাসে দোল খেত আর বৃষ্টিতে স্নান করে তরতাজা হয়ে প্রতিদিন সবুজ হাসি হাসতো। দেবী কালী যে স্থানের নির্দেশ দিলেন সে স্থান এক ক্ষেতের কোণে অবস্থিত।

কালীপদ পরদিন ভোর বেলা দুর্গাধিপতি রণজয় নারায়ণকে সে কথা বললেন। তখন ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল। ধন্যমাণিক্য রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে অত্যাচারী সেনাপতিদের দমন করে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা বাড়ানোর সংকল্প করেছেন। রণজয় নারায়ণ অত্যাচারী সেনাপতিদের হত্যার সময় বিশেষ ভূমিকা পালন কবেছিলেন। তিনি ছিলেন ধন্যমাণিক্যের শ্বশুর দৈত্য নারায়ণের অধীনস্থ এক বিশিষ্ট সেনানায়ক। দৈত্য নারায়ণের পরামর্শেই ধন্যমাণিক্য রণজয় নারায়ণকে কৈলাগড়ের সেনাপতি পদে বসিয়েছেন। ত্রিপুরার পক্ষে কৈলাগড় এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। রণজয় নারায়ণ ও দেবী কালীর পরম ভক্ত। দেবী কালী সব হিন্দু সৈনিকেরই অভয় দায়িনী মা। দেবী কালীর পূজো দিয়েই ত্রিপুর বাহিনী শত্রুর মোকাবেলা করতে যায়। ত্রিপুর রাজবংশের নিয়ম অনুসারে যুদ্ধ যাত্রার আগে দেবী শক্তির কাছে শক্তি

প্রার্থনা করে শত্রুর পরাজয় প্রার্থনা করতে হয়। সৈনিক কালীপদ সেনাপতির কাছে স্বপ্নের কথা জানালেন। কালীমায়ের কাছে স্বপ্নের কথা শুনে সেনাপতি কয়েকজন সৈন্যসহ সৈনিক কালীপদকে নিয়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন। ক্ষেতের বাঁধের পাশে সামান্য একটা গর্ত। ক্ষেতের মালিক ক্ষেতের স্থানে স্থানে গর্ত করে রেখেছেন যাতে মাছেরা সে সব গর্তে বাস করতে পাবে। ক্ষেতের জল শুকিয়ে এলেও ঐসব গর্তে কিছুদিন জল থাকে। মাছেরা বড় হয়। মালিকের উপকার হয়। মাছ খাওয়ার সুযোগ পায়।

গর্তের জল খুব পরিষ্কার। মনে হয় নীচ থেকে সেখানে জল উঠে। যাকে কৃষকরা ফোরায়া বলে। ফোয়ারার জলই গ্রামের মানুষের পানীয় জলের প্রধান উৎস। ঐ জলে জীবাণু কম থাকে। পানের যোগ্য বলে ঐ জল মানুষ ব্যবহার করেন। গ্রাম সামান্য দূরে। তাই ফোয়ারার জল ক্ষেতের জলের মাত্রা বাড়ায়। পানের কাজে ব্যবহার হয়না। সেনাপতি এবং সৈন্যরা কালীপদের স্বপ্নকে স্বপ্ন বলেই ধরে নিলেন। সেনাপতি কালীপদকে বললেন— চল হে ফিরে যাই। মা তোমাকে যে স্থানের নির্দেশ দিয়েছেন তা তুমি ঘুমের ঘোরে চিনে রাখতে পারোনি। কালীপদ মনে মনে লজ্জিত হলো। হাতজোর করে সেনাপতিকে বললো— সেনাপতি মশায়, আমি ক্ষেতে নেমে জলের ঐ ফোরারার নীচে হাত দিয়ে পরখ করে দেখি মায়ের মূর্ত্তি জলের নীতে লুকানো রয়েছে কিনা।

— দেখো, আমরা না হয় আরো কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করবো। শুনেছি দিব্য স্বপ্ন অনেক সময় সত্যি হয়। কালীপদ ধানের ক্ষেতে নামলো। সচ্ছ জল কাদায় মিশে ঘোলা হয়ে গেলো। কালীপদ হাত দিয়ে সেখানকার মাটির নীতে কোন কিছু পাওয়া যায় কিনা তা পরখ করে দেখতে লাগলো। এক সময় তার হাতে পাথরের মতো একটা বস্তু হাতে লাগলো। সে উৎসাহিত হয়ে বললো — সেনাপতি মশায়, মনে হচ্ছে নীচে কি যেন রয়েছে। বন্ধুরা সাহায্য করলে কাজটা সহজ হতে পারে।

কালীপদের কথা শেষ হতে না হতেই চার পাঁচ সৈনিক ক্ষেতের কাদাজলে নেমে পড়লো। মাটি সরিয়ে চার পাঁচজনে প্রায় দেড়ফুট চওড়া ও দু'ফুটলম্বা একটি পাথর বের করলো। কালীপদ চিৎকার করে বললো— মা এই পাথরেই অবস্থান করার কথা বলেছেন। জয় মা কালী, জয় মা কালী !

সেনাপতি বললেন— বিশ্বাসে মেলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। এখানে এমন পাথর আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। তোমার স্বপ্ন অবশ্যই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই পাথর উঠিয়ে দীঘির জলে ধোঁয়ে আমাদের দুর্গের ভেতর নিয়ে আসো। আমরা এই পাথরকেই দেবী কালীরূপে পূজা করবো। দুর্গের ভেতরে ছন-বাঁশ দিয়ে বর্তমান স্থানেই তৈরী মন্দিরে মাটির বেদী বানিয়ে সে পাথর স্থাপন করে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজোর ব্যবস্থা হলো। কয়েক মাসের মধ্যেই কৈলাগড়ের সৈন্যরা মেহেরকুল বাক্‌লা পাটিকারা, ভুলুয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে পাঠান সেনাদের হটিয়ে ত্রিপুর রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করলেন। তারপর হুসেন শাহের

সৈন্যরা কয়েকবার ত্রিপুরা আক্রমণ করেছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য প্রতিবারই তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে তখনকার দিয়েছেন। কৈলাগড়ের মা কালীর কাছে বহু মানুষ মানত করে উপকার পেয়েছেন। তাই মহারাণী কমলা দেবী স্বামীর সঙ্গে পাথররূপী মাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। বিশাল মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় মা কালীর কৃপা ছাড়া কখনো সম্ভব হতো না। সে জন্যই কমলা দেবী মায়ের মন্দিরে পূজো দিতে আসা ভক্তদের সুবিধার জন্য এবং দুর্গের সৈন্যদের সুবিধার জন্য এখানে একটি দীঘি খনন করার জন্য মহারাজ ধন্যমাণিক্যকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ধন্যমাণিক্য রাণীর ইচ্ছে পূর্ণ করতে দশ হাজার দক্ষ শ্রমিককে দীঘি খননের কাজে নিযুক্ত করেন।

দু'হাত মাটি খুড়লেই যে স্থানে শীতকালে জল উঠে সেই স্থানে পনের হাত গভীর করার পরও জলের দেখা না পাওয়ায় সেনাপতি রণজয় নারায়ণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। আকাশে ইতিমধ্যেই মেঘের আনাগুনা শুরু হয়েছে। চৈত্রমাসে বৃষ্টি হলে দীঘির কাজ করা সম্ভব হতো না। বৈশাখ মাস শুরু হয়েছে। এরমধ্যে জল পাওয়া না গেলে বৃষ্টির জলেই দীঘি ভরাট করতে হবে। এতে সেনাপতির এবং মহারাজকে লজ্জিত হতে হবে। সেনাপতি দূত পাঠালেন রাজধানীতে প্রকৃত ঘটনা মহারাজকে জানানোর জন্য।

মধ্যরাত। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা ছাড়া সকলেই গভীর ঘুমে। এমন সময় মহারাণী কমলা দেবী স্বপ্নে গঙ্গাদেবীর দর্শন পেলেন। চতুর্ভূজা মকর বাহনা দেবী কমলাকে দর্শন দিয়ে বললেন— রাণী, মহারাজকে বলো সেখানে গঙ্গাপূজা দিতে। বহু নররক্ত শুঁষে নিয়েছে এই মাটি। পুরোহিত পূজা দেওয়ার পর তুমি আমায় তৈল সিঁদুর দিয়ে আবাহন করলে আমি দীঘিতে অবতীর্ণ হবো।

মহারাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মহারাজ গভীর ঘুমে। মহারাজকে জাগানো ঠিক হবেনা ভেবে মহারাজের ঘুম ভাঙ্গালেন না। প্রবাদ আছে স্বপ্নের কথা রাতে প্রকাশ করতে নেই। ভাল স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নের পর আর ঘুমোতে নেই। বাকীরাত কমলা দেবী দেবী গঙ্গার নাম স্মরণ করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন।

রাত শেষ হতেই দাসীরা মহারাজ মহারাণীর ঘুম ভাঙ্গাতে ভোরের গান গাইতে গাইতে মহারাজ মহারাণীর খাস কামরার সামনে এলো। মহারাণী এবার মহারাজকে ডাকলেন। মহারাজ উঠে বসলেন। হাই তুলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। মহারাণী বললেন— মহারাজ গতকাল রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেবী গঙ্গা স্বপ্নে দেখা দিয়ে কৈলাগড়ের দীঘিতে গঙ্গাপূজা দেওয়ার আদেশ দিলেন। বললেন পূজো শেষে আমি তৈল সিঁদুর দিয়ে গঙ্গা দেবীকে আবাহন করলে গঙ্গাদেবী দীঘিতে আবির্ভূতা হবেন। মনে হয় দীঘিতে এখনো জলের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

—হয়তো তোমার অনুমান সত্যি। কিছুদিন আগে সেনাপতি দূত পাঠিয়ে জানিয়েছিলো যেখানে দু'হাত মাটি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায় সেখানে পনর হাত খননের পরও জল পাওয়া

যায়নি। অবাক হবার মতো কথা। আমি বলে দিয়েছি খননের কাজ চালিয়ে যেতে।

— মা গঙ্গা বলেছেন এখানকার মাটি অপবিত্র। বহু সৈন্য সেই মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পূজো দিয়ে মাটি পবিত্র করতে হবে ।

সেখানেইতো দেবী কালীর পাথররূপী বিগ্রহ পাওয়া গেছে। একদিন ঐ স্থান শক্তিপীঠে পরিণত হবে।

ঠিক কথাই বলেছেন মহারাজ। একদিন ঐ স্থান শক্তিপীঠে পরিচিত হবেই। মহারাজ, দেবী কালী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেন। জল দান করেন দেবী গঙ্গা। মহারাজ বিলম্ব না করে আমাদের কৈলাগড় যাওয়া উচিত। সেখানে গঙ্গা পূজার ব্যবস্থা করা উচিত। দীঘিতে জল না পাওয়া গেলে প্রজাগণ আমাদের অশ্রদ্ধা করতে শুরু করবে।

— তোমার ইচ্ছে মতো আমরা পরশু কৈলারগড় যাত্রা করবো। আজ রাজসভায় এই ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হবে।

কমলা দেবীর বাল্যসখী চন্তাই এর মেয়ের নামও কমলা। সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ আর চন্তাই এর মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। দু'জনের কন্যা সন্তান হবার পর দু'জনেই মেয়ের নাম রাখেন কমলা। কুমার ধন্য অনেকদিন চন্তাই এর বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। চন্তাই কন্যা কমলা ধন্যকে আপন ভাই এর চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। সখী কমলাকে ধন্য কুমারের পত্নী হিসেবে গড়ে তুলতে কমলারও ভূমিকা ছিল। দুই সখীই দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণা ছিলেন। চন্তাই কন্যা কমলাকে একবার ভগবান বিষ্ণু স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে পত্নীরূপে পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। আনন্দিত কমলা বাবা চন্তাইকে স্বপ্নের কথা বলেন। বিগ্রহরূপী নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। চন্তাই রাজী হলেন।

রাজগুরু লক্ষ্মী নারায়ণ চন্তাই কন্যা কমলার ইচ্ছে পূরণে সহায়তা করেন। লক্ষ্মী নারায়ণ নিজে পৌরহিত্য করে চন্তাই কন্যা কমলার সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর পাথরের বিগ্রহের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ নিজকন্যা কমলার বিয়ে দেন কুমার ধন্য'র সঙ্গে। দৈত্য নারায়ণ জানতেন কুমার ধন্য এবং কন্যা কমলা দু'জন দু'জনকে ভালবাসেন। তাই কুমার ধন্যর সঙ্গে গোপনে কমলার বিয়ে হয়। সে কারণে ধন্যকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসানোর জন্য মুখ্য ভূমিকা দৈত্য নারায়ণই নিয়েছিলেন। মূলত প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ এবং রাজগুরু লক্ষ্মী নারায়ণের যুগ্ম পরিকল্পনাতেই অত্যাচারী দশ সেনাপতিকে কৌশলে হত্যা করানো হয়েছিল। ঐসব দুষ্ট সেনানায়কদের বিনাশ না ঘটালে মহারাজ ধন্যমাণিক্য প্রজার কল্যাণে কোন কাজ করতে পারতেন না। রাজ্যের সীমানাও বাড়াতে পারতেন না। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হতেন ধন্যমাণিক্যও। কমলা মহারাণী হবার পর সখী কমলাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন। রাজপ্রাসাদের একটা ঘরে চন্তাই কন্যা কমলা ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে ভজনা করতে থাকেন। দুই সখীর সখ্যতাও বজায় থাকে। কমলাদেবী

রাজপ্রাসাদের বাইরে কোথাও গেলে সখী কমলাকে সঙ্গে রাখতেন। কুমার ধ্বজ এবং বিজয়. সখী কমলার হাতেই বড় হয়েছিলেন। তারা চন্তাই কন্যা কমলাকে ছোট মা এবং গর্ভধারিণী কমলাকে বড় মা বলে ডাকতেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য সভায় সপরিবারে কৈলাগড় যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। রাজধানী রক্ষার ভার বিশ্বস্থ বন্ধু রায় কাচাক্ এর উপর দিয়ে কয়েকজন সভাসদ এবং সেনাপতি রায়কছমকে নিয়ে দেবী কমলা ও মহারাণী কমলাসহ কৈলাগড় যাত্রা করলেন।

মহারাজ, মহারাণী, অন্যান্য সভাসদ ও কমলা দেবী হাতীর পীঠে চড়লেন। মহারাজের সঙ্গে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পেছনে পেছনে চললো। মহারাজের বিশ্রামের জন্য একটি স্থান নির্বাচন করা হলো। সেখানে স্থায়ীভাবে কয়েকটি ছোট দোকান বসানো হলো। একটি সমৃদ্ধ জনপদের মধ্যস্থলে অবস্থিত রাঙ্গামাটি থেকে কৈলাগড় যাওয়ার পথে সেনাপতি, সৈন্য এবং মহারাজ এই স্থানে বিশ্রাম নেন। সেজন্য ঐ স্থানের নাম বিশ্রামগঞ্জ নামে পরিচিত লাভ করেছে।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য সৈন্য ও সভাসদসহ প্রায় তিন দন্ড (প্রায় দু'ঘন্টা) সময় বিশ্রামগঞ্জে বিশ্রাম নেন। এই ফাঁকে সেখানকার প্রজাবৃন্দ মহারাজ ও সঙ্গীদের ভোজন করানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। রাত এক প্রহরে মহারাজ কৈলাগড়ে এসে হাজির হন। মহারাজের আসার সংবাদ সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে অগের দিনই রণজয় নারায়ণ পেয়েছিলেন। তাই রাজারাণী এবং অন্যান্যদের অতিথি সৎকার করানোর সবরকম বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। মহারাজ ও রাণীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দুর্গের ভেতরের সুসজ্জিত তাবুতে নিয়ে যাওয়া হয়।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য ছিলেন দেবদ্বিজে ভক্তি পরায়ণ। মহারাণী কমলা দেবীও ছিলেন সেরকমই। তাই অন্য রাজা এবং রাণীর মতো তারা রাতে প্রাসাদে কিংবা অন্য কোথাও বাঈজীর নাচের আসর বসাতেন না। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় খাওয়ার পর মহারাজসহ সকলেই ঘুমিয়ে পড়েন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজধানী থেকে পুরোহিত নিয়ে এসেছেন। একদিন পরই দীঘির মাঝখানে গঙ্গাপূজো হবে। চারিদিকে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হলো। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে গঙ্গাপূজো শুরু হলো। হাজারো প্রজা পূজা দেখতে এলেন। পূজো শেষ করে পুরোহিত মহারাণী কমলা দেবীকে তৈল সিঁদুর দিয়ে দেবী গঙ্গাকে আবাহন করতে বললেন। দেবী গঙ্গার বীজমন্ত্র বলে দিলেন। সখী কমলা সোনার তৈরী সিঁদুরের কৌটার মুখ খুলে দিয়ে মহারাণী কমলার পাশে দাঁড়ালেন। মহারাণী কমলা তৈল সিঁদুর দিয়ে বীজমন্ত্র পাঠ করে দেবী গঙ্গাকে আবাহন করা মাত্র দীঘির চারধারে যেন সহস্র সিংহের গর্জন শোনা গেল। নদীতে বন্যা এলে জলস্রোত যেমন করে গর্জন করে ছুটতে থাকে তেমনি করে প্রবল বেগে জল চারদিক থেকে মাঝখানে ছুটতে লাগলো। মাঝখানেও ফোয়ারার মতো জল প্রায় দশ হাত উপর পর্যন্ত উঠতে লাগলো। মহারাজের ও মহারাণীর দেহরক্ষীরা মুহূর্তে রাজা-রাণীকে

কোলে তুলে বাঁধানো পাড়ের দিকে ছুটতে লাগলেন। চন্তাই কন্যা নির্বিকারভাবে একা জোর হাতে কাকে যেন প্রণাম নিবেদন করছিল। হয়তো ভগবান বিষ্ণু তার মানবী স্ত্রীকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। গড়ুরের পাখার শব্দেই মনে হয়েছিলো চারিদিকে সিংহের গর্জন ভেসে আসছে। মহারাণী কমলা দেবী পাড়ে পৌঁছে প্রিয়সখী কমলাকে দীঘির জলে তলিয়ে যেতে দেখলেন। সখী সখী বলে বিলাপ করতে করতে মহারাণী জ্ঞান হারালেন। দীঘি জলে পূর্ণ হয়ে গেলো। উপস্থিত মানুষের মনে সতী কমলার জন্য শোকের ছায়া নেমে এল।

কমলা দেবীর এমন করুণ পরিণতি দেখে সকলেই শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কমলা দেবীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। কমলা দেবীর স্থূলদেহ আমাদের চোখে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কে জানে স্বামী নারায়ণের কৃপায় তিনি গঙ্গাদেবীর সঙ্গে থেকে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করছেন। এক সময় দেবী গঙ্গাও বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর অন্যতমা মহিষী হিসেবে বিরাজিত ছিলেন। লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতী এই তিন দেবী ভগবান বিষ্ণুর মহিষী ছিলেন। একদিন দেবী গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে কলহ বাঁধে। উভয়ে উভয়কে নদীরূপে প্রাপ্ত হয়ে মর্তে বিরাজ করার অভিশাপ দেন। দুই দেবী ভগবান বিষ্ণুর কাছে শাপ থেকে উদ্ধার হবার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। ভগবান বিষ্ণু বললেন জগৎ বাসীর কল্যাণের জন্যই মহামায়া তাদের দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে এমন কাজ করেছেন। দু'জনে অংশত নদীরূপে পৃথিবীতে বিরাজমান থেকে জগৎবাসীর কল্যাণ করবেন। ক্রোধ বশতঃ তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিশম্পাত করে বৈকুণ্ঠে থাকার অধিকার হারিয়েছেন। তাই দেবী সরস্বতী মূলত ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মার ঘরণী হয়ে এবং গঙ্গা প্রধানত কৈলাশে শিবের ঘরণী হয়ে থাকবেন। দুই দেবী দুই লোকে থাকলেও সর্বদা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় মগ্ন থাকেন। দেবী কমলা তাই গঙ্গার সখীরূপে গঙ্গার সঙ্গে নারায়ণ সেবা করছেন।

পশু-পাখী প্রহরে প্রহরে জাগে। দুর্গের ভেতরে এবং বাইরে বেশ কয়েকটা প্রাচীন গাছ রয়েছে। ঐ সব গাছে রাতে প্রচুর পাখী আশ্রয় নেয়। এরা প্রতি প্রহরে প্রকৃতির নিয়মানুসারে নিজেদের ভাষায় নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করে। প্রহরীরা পাখীদের কথাবার্তা শুনে রাতের প্রহর নির্দ্ধারণ করে। ঘন্টা ধ্বনি করে দুর্গের ঘুমন্ত সৈনিকদের কাছে প্রহরীদের কর্তব্যের বার্তা পৌঁছে দেয়। যুদ্ধ বিগ্রহ না বাঁধলে সৈনিকদের কাজ বলতে কিছুই থাকে না। কয়েকজন মিলে বনে শিকারে গিয়ে বন্যপশু শিকার করে নিয়ে আসে। কোন দল বনে রান্নার কাঠ সংগ্রহে যায়। বাকী সময় অলস অবসরে গল্পের ও মদের আসরে কাটাতে হয়।

বৃষ্টি কমেছে। পুরোহিত গঙ্গাধর কল্যাণদেবকে বললেন— কল্যাণদেব, এবার তোমাদের উঠার সময় হয়ে এলো। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, দেবী কমলা হয়তো মায়ের আকর্ষণে কমলা সাগর দীঘিতেই স্থান নিয়েছেন। আমার

সুদীর্ঘকালের পুরোহিত জীবনে কয়েকবার এক পরমা সুন্দরী মহিলাকে দীঘির জলে হাঁটতে দেখেছি। ভগবান বিষ্ণু যেমন সর্বদা অলংকার ভূষিত থাকতে ভালবাসেন লক্ষ্মী দেবীও তেমনি সর্বদা স্বামীর মন খুশী রাখতে বিভিন্ন অলংকারে সুসজ্জিতা থাকেন। মহারাণী কমলা সখী কমলাকে রাজ ভাণ্ডার থেকে প্রচুর অলংকার দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর প্রীতির জন্য সাজিয়ে রাখতেন। জলে সমাধী নেবার সময়ও তিনি বিভিন্ন অলংকারে সুসজ্জিতা ছিলেন। আমার দেখা সেই সুসজ্জিতা পরমাসুন্দরী রমনী কমলা দেবী বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

— কয়েকজন সৈনিকও সেই দেবীকে কয়েকবার দীঘির জলে ঘুরতে দেখেছে। তিনি আমাদের কল্যাণের জন্যই হয়তো এই দীঘিতে বাস করছেন। আমি কখনো সেই সৌভাগ্য লাভ করিনি। না দেখা সেই দেবীকে আমি সহস্র প্রণাম জানাই। প্রার্থনা জানাই তিনি সর্বদা আমাদের মঙ্গল করুন। চলো লতিকা, দুর্গের ভেতরে চলে যাই।

দেবীর পূজোর জন্য একটি ফুলের বাগান রয়েছে। মা কালী রক্তজবা পছন্দ করেন। তাই দীঘির এক পাড়ে সার বেঁধে লাগানো হয়েছে হরেক জাতের রক্ত জবাব গাছ। প্রতিদিন শত শত বিভিন্ন জাতের লাল জবা ফুটে। বাঁশের তৈরী বড় ফুলের সাঁজি ভর্ত্তি করে গোপাল মায়ের জন্য ফুল নিয়ে আসেন।

গোপাল শেষ প্রহরে ভোর হবার আগেই মায়ের পূজোর ফুল সংগ্রহ করেন। ভোর হলেই ভ্রমরেরা ফুলের মধু সংগ্রহ করতে ফুলে ফুলে এসে বসে। ফুল উচ্ছিষ্ট করে দেয়। ফুল উচ্ছিষ্ট হবার আগেই গোপাল গাছ থেকে ফুল সংগ্রহ করে নেয়। বৃষ্টিও অনেক সময়েই শেষ প্রহরের কিছু সময় বিরাম দেয়।

একদিন গোপাল ফুল তুলছিল হঠাৎ দেখতে পেলো আবছা অন্ধকারে কে যেন মায়ের মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গোপাল ভাবলো দুর্গের কোন সৈনিক কর্তব্য শেষ করে দীঘির জলে হাত মুখ ধোয়ে দুর্গে ফিরে যাচ্ছে। দুর্গে এবং মন্দিরে যাওয়ার একটাই পথ। মন্দিরের কাছে গিয়ে একটি পথ বাঁ দিকে বাঁক্ নিয়ে মন্দিরে ঢুকে গেছে। অন্য পথটি ডান দিকে বাঁক নিয়ে সেনাপতির ঘরের দিকে চলে গেছে। গোপাল ফুল নিয়ে মন্দিরে ঢোকার মুখে বেল গাছের দিকে তাকালো। প্রতিদিন ফুল তুলে ফুলের সাজি মন্দিরে রেখে বাঁশ দিয়ে বেল পাতা সংগ্রহ করে। অন্ধকারে বেল গাছের নীচে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে দেখতে পেলো। গুরুত্ব না দিয়ে সে মন্দিরে ঢুকলো। গর্জন গাছের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। বাঁশের বেড়া। মায়ের মুখ আলো ছাড়াই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। গোপাল প্রদীপ জ্বেলে মন্দিরের চালায় ঠেস দিয়ে রাখা একটি বাঁশ সংগ্রহ করে বেলতলায় গেলো। মন্দির থেকে বেল গাছের দূরত্ব পনেরো বিশ হাত। বেলতলায় গিয়ে বেল গাছের নীচে দামী কাপড়ে ছোট্ট একটি শিশুকে হাত পা নাড়তে দেখে গোপালের মনে হলো এই শিশুটি নির্ঘাৎ অপদেবতা। এক্ষুণি তাকে ধরবে। ঘাড় মটকাবে। সে অপদেবতা, অপদেবতা বলে চিৎকার করে দৌড়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেলো। তার চিৎকারে ভোরের উষালগ্নের নিরবতা ভঙ্গ হলো।

কল্যাণ দেবতার দেহরক্ষী এবং অধিকাংশ সৈনিক মন্দিরের দিকে ছুটে এলো। অনেকেই ভাবলো আবছা অন্ধকারে শত্রু পক্ষের কোন গুপ্তচর হয়তো দুর্গের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছে।

বেলগাছের নীচে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকা শিশুটি এবার কান্না শুরু করলো। পুরোহিত গঙ্গাধর বেলতলায় গিয়ে দামী কাপড় সমেত শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। দামী কাপড় দেখে মনে হলো শিশুটি অবশ্যই কোন ধনি পরিবারের। শিশুটির বয়স তিন চার মাস। শ্যাম বর্ণা। সুদর্শনা। শিশুটি কে এখানে নিয়ে এলো সে কথা ভেবে তিনি অবাক।

গঙ্গাধর শিশুকে কোলে নিয়ে ভাল করে দেখে বললেন— এই শিশু নিশ্চয়ই কোন দেবীর মানস কন্যা। সর্ব সুলক্ষণ যুক্তা এই কন্যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক মহাসাধিকা। কমলাসাগরে জল সমাধি নেওয়া কমলা দেবাই অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণে মানব কন্যারূপে এখানে এসে হাজির হয়েছেন কিনা মা কালীই তা বলতে পারবেন।—কল্যাণ দেব, তোমাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্য খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল। মা কালী দৈবক্রমে এ সুলক্ষণা কন্যাটিকে এনে হাজির করেছেন। আশপাশের কোন মহিলা প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে ব্রাহ্ম মূহুর্তে এখানে তিন চার মাসের কন্যা সন্তান রেখে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। যে দামী কাপড়ের উপর শিশুটি শুয়ে আছে তেমন দামী কাপড় জমিদার কিংবা রাজ বাড়ীতেই থাকার সম্ভাবনা। সুতরাং এই স্থানে তেমন কোন বড় ঘরের কোন রমনী এসে এই শিশু এখানে রেখে গেছেন তেমনটাও চিন্তা করা যাচ্ছে না। দৈব ভাবে দৈব কারণেই এই শিশুর আগমন। কল্যাণ, তুমি এই শিশুকে গ্রহণ করো। কন্যার মতো প্রতিপালন করো। তোমাদের কল্যাণ হবে। এই কন্যার গুণে তুমি মান, যশ,সুখ, শান্তি সবই লাভ করতে পারবে। এই মেয়ের নাম রাখলাম ভক্তি। ভক্তি তোমার হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্ম দেবে। অনেক মহৎ কাজ তোমার মাধ্যমে সম্পন্ন করাবে।

— ঠাকুর মশাই আপনার আদেশ শিরোধার্য করে আমি আমার পুত্র গোবিন্দ এবং জগন্নাথ যেমন ভাবে মানুষ হবে এবং ভবিষ্যতে যে ভাবে জীবন কাটাবে এই কন্যাও যেন সে রকম সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করতে পারে আমি তেমনটা করবো।

—অমিও তোমার কাছ থেকে তেমনটাই আশা করি। উদয়পুরে তোমার দ্বিতীয় পত্নী মঙ্গলা রয়েছে। মঙ্গলারও তো দুই পুত্র। মঙ্গলার পুত্রগণ কি তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকবে ?

— ঠাকুর মশায়, আপনি মঙ্গলাকেও জানেন। মঙ্গলা অত্যন্ত বদরাগী। আমার উপর যে গুরুভার মহারাজ ন্যস্ত করেছেন সে দায়িত্ব পালন করাই হলো আমার পরম কর্তব্য। রাজার সেনাপতি হিসেবে রাজ্যের কল্যাণে একজন নিষ্ঠাবান সৈনিকের দায়িত্ব পালন করা, যার কৃপায় আমরা প্রতি মুহুর্তে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছি সেই ভগবান বিষ্ণু, শিব, কালী প্রভৃতি দেব দেবীর পূজা পার্বণ সঠিক ভাবে পালন করা আমার জীবনের

ব্রত বলেই মনে করি। মঙ্গলা ভোগ-বিলাস ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে রাজী নয়। এক সেনাপতির স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর যেমন চলা উচিত তেমনটাও মঙ্গলা মানতে রাজী হয়নি। তার দুই ছেলে — যাদব ও রাজবলাই মায়ের সঙ্গে দাদুর বাড়ীতে বাস করছে। আমার গোবিন্দ ও জগন্নাথ যেমন ভাবে থাকবে ঐ দুই সন্তানও তেমনভাবে যাতে থাকতে পারে আমি সে ব্যবস্থা করবো। মঙ্গলার বাবা তথা আমার শ্বশুর ও সেনাপতি। ভাত কাপড়ের কো অভাব মঙ্গলার হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হয়তো অভাব হবে না। তাই ঐ দুই সন্তানকে আমি আমার কাছে কোন সময় আনতে পারবো কিনা, রাখতে পারবো কিনা জানি না। তাই এই মুহূর্তে আমার গোবিন্দ ও জগন্নাথের কথাই স্মরণে এলো। মেয়েটি তাদের বোনের অভাব দূর করবে।

— তুমি ঠিকই বলেছো বাবা । ভক্তি তোমার ঘরে এসেছে তোমার আকুল প্রার্থনায়। তুমি দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ। ভক্তি ও বিশ্বাস ছাড়া ভগবান লাভ হয়না। নারায়ণ ভক্তকে ভক্তি ও বিশ্বাস দান করেন। অন্য দেব দেবীগণ ভক্তকে তার অভিলষিত বর প্রদান করেন ।

ধন, জন, খ্যাতি, যশ প্রভৃতি মানুষকে জগতের মধ্যে অমর করে রাখে। ভগবান লাভ করতে হলে, বৈকুণ্ঠে বাস করতে হলে হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসের আলো জাগরিত করতেই হবে। তোমার মধ্যে ক্ষমতা আছে। তোমার কল্যাণ হউক। দেবী কালী পরম বিষ্ণুভক্ত। দেবী ভাগবতে মহর্ষি ব্যাসদেব লিখেছেন—

প্রধানা অংশ স্বরূপা সা কালী কমললোচনা'
দুর্গা ললাট সম্ভূতা রণে শুম্ভ নিশুম্ভয়োঃ ।।
দুর্গা অর্দ্ধাংশ স্বরূপা সা গুণেন তেজসা সমা।
কোটি সর্ব সমা জুষ্ট পুষ্ট উজ্জ্বল বিগ্রহ ।।
প্রধানা সর্ব শক্তিনাং বলাবলবতী পরা।
সর্বসিদ্ধি প্রদা দেবী পরমা যোগরূপিনী।।
কৃষ্ণ ভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈ র্গুণৈ।
কৃষ্ণ ভাবনয়া শশ্বত কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী ।।

মহর্ষি ব্যাসদেব দেবী ভাগবতের নবম স্কন্দে দেবী কালীর সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তোমাকে শুনালাম।

— ঠাকুর মশায়, সংস্কৃত ভাষা আমি আপনাদের মুখেই শুনি। ভাষাটি সার্বজনীন নয় বলে ঐসব শ্লোকের অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা। আমি ভক্তিকেসংস্কৃত ভাষায় বিদূষী করে তুলতে চাই। আপনি দয়া করে ভক্তিকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দান করুন। দেবী কালী সম্পর্কে যে শ্লোক আমাকে শুনালেন দয়া করে তার বাংলা অনুবাদ আমাকে শুনান।

— বাবা, যে শ্লোকগুলো তোমাকে শুনালাম তার বাংলা অনুবাদ করলে হবে—

প্রকৃতির প্রধান অংশরূপিনী কমলনয়না কালী শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে দেবী দুর্গার ললাট থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশ রূপিনী হলেও রূপে গুণে এবং তেজে দেবী দুর্গার সমান। তার রূপ কোটি সূর্য্যের মতো উজ্জ্বল। সমস্ত শক্তির মধ্যে প্রধান বল স্বরূপা এবং পরম বলবতী। তিনি সর্বসিদ্ধি দানকারী এবং ভক্তি, মুক্তি প্রদায়িনী। তিনি কৃষ্ণ ভক্তা, কৃষ্ণতুল্যা কৃষ্ণের ধ্যান করতে করতেই তিনি কৃষ্ণের মতো রূপ লাভ করেছেন। হে কল্যাণদেব সেই পরমা শক্তি কালীর ভজনা করলে তিনি বিশ্বাস, ভক্তি এবং জাগতিক সুখ সম্পদ দান করে থাকেন ।

কল্যাণ, পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে জগৎ সৃষ্টি করে ভক্তের সঙ্গে নিত্যলীলা করছেন। মায়ারূপী অসুরদের বিনাস সাধন করছেন। আমরা মায়ার পাশে আবদ্ধ হয়ে ভগবানকে ভুলে জাগতিক সুখের জন্য পাগল হয়ে পড়ি। সুখের সন্ধানে গিয়ে দুঃখের ভাগই বেশী করে কপালে জুটে। তবুও আশায় বুক বেঁধে আমরা আমাদের চলার পথে এগিয়ে যাই।

— ভগবান শ্রীহরির ইচ্ছে মাত্র জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল। আপনি সৃষ্টির কথা সংক্ষেপে আমায় বলুন।

— তুমি ভাগ্যবান ও পূণ্যবান। দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ। তাই দেব-দেবীর লীলা কথা শুনিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। ব্যাসদেব ১৮টি পুরাণ এবং ১৮টি উপ পুরাণ রচনা করেছেন। প্রত্যেক পুরাণেই সৃষ্টির বর্ণনা রয়েছে।

তোমাকে সংক্ষেপে সৃষ্টি কথা বলবো । তুমি সেনাপতি, ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকজন সেনাপতির ভাগ্যেই রাজসিংহাসন লাভ হয়েছে। কে বলতে পারে তুমি হয়তো একদিন ত্রিপুরার সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করবে.

— আপনি হাসালেন ঠাকুর মশায় । ত্রিপুরার সিংহাসনে বসার ভাগ্য নিয়ে এলে আমি রাজধানীতেই থাকতাম। কৈলারগড় বিদেশীদের আক্রমণের প্রধান স্থান । যিনি এই দুর্গের সেনাপতি থাকেন তাকে সব সময় দু'পা মৃত্যুর দিকে দিয়ে রাখতে হয়।

— মহারাজ অমর মাণিক্য, মহারাজ উদয় মাণিক্য দু'জনেই এক সময় কৈলাগড় দুর্গের সেনাপতি রূপে তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। রায় কচাক্ ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন তিনিও এক সময় কৈলাগড়ের সেনা প্রধান ছিলেন । কাজেই কৈলাগড়ের সেনাপতি পদে যারা কর্তব্যরত থাকেন তাদের ভাগ্যবান বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । যা হউক। তোমাকে সৃষ্টির কথাই সংক্ষেপে বলছি ।

পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার। তাঁর রূপ অনন্ত। তাই তিনি অরূপ। তিনি গুণাতিত । অনন্ত গুণের অধিকারী। তাই তিনি নির্গুণ । সেই পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাকার রূপ ধারণ করে লীলা প্রকাশের কথা ভাবলেন। ভাবনা মাত্রই তিনি জলধর দ্বিভূজ পরম রূপবান এক পুরুষের রূপ ধারণ করলেন। তিনি হলেন প্রথম সাকার ব্রহ্ম ।

তিনি সৃষ্টির মানসে তার বামভাগ থেকে পরমা সুন্দরী এক দেবীর সৃষ্টি করলেন। তিনি পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি জগৎজননী রাধিকা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবীকে নিয়ে দিব্য সহস্র বৎসর রতিক্রিয়া করলেন। দেবীর নিঃশ্বাস থেকে সৃষ্টি হলো বায়ুর। শ্রমজল থেকে সৃষ্টি হলো মহাসমুদ্র। দিব্য সহস্র বৎসর রতিক্রিয়ার পর দেবী পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি মহামায়া গর্ভধারণ করলেন। দিব্য সহস্র বৎসর গর্ভ ধারণ করার পর তিনি এক বিশাল ডিম প্রসব করলেন। ডিম প্রসব করে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সেই ডিম তিনি তার শ্রমজল থেকে সৃষ্ট সমুদ্রে নিক্ষেপ করেলন।

দেবী সেই ডিম সমুদ্রে নিক্ষেপ করায় পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি দেবীকে অভিশাপ দিলেন। দেবী রাধারাণী দেবী রাধারাণী ভবিষ্যতে আর কোন সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন না। ফলে সৃষ্টি কার্য ব্যহত হলো। সৃষ্টি কার্যে সহায়তার জন্য দেবী রাধারাণী দু'ভাগ হলেন। বাম ভাগ থেকে সৃষ্টি করলেন এক দেবী। নাম লক্ষ্মী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভক্ত হলেন। তার ডান ভাগ থেকে আবির্ভূত হলেন চর্তুভুজ ভগবান বিষ্ণু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভগবান বিষ্ণু দেবী লক্ষ্মীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী মহামায়া তথা রাধাকে যখন অভিশাপ দান করেন তখন তাঁর জিহ্বা থেকে এক চর্তুভূজা দেবী আর্বিভূত হন। তার এক হাতে অভয় মুদ্রা, এক হাতে বরা ভয়, এক হাতে বীণা, এক হাতে বেদ গ্রন্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবীর নাম রাখেন সরস্বতী। শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবীকেও ভগবান বিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছে অনুসারে তাঁর ডান ভাগ থেকে আরও এক দেবীর সৃষ্টি হলো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু মায়ারূপী ঐ দেবীর নাম রখেন দুর্গা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার বিভক্ত হলেন তাঁর ডান ভাগ থেকে আবির্ভূত হলেন এক দিব্যপুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই দিব্য পুরুষের নাম রাখেন মহাদেব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী দুর্গাকে মহাদেব এর হাতে সমর্পণ করেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ারূপী রাধারাণী আবার বিভক্ত হলেন তার বামভাগ থেকে আবির্ভূত হলেন এক দেবী, দেবী রাধারাণী সেই দেবীর নাম রাখেন সাবিত্রী। ভগবান বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে সৃষ্টি হয় এক পদ্ম। সেই পদ্মের উপর চতুর্ভূজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন।

ভগবান শিবকে শয়ম্ভু বা দেবাদিদেব নামেও অভিহিত করা হয়।

দেব-দেবীগণ সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের নিমিত্ত আরও দেব-দেবীর সৃষ্টি করতে থাকেন। ভগবান ব্রহ্মাকে জগৎ সৃষ্টির ভার দেওয়া হয়। ভগবান বিষ্ণু জগৎ পালনের এবং ভগবান শিব জগৎ সংহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জগৎ সৃষ্টির মানসে ব্রহ্মা প্রথমে সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নামক চার মানস সন্তানের সৃষ্টি করেন। তারা সকলেই

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকায় ভগবান ব্রহ্মা আবার বার মানস সন্তানের সৃষ্টি করেন। দক্ষ, কশ্যপ প্রভৃতি মানস সন্তানগণ জগৎ সৃষ্টি করতে থাকেন।

পাঁচ মহা প্রকৃতি দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং সাবিত্রীর পর আবির্ভূতা হন তুলসী, কালী, ষষ্ঠী, মনসা, মঙ্গল চণ্ডী, স্বাহা, স্বধা, রিদ্ধি, সিদ্ধি, পুষ্টি, তুষ্টি, স্বস্তি প্রভৃতি। ঐসব দেবী ষোড়শ মাতৃকা নামে পরিচিতা। অগ্নিদেব— স্বাহাকে, যজ্ঞদেব দক্ষিণা ও দীক্ষাকে পিতৃগণ স্বধাকে, বায়ু স্বস্তিকে, গণেশ রিদ্ধি, সিদ্ধি এবং পুষ্টিকে ঈশান- সম্পত্তিকে, কপিল - ধৃতিকে, সত্যদেব-সতীকে, ক্রিয়া উদ্যোগকে, অধর্ম মিথ্যাকে, সুশীল শান্তি ও লজ্জাকে, জ্ঞান বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিকে, ধর্ম-মূর্ত্তিকে, রুদ্র - নিদ্রাকে, লোভ- ক্ষুধা ও পিপাসাকে, কাল- জরা ও মৃত্যুকে, সুখ-প্রীতি ও তন্দ্রাকে বৈরাগ্য— ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে, কশ্যপ দিতি, অদিতি, কদ্রু, বিনতা, দনুকে, চন্দ্র রুহিনীকে, সূর্য-সজ্ঞাকে, মনু- শতরূপাকে, গৌতম অহল্যাকে, দক্ষ- প্রসুতিকে। হিমালয়- মেনকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে সৃষ্টি কার্যে ব্রহ্মাকে সহায়তা করতে থাকেন।

দেবী রাধারাণী যে ডিম সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলেন দিব্য সহস্র বৎসর জলের নীচে পড়ে থাকা ডিমের ভেতরে সৃষ্টি হলেন এক দিব্য পুরুষ। তিনি মহা বিষ্ণু এবং মহা নারায়ণ নামে অভিহিত হলেন। সেই দিব্য পুরুষ বা মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান ব্রহ্মা। মহাবিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে সৃষ্টি হলো দুই পুরুষের নারায়ণ ঐ দুই পুরুষের নাম রাখেন মধু ও কৈটভ্। মহা পরাক্রমশালী ঐ পুরুষদ্বয় জলের নীচ থেকে উপরে উঠে মহাশূন্যে পদ্মের উপরে ভগবান ব্রহ্মাকে ধ্যানস্থ দেখে কোলাহল করে ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন — তুমি কার ধ্যান করছো ? ব্রহ্মা বললেন — পরম ব্রহ্ম শ্রী হরির ধ্যান করছি। মধু ও কৈটভ্ ব্রহ্মাকে তাদের অরাধনা করতে বললেন। ব্রহ্মা রাজী হলেন না। তখন ব্রহ্মা ও মধু কৈটভের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। ব্রহ্মা ভগবান শ্রী হরিকে স্মরণ করতে লাগলেন।

ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে রক্ষা করতে ছুটে এলেন। বিষ্ণুর সঙ্গে দুই দৈত্যের সহস্র দিব্য বৎসর যুদ্ধ হলো। তিন জনেই ক্লান্ত। মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দুই দৈত্য বিষ্ণুকে বর চাইতে বললেন। ভগবান বিষ্ণু বললেন — তোমরা আমার বধ্য হও। দৈত্যদ্বয় বললেন — আমাদের এমন স্থানে বধ করো যা স্বর্গ, মর্ত্ত, জল কোনটাই না হয়। বিষ্ণু দুই দৈত্যকে উরুর উপরে রেখে বধ করলেন। তাদের শরীরের মেদ থেকে সৃষ্টি হলো মেদিনী বা পৃথিবী। কল্যাণ, কোটি কোটি বছর ধরে ২৮টি যুগে লক্ষ লক্ষ মুনি ও ঋষি তাদের লব্ধ জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের জন্য রেখে গেছেন। এক জন্মে কারো পক্ষে সনাতন ধর্মের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাই শাস্ত্র কথা আজ এই পর্যন্তই থাকুক। যে মেয়েকে পেয়েছো তাকে দেখো — এই মেয়ে তোমাদের কল্যাণ করবে। তুমি লতিকাকে খবর দাও সে একে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করুক।

লতিকা দেবী লোকমুখে খবর পেয়ে মন্দিরে ছুটে আসেন। শিশুটি বড় বড় চোখে অবাক হয়ে যেন সবাইকে দেখছে। লতিকা দেবী শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। পুরোহিত গঙ্গাধর বললেন — মা, তোমার তো একটি মেয়ের জন্য খুব আকাংখা ছিলো, মা স্বয়ং তোমার কাছে এই দৈব শিশুটি পাঠিয়ে দিলেন। এর মধ্যে অনেক সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মেয়ে তোমাদের ঘরে সৌভাগ্যবতী হয়ে এসেছে। আমি ওর নাম রেখেছি ভক্তি। তোমরা একে ভক্তি নামেই ডাকবে।

— তাই হবে বাবা, মেয়েটিকে পেয়ে আমি সত্যিই মহাখুশী।

লতিকার কোলে চড়ে চার মাসের কন্যা ভক্তি চলে এলো লতিকার ঘরে। এই দৈব শিশু লতিকার স্নেহ-ভালবাসায় বড় হতে থাকলো। লতিকার প্রিয় দাসী রঞ্জনা। রঞ্জনার উপর ভার পড়লো মেয়ের যত্নের ও সেবার। রঞ্জনা লতিকাকে কোলে পিঠে করেছে। লতিকার দুই ছেলে গোবিন্দ এবং জগন্নাথকে কোলে পিঠে করেছে। এই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকন্যার সেবার ভার পেয়ে সে মহাখুশী। একটি শিশু একজনকে অফুরন্ত অবসরের হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারে। শিশু সেবায় যে আনন্দ পাওয়া যায় ভগবানের সেবাতেও সে আনন্দ পাওয়া যায় না। শিশুর সরল মিষ্টি হাসি একজনকে সুখের চরম সীমায় পৌঁছে দিতে পারে। ভগবান শিশুর মধ্যে বিরাজ করেন বলেই শিশু সেবায় এত সুখ, এত আনন্দ। পরম ভক্ত হলেই শিশু সেবায় এত সুখ, এত আনন্দ পাওয়া যায়। পরম ভক্ত না হলে ভগবানের সেবা করেও আনন্দ পাওয়া যায় না। শিশুর সেবা করে হিংস্র পশুও আনন্দ লাভ করতে পারে। হিংস্র বাঘিনীর মধ্যেও তাই মাতৃভাব জাগে। সন্তানের সেবা করে। তাই শিশু সেবার মতো পরমানন্দ আর কিছুতেই নেই।

ভক্তির আবির্ভাব দিনকেই জন্মদিন বলে ধরে নিলো লতিকা দেবীরা। এমনি করে এক বছর চলে যাওয়ার পর ভক্তির প্রথম জন্মদিন মহা ধুমধাম করে কৈলাগড় দুর্গে পালিত হলো। রঞ্জনার কোলে চড়ে সে চলে আসে কালী নন্দিরে। মন্দিরে মহারাজ বিজয় মাণিক্য মাটির বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। সৈনিক কালীপদের কুড়িয়ে পাওয়া পাথরও পূজিতা হচ্ছেন। বিগ্রহের একটা রূপ আছে, সেই রূপ ধ্যান করলে তাড়াতাড়ি মনঃসংযোগ ঘটে। সে জন্যই বিজয় মাণিক্য মাটির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গোবিন্দ আর জগন্নাথের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন সেনাপতি পরমজিৎকে পরমজিৎ হাজারী দীর্ঘদিন চাকুরী করে অবসর নিয়েছেন। কল্যাণদেব পরমজিৎকে কৈলাগড়ে কর্মরত সৈনিকদের ছেলেদের শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছেন। কল্যাণদেব এক সময় পরমজিৎ এর অধীনে চাকুরী করেছেন। এক হাজারী থেকে পাঁচ হাজারী সেনাপতি হবার পর কৈলাগড়ের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। দায়িত্ব নিয়ে তিনি পরমজিৎকে কৈলাগড় নিয়ে এসেছেন ছেলেদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য। গোবিন্দ দশ ও জগন্নাথ আট বছরে পা দিয়েছে। ভক্তি পাঁচ বছরে পা দিয়েছে। ভক্তির শিক্ষার ভার স্বয়ং লতিকা দেবী গ্রহণ

করেছেন। দুই ছেলে গোবিন্দ আর জগন্নাথ শিক্ষক পরমজিৎ এর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে। পরমজীৎ একজন দক্ষ যোদ্ধা এবং ভগবান শিব এর পরম সেবক। পরমজিৎ এর বাড়ীতে সর্বদা পাথরের শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। পরম জিৎ এর বাড়ী পিলাক। শেষ সময়ে ভগবান শিব এর সেবা করে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কল্যাণদেব এর অনুরোধে চার বছরের জন্য গড়ের কিশোরদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গোবিন্দ আর জগন্নাথ পরমজিৎকে দাদু বলে ডাকেন। পরমজিৎকে একটি সুন্দর ছন-বাঁশের চালা ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে সৈনিকদের থাকার লম্বা ছন-বাঁশের ঘর। মাঝখানে বিশাল মাঠ। এই মাঠেই সুরক্ষিত স্থানে এবং সাধারণ মানুষের অগোচরে কিশোরদের সামরিক শিক্ষা চলছে।

এক বিকেলে কিশোরী মেয়ে ভক্তি সহ কল্যাণদেব মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন। ভক্তি জিজ্ঞেস করলো বাবা, ঐ পাথরটি এখানে রাখা হয়েছে কেন ?

কালীপদ নামে এক ভক্ত স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন দেবী কালীর বিগ্রহরূপে এই পাথর প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই পাথর অনেক বছর কালীরূপে পূজিতা হয়েছেন। প্রতিমা গড়ে পূজা করলে বেশী আনন্দ পাওয়া যায় তাই মহারাজ বিজয় মাণিক্য মাটির প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাথরটিও সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে।

— বাবা, প্রতিমা গড়ে পূজা করলে যদি আনন্দ বেশী হয় তাহলে এই পাথর দিয়ে কি দেবী কালীর প্রতিমা তৈরী করা যায় না?

মেয়ে ভক্তির কথা শুনে চমকে উঠেন কল্যাণদেব। তাইতো ! কোন ভাস্কর দিয়ে এই পাথর কেটে অনায়াসে প্রতিমা গড়া যেতে পারে। মেয়েকে বললেন— মা, তুমি ঠিক্ কথাই বলেছ। এই পাথর দিয়ে দেবী কালীর প্রতিমা গড়া যেতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পাথর দিয়ে দেবী কালীর প্রতিমা গড়ার চেষ্টা করবো। মায়ের তথা ভগবানের কৃপা না হলে কোন মহৎ কাজই করা সম্ভব হয় না। মায়ের কাজ মা করবেন। মানুষ তো উপলক্ষ মাত্র। তোমার কল্যাণ হউক মা, তুমি আমাকে এক ভাবনা থেকে মুক্ত করেছ। আমিও দু'একবার একই কথা ভাবছিলাম। মা তোমার মাধ্যমে সে কথা পরিস্কার করে দিলেন। কল্যাণদের অনুচরদের দিয়ে খোঁজ খবর করে ঢাকা থেকে এক ভাস্করকে নিয়ে এলেন। ভাস্কর এক বছরের মধ্যে পাথর থেকে প্রতিমা তৈরীর প্রতিশ্রুতি দিলেন।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে যে পাথরটিতুলে পূজো করা হচ্ছিল, ভক্তির কথা শুনে কল্যাণদেব ঢাকা থেকে ভাস্কর শিল্পী আনিয়ে সেই পাথর দিয়ে বিগ্রহ তৈরীর কাজ শুরু করলেন। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। দীঘির পাড়ে ছোট্ট একটি ছন বাঁশের ঘর তুলে দেওয়া হলো শিল্পীর জন্য। শিল্পীদের যাতে কেউ বিরক্ত না করে প্রহরীদের সে নির্দেশও দিয়ে দেওয়া হলো।

দুর্গের অনেকেই শেষ প্রহরে জেগে উঠেন। কল্যাণদেব নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন দুর্গের সবাই যেন এক সঙ্গে মদ গ্রহণ না করেন। পালা করে এক চতুর্থাংশ সৈন্য মদ পান করতে

পারেন। শেষ প্রহরে ঘুম থেকে উঠে শরীর ঠিক্ রাখার জন্য শরীর চর্চা আবশ্যিক্ করে দেওয়া হয়েছে। কমলানগর থেকে সাত মাইল দূরে এক সমৃদ্ধ জনপদ আছে। সেই জনপদের ভবতোষ চৌধুরী নামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে পাথরের একটি দুর্গা প্রতিমা রয়েছে। ভবতোষের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামক গ্রামের সম্পন্ন কৃষক ছিলেন। হুসেন শাহের সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ বিস্তৃর্ণ জনপদ মুসলমানদের দখলে চলে যাওয়ায় ভবতোষের ঠাকুর্দা দুর্গা প্রতিমা মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করতে বর্তমান জনপদে চলে আসেন। দেবী দুর্গার নাম অনুসারে ঐ গ্রামের নাম হয় দেবীপুর। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, মহারাজ বিজয় মাণিক্যের সময় মুসলমানরা সেই বিগ্রহ নষ্ট করে দিয়েছে।

শিল্পী দিনের বেলায় বিগ্রহ তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যার সামান্য আগে হাতমুখ ধোয়ে মন্দিরে এসে বসেন। পুরোহিত গঙ্গাধরের সঙ্গে জীবনের অতিত, বর্তমান, ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিদিনের মতো আজো এসে বসেছেন। সেবক গোপাল আরতির আয়োজন করছে। মাটির উঁচু বারান্দায় পুরোহিত গঙ্গাধর আর শিল্পী অনিল সেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেন।

শিল্পীর আদি বাড়ী ছিলো গৌড়ের পাণ্ডুয়া এলাকায়। পূর্বপুরুষরা এক সময় বিজয় গড়ের বাসিন্দা ছিলেন। কয়েকপুরুষ আগে কাজের সন্ধ্যানে চলে আসেন পাণ্ডুয়ায়। পুরুষানুক্রমে তারা পাথর কেটে বিগ্রহ তৈরী করছেন। এই পরিবার কত পাথরের প্রতিমাই না সৃষ্টি করেছেন। সেসব বিগ্রহ হাত এবং স্থান বদল হয়ে কোথায় গিয়ে পুজো পাচ্ছেন কেউ জানে না। মুসলমান শাসকগণ তাদের আটশো বছরের শাসনে কত লক্ষ প্রতিমা ধ্বংস করেছে তার হিসেব কোন ইতিহাসবিদ লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি।

অনিল সেন এর পাঁচ জনের সংসার। স্বামী-স্ত্রী আর তিন ছেলে মেয়ে। বড় ছেলে বিগ্রহ তৈরীর কাজে বাবাকে সাহায্য করে। ছোট ছেলের বয়স আট। এখনো কাজ করার উপযুক্ত হয়নি। বড় ছেলেকে বাড়ীর রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন। ঢাকার নবাবের আদেশে হিন্দুরা ঘরে উলুধ্বনি দিতে পারে না। কোন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জোরে কীর্তন করতে পারেন না। ঢাকার নবারের এই আদেশের অন্যথা হলে বেত্রাঘাত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অনিল সেন ছোট খাট কাজ ছেলেকে নিয়ে বাড়ীতেই করে। বড় বিগ্রহ তৈরীর আদেশ পেলে বড় ছেলেকে বাড়ী রেখে অন্য কোন সহযোগী নিয়ে আসে। সহযোগী কিছু পর পর বাটালীতে শান দিয়ে শিল্পীর কাজে সহায়তা করে। কোন সময় পাথর নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামে তাই কাঁসর-ঘন্টা, খোল-করতালের ধ্বনি শোনা যায়না। শোনা যায় না হিন্দু রমনীদের উলুধ্বনী।

হিন্দু পরিবারে মহিলাদের মধ্যে ঘোমটা প্রথা ছিলনা। ভারতে মুসলমান আক্রমণ এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকার ক্ষমতা দখলের পর হিন্দু মহিলাদের জীবনে এক বিভীষিকাময় সময় এসে হাজির হয়েছে। যুবতী মেয়ে এবং বঁধুদের শ্লীলতাহানীর পাশাপাশি তাদের

ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে চলে আসছে। কোন সুন্দরী মেয়ে কিংবা বঁধু মুসলমান সৈন্যদের কাম লালসা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। নারীর সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে নারীর শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ হয়ে গেছে। নিজের শরীরকে আড়াল করতে, চেহারাকে আড়াল করতে সুশ্রী কন্যা এবং বঁধু ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে চলাফেরা করছেন । মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই ঘোমটা প্রথা ।

বৈদিক যুগে নারীদের পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন আশ্রমে শিক্ষা দেওয়ার রিতি চালু ছিল। রামায়ণে মহর্ষি বাল্মিকী তাঁর আশ্রমের যে চিত্র রামায়ণে তুলে ধরেছেন তাতে বহু ঋষি কন্যা ঐ আশ্রমে শিক্ষা লাভ করতেন বলে জানা যায়। জল আনতে গিয়ে আশ্রম কন্যাগণ সীতাদেবীকে আবিস্কার করেন। তিনি অসহায় এবং একাকী জেনে আশ্রমে মহর্ষি বাল্মিকীর কাছে নিয়ে আসেন। মহর্ষি বাল্মিকী ধ্যান বলে সীতার প্রকৃত পরিচয় এবং এই বনে আসার কারণ জানতে পারেন। বাল্মিকীর আশ্রমে অন্যান্য আশ্রম কন্যা এবং মুনি পত্নীদের সঙ্গে দেবী সীতা কয়েক বছর বাস করেছেন। দুই সন্তান লব ও কুশের জন্ম দিয়েছেন। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। রাজা হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে পুরুষোত্তম শ্রীরাম অন্তসত্বা সীতাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। লবণ দৈত্যে তার অনুচরদের দ্বারা সীতার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে অযোধ্যার প্রজাদের ঘরে ঘরে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমানের রাজনীতিকরা জনগণের কথা কমই ভাবেন। ভগবান শ্রীরামকে প্রণাম।

— অমল সেন এর সঙ্গে ভক্তির পরিচয় হয়েছে। কিশোরী ভক্তির বিগ্রহ নিয়ে বিরাট আগ্রহ। মন্দিরে শিল্পীর সঙ্গে দেখা হলেই ভক্তি জিজ্ঞেস করে মামা, মায়ের মূর্ত্তি কবে তৈরী হবে? শিল্পী উত্তর দেয়, শীঘ্রই শেষ হবে ।

— কেমন করে বিগ্রহ বানাচ্ছেন আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

— একদিন তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো।

— এমনি করে ভক্তি আর শিল্পীর মধ্যে কয়েকদিন কথা হয়েছে। খুব ভোরে ভক্তি ধাইমার সঙ্গে ফুল তুলতে যায়। সে একটি ছোট পাথরকে মা কালীরূপে ফুল-ফল দিয়ে পূজো করে। মা লতিকা মেয়েকে দেবী কালীর কাহিনী শোনায়। লতিকার ছোট বেলায় রাজ পুরোহিত রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ থেকে দেব দেবীর বিভিন্ন কাহিনী শুনিয়েছেন। লতিকা অন্দর মহলের নারীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে প্রতিদিন বিকেলে পুরোহিতের কাছ থেকে দেব-দেবীর লীলা কথা অনেক শুনেছে। দেবী কালীর সৃষ্টি কেমন করে হয়েছে, দেবী কালী কোন ভক্তকে কেমন করে কৃপা করেছেন, দেবী ত্রিপুরেশ্বরী কেমন করে চন্দ্রপুর এসেছেন সব কাহিনী কিছু কিছু করে পুরোহিতের কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি এখন ভক্তিকে শুনাচ্ছেন ।দেবী কালীর কেমন রূপ, দেখতে কেমন এসব কথা ভক্তি জানতে চায়। লতিকা যতটা জানে কিছু কিছু করে মেয়েকে শোনাতে চেষ্টা করে। ঘরে কিছু কিছু

করে মেয়েকে শোনাতে চেষ্টা করে। ঘরে একটি ছোট সিংহাসনে ভক্তির পাথররূপী কালী প্রতিষ্ঠিত । পুরোহিত দ্বারা ঐ পাথরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করানো হয়েছে। তবু হয়তো কোন একদিন এই পাথর দীঘির জলে ফেলে দিতে পারে ।

ধাইমা রঞ্জনার সঙ্গে ভক্তি প্রতিদিন ফুল তুলতে যায়। কোন কোন দিন একাই চলে যায়। ধাইমা আর লতিকা মেয়ের প্রতি সব সময় দৃষ্টি রাখে। তবুও কেমন করে যে ভক্তি দু'জনের চোখকে ফাকি দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় তারা বুঝতে পারেন না। সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে মা ও ধাইমাকে ফাকি দিয়ে ভক্তি একা দীঘির পাড়ে ফুল তুলতে চলে গেছে। ধাইমার খেয়াল হলো ভক্তি বিছানায় নেই। রঞ্জনা লতিকাকে বলে ছুটে গেলো দীঘির পাড়ে। মাঝে মাঝে এমনিভাবে ফাঁকি দিয়ে দীঘির পাড়ে চলে যায় ভক্তি । কখনো কখেনো মন্দিরের সেবক গোপালের সঙ্গে ফুলবাগানে ফুল তুলায় ব্যস্ত থাকতো। আজো মন্দিরের পাশেই গোপালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। গোপালের ঘুম থেকে উঠতে সামান্য দেরী হয়ে গেছে। আর একটা আশ্চর্য বিষয় হলো যেদিন ভক্তি একা একা দীঘির পাড়ে চলে যায় সেদিন সকলেরই ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হয়। সেদিনও সকলেরই দেরী হেয় গেল। সেজন্য গোপালও তাড়াতাড়ি ফুল তুলতে যাচ্ছিল।

গোপাল আর ধাইমা রঞ্জনা পা চালিয়ে দীঘির পাড়ের দিকে চললো। কমলাসাগর দীঘির বাঁধানো ঘাটের সামান্য দূরে দু'-পাশে দুটো বিশাল বটগাছ। ঘুম ভাঙ্গা পাখীদের কলরবে বটগাছ দুটো সকাল-সন্ধ্যায় মুখরিত থাকে। ভক্তি কোন সময় ফুল তুলতে ফুল বাগানে চলে যায়। কখনো বাঁধানো ঘাটে বসে থাকে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভক্তি, তুমি একা একা ঘাটে বসে আছো কেন? ভক্তি উত্তর দেয় একা কোথায়, আমার সঙ্গে তো এক মা থাকেন। সবাই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করেন— তোমার মা কোথা থেকে এলো ? ভক্তি উত্তর দেয় জানি না। তবে সেই মা খুব ভালো। আমাকে অনেক গল্প শোনায়।

ধাইমা সেজন্য গোপাল সহ প্রথমে ঘাটের দিকে গেলো। আবছা অন্ধকারে দু'জনেই ভক্তির পাশে এক মহিলাকে বসে থাকতে দেখলো । আর একটু এগিয়ে যেতেই সেই মহিলা অদৃশ্য হয়ে গেলো। ধাইমা আর গোপাল ভক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো — ভক্তি, তোমার পাশে যিনি ছিলেন তিনি কোথায় গেলেন?

— লুকিয়ে রয়েছেন। কেউ আসলেই সেই মা লুকিয়ে পড়েন। আজকে সেই মা'র সঙ্গে কোন কথাই বলতে পারিনি। তোমরা এসে আমার মনটা খারাপ করে দিয়েছ।

ধাইমা ভক্তির পাশে বসলো। গোপাল বললো— দিদি, তুমি বসো, আমি ফুল তুলতে চলে যাচ্ছি।

— আচ্ছা ।

ধাইমা ভক্তির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো— মা, তুমি আমাকে না বলে চলে এসেছ কেন ?

— সেই মা আমার বিছানায় এসে আমার কানে কানে বললো—ভক্তি, চলো দীঘির পাড়ে চলে যাই। ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি দীঘির পাড়ে চলে এলাম। দেখলাম সেই মা আমার জন্য বসে আছেন।

—মা, তোমার সেই মা এই দীঘির নীচে থাকেন। সুযোগ পেলে তোমায় দীঘির জলে নিয়ে যাবেন। দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, সাপ আছে তোমাকে মেরে ফেলবে।

—বড় মা খুব ভালো। আচ্ছা ধাইমা, আমি তো আরো অনেক দিন বড় মা'র সঙ্গে দীঘির পাড়ে বসে গল্প করেছি। বড় মা যদি আমার ক্ষতি করতে চাইতেন তাহলে কি আমার ক্ষতি করতে পারতেন না ? আমি যেদিন বড় মা'কে দেখার সুযোগ পাই সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়।

— ঠিক আছে মা, আর একদিন এসো। তোমাকে এখন সঙ্গে নিয়ে না গেলে তোমার বাবা আমায় দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দেবেন ।

— না ধাইমা, তোমাকে ছাড়া আমার ঘুম আসে না। তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না। চলো ঘরে যাই ।

ভক্তির সঙ্গে খেলা করতে যে সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসে তার মধ্যে রয়েছে মন্দিরের সহকারী পুরোহিত তথা সেবক গোপালের ছেলে জয়ন্ত। জয়ন্ত যখন সাতমাসের শিশু তখন কলেরা রোগে জয়ন্ত'র মা মারা যায়। মায়ের পীড়াপীড়িতে গোপাল বছর না ঘুরতেই বিয়ে করে। গোপাল তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিজ বাড়ীতে থেকে পুরোহিতের কাজ করতো। বাড়ীতে ছোট্ট একটা পুকুর। পুকুরের মাটি দিয়ে উঁচু করা জায়গায় দুটো খর ও বাঁশের তৈরী ঘর। একটা থাকার জন্য। একটা রান্নার জন্য। ঠাকুরের জন্য ছোট একটা চালা ঘর। ঘরে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত। প্রথম স্ত্রী রমা কলেরা রোগে মারা যাওয়ার প্রায় এক বছর পর মা বিদ্যাকুট গ্রামের গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে মালতীকে পুত্র বঁধু করে নিয়ে আসেন। জয়ন্ত তখন দু'বছরেও পা দেয়নি।

বিয়ের পর তিন চার মাস মালতি জয়ন্তকে খুব আদর যত্ন করতো । গোপাল আর তার মা ভেবেছিলো—মালতি জয়ন্তকে যখন আদর যত্ন করতে শুরু করেছে তখন মা হারা জয়ন্ত আর মায়ের অভাব বোধ করবে না। গোপাল এবং তার মায়ের এই ধারণা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। মালতি চার মাসের গর্ভবতী হবার পর থেকেই জয়ন্ত'র প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার শুরু করে। দু'বছরের শিশু জয়ন্ত বিমাতার এই অনাদরের কারণ বুঝতে পারতো না। কারণে অকারণে কখনো হাতে কখনো বেত দিয়ে মারতে শুরু করায় জয়ন্ত মালতিকে প্রচণ্ড ভয় পেতে শুরু করে। বিমাতা সম্পর্কে তার কোন ধাবণা জন্মায় নি। মায়ের কাছে গেলে মা মারবে এই ধারণা তার মনে জেগেছে। মায়ের অহেতুক নিষ্ঠুর শাসন থেকে সে মা থেকে দুরে থাকতে চেষ্টা করতে লাগলো। ঠাকুমার উপর সে আরো বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়লো।

গোপালের মা পুত্র বঁধুকে অনেকবার বুঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে

সন্তানের ভাবনায় মশগুল মালতিও সর্বদাই জয়ন্তকে ভুলে থাকতে এবং তার কাছ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করতে লাগলো। মালতির সঙ্গে জয়ন্তর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল।

আগের মন্দিরের সেবক মারা যাবার পর গোপাল কসবার মন্দিরে আসে। তাও কয়েক বছর আগের ঘটনা। কয়েক মাস পর সে বাড়ী যায়। গোপালের মা এসে প্রতিমাসে কল্যাণদেব এর মুন্সির কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে যায়। মা প্রতি মাসে এসে বঁধু মালতির নামে অনেক কথা বলে যায়। মালতি দু'সন্তানের জননী। গোপাল তিন সন্তানের জনক। গঙ্গাধর বিয়ে করেন নি। ছোট সময় থেকেই মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। উপনয়ন সংস্কারের পর মন্দিরে পুরোহিতের সহকারী হিসেবে চলে আসেন। ক্রমে কসবা কালীমন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব পান। মাটির প্রতিমা গঙ্গাধরের কাছে চিন্ময়ী রূপে ধরা দিয়েছেন। গঙ্গাধরের সেবায় মা খুশী। তাইতো মাটির প্রতিমাকে দর্শন করতে বহুদূর থেকেও ভক্ত এখানে চলে আসেন। কেউ বলেন কমলাসাগর দীঘির অলৌকিক কাহিনী এবং বিশালত্ব মানুষকে কমলাসাগরের কালীবাড়ীতে নিয়ে আসে।

গোপাল মায়ের মুখে প্রতিমাসেই ছেলে জয়ন্তের প্রতি স্ত্রী মালতির অমানুষিক ব্যবহারের কথা জানতে পারে। বৎসরে দু'তিনবার বাড়ী যায় গোপাল। তখন মালতি গোপালের নামে একগাদা অভিযোগ স্বামী গোপালের কাছে তুলে ধরে। গোপাল অসহায় স্বামীর মতোই মালতির অভিযোগ শুনে। মায়ের কাছে শোনা বর্ণনার সঙ্গে স্ত্রী মালতির বর্ণনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়না।

গোপাল ব্রাহ্মণের ছেলে। পাড়ার পণ্ডিতের কাছে ছেলের শিক্ষার ভার পাঁচবছরে হাতেখড়ির পরেই যে তথ্য সে প্রতিমাসে জানতে পারে তা থেকে পরিষ্কার মালতি সতীন পুত্রকে শাস্ত্রে পণ্ডিত করে তোলার পরিবর্তে মূর্খ বানিয়ে রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। প্রতিদিন সকালে জয়ন্তকে পন্ডিতের কাছে না পাঠিয়ে ধান ক্ষেতে মাছ ধরতে পাঠিয়ে দেয়। মাছ না নিয়ে ঘরে ফিরলে জয়ন্তকে মারধর করে। গোপালের মা নাতির দুঃখে চোখের জল ফেলেন। গোপালের মনের ইচ্ছে ছিল জয়ন্ত পাড়ার পণ্ডিতের কাছে কিছু মন্ত্র শিখলে উপনয়নের পর কমলাসাগর কালী মন্দিরে নিয়ে অসবে। নয় বছর বয়সে কমলাসাগর কালী মন্দিরে নিয়ে এসে ছেলের উপণয়ন সংস্কারে ভাবনা ছিল।

গোপাল যখন ছুটি নিয়ে বাড়ী যায় তখন প্রতিবারই তার পরিজনদের পরিধানের কাপড় নিয়ে যায়। হেঁটে গেলে প্রায় একদিনের পথ। কল্যাণদেব গোপালকে ঘোড়ায় করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি ভাল ঘোড়া এবং একজন ভাল অশ্বারোহী সৈন্যকে নিযুক্ত করে থাকেন। কবে গোপাল ফিরবে সেই তারিখ অনুযায়ী আবার সেই অশ্বারোহীকে গোপালের বাড়ী পাঠিয়ে কমলাসাগরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন।

একদিন বাড়ী গিয়ে গোপাল দেখতে পেলো জয়ন্ত উঠানে বসে কাঁদছে। তার সারা শরীরে কাঁদা লেগে আছে। পাশে একটি মাছ রাখার ডোলা পড়ে আছে। খালি পিঠে বেতের

আঘাত কয়েক স্থানে ফুলে রয়েছে। অশ্বারোহী বাড়ীর সামনে গোপালকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসে। বাড়ীর প্রকৃত চিত্র অশ্বারোহীর চোখে ধরা পড়ে না। গোপাল কাপড়ের ব্যাগটা মাটিতে রেখে জয়ন্তকে কাছে টেনে নিল। স্বামী এই সময়ে এসে পড়বে এমন ধারণা মালতির ছিলনা। গোপাল এলে সাধারণতঃ দুপুরে আসে। আজ দুপুরের অনেক আগে এসে পড়ায় এবং জয়ন্তকে উঠানে পড়ে কাঁদতে দেখতে পাওয়ায় স্বামী প্রচণ্ড রাগ করবেন বলে ধারণা হলো। মালতি মনে মনে শংকিত হয়ে পড়লো। নিজেকে সংযত করে মালতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীকে বললো— প্রতিদিন সকাল বেলা ওকে পণ্ডিতের বাড়ী পড়তে যেতে বলি, কিন্তু সে কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। পাড়ার শূদ্রের ছেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাবেই। আজো সকালে অনেকবার বললাম পণ্ডিতের বাড়ী যেতে, শুনলো না। ডোলা নিয়ে মাছ ধরতে চলে গেলো, ও আমাদের বাড়ীর মান সম্মান নষ্ট করছে। বামুনের ছেলে হয়ে মাছ ধরতে ক্ষেতে ও ছড়ায় চলে যাচ্ছে। পাড়ার মহিলাদের কাছে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসছে। একটু আগে কয়েকটা মাছ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। তাই রাগের বশীভূত হয়ে বেত দিয়ে কয়েকটা বাড়ি দিয়েছি। আপনি বলুন আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

গোপালের মা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে বৌমার মিথ্যে কথা শুনছিলেন। এমন মিথ্যে এমন সহজ করে কথা কেউ বলতে পারে সে ধারণা তাঁর ছিলনা। গোপাল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের দিকে তাকালো। মায়ের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলো এই পরিস্থিতিতে মা একান্তই অসহায়। গোপাল ছেলেকে মাটি থেকে উঠিয়ে আঘাতের স্থান গুলোতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো— বাবা, বড়দের কথা শুনতে হয়। এখন পুকুরে গিয়ে ভালো করে স্নান করে এসো। মাছ ধরা জেলেদের কাজ। তুমি বামুনের ছেলে হয়ে কেন খালে-বিলে মাছ ধরতে যাচ্ছ ? যাও, শীগগীর স্নান করে এসো। মালতির দিকে চেয়ে জয়ন্ত ভয়ে বাবাকে বলতে পারলো না যে বিমাতা মিথ্যে বলেছেন। মালতি স্বস্থির নিশ্বাস ফেললো। তার মনে হলো এক ঝড় ঈশ্বরের ইচ্ছেয় শান্ত হয়ে গেছে। উঠান থেকে কাপড়ের পুটুলি তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তারপর স্বামীর জন্য রান্নার কাজে ব্যস্ত হলো। বাবা এসেছে খবর পেয়ে খেলা ছেড়ে অন্য দুই ছেলে দৌড়ে বাড়ী এলো। দুই ছেলে বাবার কাপড় জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো— বাবা আমাদের জন্য কি এনেছো ?

গোপালের মন থেকে ক্ষোভ অনেকটা দুর হলো, মনে মনে ঠিক করে ফেললো এই যাত্রা সে জয়ন্তকে তার সঙ্গে নিয়ে যাবে। দুই ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গোপাল বললো— বাবা, গরীব বামুন, তোমাদের জন্য নূতন কি আনতে পারবো বলো, ভক্তরা মায়ের কাছে যা প্রণামী দেয় তার অধিকাংশই পুরোহিত মশায় আমাকেদিয়ে দেন। না হলে আমাকে আরও অসুবিধায় পড়তে হতো। ভক্তদের দেওয়া ধুতি এনেছি সেই কাপড় কেটে তোমাদের মা তোমাদের জন্য ধুতি ও গায়ের কাপড় তৈরী করে দেবেন।

তাঁতে তৈরী কাপড় কেটে ছেলেদের জন্য জামা ও ধুতি বানিয়ে দেওয়ার অভ্যেস

মালতির আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ঘরের মহিলারাই সেলাই কাজ শিশু বয়স থেকেই মায়ের কাছ থেকে শিখে নেয়। একমাত্র শাড়ি ছাড়া আর সব গায়ের কাপড়ই ধুতি ও শাড়ি কেটে হাতে সেলাই করে ব্রাহ্মণের ছেলে মেয়েদের পরতে দেওয়া হয়।

কৈশোরের পর ব্রাহ্মণ কুমারেরা ছোট ধুতি আর ছোট চাঁদর গায়ে জড়িয়ে কুশের তৈরী আসন হাতে নিয়ে পাতলা কাঠের তৈরী শ্লেটে রঙ্গীণ খড়ি মাটি নিয়ে পণ্ডিতের বাড়ীতে দেবনাগরি অক্ষর লেখার অভ্যাস করে। পূজোর বিভিন্ন মন্ত্র শিক্ষা করে। প্রত্যেক পাড়াতেই একঘর দু'ঘর ব্রাহ্মণ রয়েছে। আর চার পাঁচ গ্রামের মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত শিক্ষার বেসরকারী পাঠশালা বা টোল।

জয়ন্ত যখন জানতে পারলো বাবা তাকে বাবার সঙ্গে নিয়ে যাবেন তখন মনে মনে সে খুব আনন্দিত হলো। গোপালের মা এবং মালতিও খুশী হলো।

গঙ্গাধর পণ্ডিত খুব ভাল জ্যোতিষী। কপাল ও হাত দেখে তিনি যে সব ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন তার অধিকাংশই সত্যে পরিণত হয়েছে। সেজন্য সৈনিক মহলে গঙ্গাধরের খুব প্রভাব। প্রত্যেক সৈনিকই সুযোগ পেলে গঙ্গাধরের কাছ থেকে ভবিষ্যত জেনে নিতে আগ্রহী হয়। গোপাল ও তার ছেলে জয়ন্ত'র ভাগ্য পরীক্ষা করাতে গঙ্গাধরের কাছে জয়ন্তকে নিয়ে এলো। গঙ্গাধর জয়ন্তকে ভাল করে নিরিক্ষণ করে তার ডান হাত খুব যত্ন সহকারে ওলটে-পাল্টে দেখে বললো— গোপাল, তোমার এই ছেলে সন্ন্যাসী হবে।

বড় ছেলে জয়ন্ত। গোপাল জানে গঙ্গাধর পন্ডিতের মৃত্যুর পর সে এই মন্দিরের পুরোহিত হবে। এতদিন মাটির প্রতিমা ছিল। এখন পাথরের প্রতিমা তৈরী হচ্ছে। কালী মন্দিরের স্থায়ী চাকুরী এক রকম পাকা হয়ে আছে। আশা ছিল সে মন্দিরের পুরোহিত হলে ছেলে জয়ন্তকে সহকারী পুরোহিত বানাবে। ছেলেকে বিয়ে করাবে। কমলাসাগর মন্দিরের পাশেই ছেলে ভবিষ্যত সংসার গড়ে তুলবে। এই ছেলে যদি সংসারী না হয় তা হলে দ্বিতীয় ছেলে পরিমলকে সময় থাকতে নিয়ে আসবে। গোপাল এই মন্দিরের পুরোহিতের একটা বংশ পরম্পরা তাঁর সময় থেকেই তৈরী করতে চায়।

জয়ন্ত এখানে এসে খুব খুশী। এখানে গঙ্গাধর পন্ডিতের কাছে সংস্কৃত পাঠ নেওয়া যাবে। কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে খেলা করতে পারবে আর কমলাসাগর দীঘিতে ইচ্ছে মতো সাঁতার কাটতে পারবে। জেলেদের সঙ্গে মাঝ ধরার ফাকে সে সাঁতার শিখে নিয়েছে। দুপুরে যখন মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, ঘরে ঘরে যখন বিশ্রাম নেবার পালা শুরু হয় তখন অলস মধ্যাহ্নে অধিকাংশ কিশোর কিশোরী কমলাসাগরের দীঘির পাড়ে খেলার আসর বসায়। কোন কোন কিশোর কিশোরী কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে দীঘিতে জল খেলা করে। মা-বাবা ছেলে মেয়েদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কিশোরী ভক্তি সব ছেলে মেয়ের কাছে বড় মায়ের গল্প বলেছে। পরিবেশ যখন শান্ত থাকে, ঘরে ঘরে বিশ্রামের আয়োজন চলে

কিংবা খুব ভোরে মানুষ যখন ঘুমে থাকে তখন বড় মা দীঘির পাড়ে এসে ভক্তিকে গল্প শোনায়। লোক এলে পালিয়ে যায়। ভক্তি জানে না কেন লোক এলে বড় মা তথা জলদেবী পালিয়ে যায়।

খগেন্দ্র, বলেন্দ্র, নগেন্দ্র আর জয়েন্দ্র এই চারজন আদিবাসী সৈনিকের ছেলে। সকলেই রিয়াং সম্প্রদায়ের। অমরপুরের রাংকাং গ্রামের বাসিন্দা চার সৈনিককে পরিবার সহ বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মহারাজ প্রথম রত্ন মাণিক্যের সময় থেকে আদিবাসী সমাজের মানুষ তাদের ছেলে মেয়েদের নাম দেব-দেবীর নামানুসারে রাখতে শুরু করেছে। খগেন্দ্ররা মাঝে মাঝে কখনো বনে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বুনো ফল সংগ্রহ করে আনে কখনো খালে মাছ ধরতে যায়। জয়ন্তকেও তাদের সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। জয়ন্ত বাড়ীর ঘটনা গুলো ভুলতে চায়। সে পূজা পার্বণে আত্ম নিয়োগ করতে চায়। কখনো সৈনিকেরা গভীর বন থেকে রাজ মধু সংগ্রহ করে থাকে। মন্দিরে ও সেনাপতিকে মধুর ভাগ দেয়।

জয়ন্ত কৈশোরের দিনগুলো নিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। বিমাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথাও বন্ধুদের বলে। কিশোর কিশোরীরা জয়ন্ত'র বিমাতার কঠিন হৃদয়ের কথা, ব্যবহারের কথা শুনে জয়ন্তর বিমাতাকে গালি দেয়। ভক্তির কাছ থেকে বড় মা'র কথা শুনে জয়ন্তর ইচ্ছে জাগে বড়মা'র সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। ভক্তি বলেছে— বড় মার সঙ্গে দেখা করতে হলে দুর্গের মানুষ জেগে উঠার আগে দীঘির পাড়ে আসতে হবে। লোক সঙ্গে থাকলে বড় মা দেখা করতে আসবেন কিনা কে জানে। জয়ন্ত আর ভক্তি ঠিক করেছে একদিন সকলের অগোচরে দু'জনে দীঘির পাড়ে আসবে। ভক্তির প্রশ্নের উত্তরে বড় মা একদিন তাকে বলেছেন— সৎ ও সরল মানুষ ছাড়া বড় মা কারো সঙ্গে দেখা করেন না। জয়ন্ত ভাল ছেলে কিনা তা পরখ করে নেওয়া যাবে। বড়মা যদি জয়ন্তকে দেখা না দেন তাহলেই বুঝা যাবে জয়ন্ত ভালো ছেলে নয়।

গোপাল আর জয়ন্ত এক বিছানায় শোয়। ভক্তির জন্য আলাদা খাটের ব্যবস্থা আছে। ভক্তির পাশের খাটে ধাইমা ঘুমায়। গোপালের থাকার ঘরটা ছোটো। একটা কাঠের বড় চৌকি পাতা আছে। ভারি কড়ই কাঠের তক্তা চৌকি। চারজন ঘুমোতে পারে। জুমের তুলা দিয়ে তৈরী লেপ আর তোষক। জয়ন্ত যখন এসেছে তখন গরমের সময়। চৌকির উপর পাটি বিছানো। শিমূল তুলার তৈরী বালিশ। মাটির একটা কুজোতে দীঘির জল রক্ষিত থাকে। আশপাশ এলাকার মানুষ কমলাসাগর দীঘির জলই পান করে। গভীর হওয়ায় দীঘির জল সমুদ্রের জলের মতো নীল, পরিষ্কার। গোপাল জয়ন্তকে ভোর হওয়ার আগে একাকী দীঘির পাড়ে যেতে বারণ করেছে। গোপাল কয়েকদিন আবছা অন্ধকারে দীঘির ঘাটে সুসজ্জিতা এক নারীকে বসে থাকতে দেখেছে। গোপালও বিশ্বাস করে ঐ মহিলা আর কেউ নয় দীঘির জলে সমাধী নেওয়া

মহারাণী কমলা দেবীর সখী চন্তাই দুহিতা ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় সখী কমলাদেবী। তিনি কারো অমঙ্গল করবেন না। কিন্তু অজান্তে কেউ যদি তার ছায়া মারিয়ে দেয় কিংবা তার যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটায় তা হলে হয়তো তিনি রেগে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলতে পারেন। এই শংকাতেই ত্রিসন্ধ্যা অনেকেই দীঘিতে যায় না।

পুরোহিত গঙ্গাধর গোপালকে সুক্ষ্ম দেহীদের সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। গোপাল যে সময় দীঘির পাড়ে ফুল বাগানে ফুল তুলতে যায় সে সময়ে ফুল গাছে দেবকন্যা, পরী কিংবা অপ্সরাদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনি শিষ্য গোপালকে বলে দিয়েছেন ফুল বাগানে ঢোকার আগে তিনি যেন হাততালি দিয়ে অশরীরীদের উদ্দেশ্যে সে স্থান ত্যাগ করার অনুরোধ জানায়। তা হলে কোন অশরীরী কোন ফুলগাছে বা পাশে থাকলে স্থান ছেড়ে চলে যাবে। দেব কার্যে এরা কখনো ব্যাঘাত ঘটায় না। গোপাল ছেলেকে পরীর ভয় দেখিয়ে দীঘির পাড়ে যেতে বারণ করেছে। জয়ন্ত বাবার কথা শোনেনি। সে বাগানে কারো দেখা পায়নি।

জয়ন্ত বাড়ীতে থাকাকালে খুব ভোরে ভাত খেয়ে মাছ ধরতে চলে যেতো। বেলা দুপ্রহরের মধ্যে মাছ নিয়ে বাড়ী না এলে বিমাতা জয়ন্তকে মারধোর করতো। কোন দিন বিশাল বিলের কিনারে একাকী জয়ন্ত মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকতো। ভূতের ভয়ের চেয়েও বিমাতার রক্ত চক্ষুকে সে বেশী ভয় করতো। তাই দুর্গের পাশে অবস্থিত এই বিশাল দীঘি তার মনে কোন ভয়ের সৃষ্টি করে না। বরং খুব ভোরের মৃদু বাতাসে দোল খাওয়া লক্ষ ঢেউ এর খেলা দেখতে তার ভালই লাগে। ভক্তির প্রস্তাবে তাই জয়ন্ত রাজী হয়ে গেলো। ভক্তি বললো সে মন্দিরে এসে জয়ন্তকে ডেকে তুলবে।

মঙ্গলবার, আকাশে কালো মেঘ। যে কোন সময় প্রবল বৃষ্টি আসতে পারে। কে যেন ভক্তির কানে এসে বলে গেলো — উঠো, যাওয়ার সময় হলো। ভক্তির ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ধাইমা গভীর ঘুমে। ভক্তি চুপি চুপি উঠে মন্দিরের পাশে এসে জয়ন্তকে মন্দিরের নাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। ভক্তি জয়ন্তর কাছে গিয়ে বললো — চলো ঘাটে গিয়ে বসি। বড় মা যদি আসেন তা হলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। না এলে বুঝবো তুমি ভালো ছেলে নও।

দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসলো। আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে জয়ন্ত বললো — খুব শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে। জয়ন্ত মনে মনে মা কালীকে স্মরণ করে বলে হে মা কালী, তুমি সেই জল দেবীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। জলদেবী যদি না আসেন তাহলে ভক্তি আমায় খারাপ ভাববে। ভক্তি বললো — বৃষ্টি আসলে বেশ মজা হবে। বৃষ্টিতে কেউ ঘর থেকে বের হবে না। বড় মা এলে জমিয়ে গল্প করা যাবে। বড় মা ভাল গল্প বলতে পারে। আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। বড় মা কখন যে ভক্তির পাশে এসে বসেছে দু'জনের কেউ তা টের পায়নি। বড় মা বললেন — দু'জনকে শিব-পার্বতীর

মতোই দেখা যাচ্ছে। ভক্তি, জয়ন্ত খুব ভালো ছেলে।

ভক্তি বাঁ দিকে ফিরে বড় মাকে দেখে বললো— প্রণাম বড় মা। আমি জানি আপনি আসবেন। আমার সঙ্গে জয়ন্ত ঠাকুর এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাগল হয়ে উঠেছিল। আমাদের গোপাল ঠাকুরের ছেলে। এখনো উপনয়ন হয়নি। কয়েক মাস পরে হবে শুনেছি।

জয়ন্ত হাত জোর করে বললো — প্রণাম বড় মা। আমি গল্প শুনতে ভালবাসি। আপনি সুন্দর গল্প বলতে পারেন তাই আপনার মুখ থেকে গল্প শুনতে এলাম। আপনার বাড়ী কোথায় মা ?

— আমার বাড়ী অনেক দূর। কৈলাশে।

— এত দূর থেকে এত সকালে কেমন করে এলেন ?

— আমি তো ছেলের কাছে আছি। ছেলের বাড়ী কাছেই।

— আপনার ছেলে নিশ্চয়ই জমিদার।

— কেন বল তো ?

— জমিদার না হলে এত অলংকার কোথায় পাবেন ?

— তুমিতো খুব বুদ্ধিমান দেখছি। তোমার মায়ের জন্য দু'একটা অলংকার লাগবে ?

— না, বড় মা। আমার মাতো স্বর্গে চলে গেছেন। শুনেছি সেখানে গেলে ধন-দৌলত, খাওয়া-পড়া কোনটারই অভাব হয় না। আর বিমাতা আমায় ভাল বাসে না। তাই অলংকার দরকার নেই।

— এক্ষুণি হয়তো বৃষ্টি আসবে। আর একদিন গল্প শোনাবো। তোমাদের দু'জনকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এই মন্ত্র জপ্ করলে তোমরা মা কালীর দর্শন পাবে। আমি তোমাদের কানে মন্ত্রটা বলবো। তোমরা বুঝতে পেরেছ কিনা তা আমাকে আবার বলে শোনাবে।

বড় মা, দু'জনের কানে কানে বললেন — ওঁ ক্রীং মা কালী। মন্ত্র কানে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের মনে সারা জগৎ যেন আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। সেই বিশাল আলোক রশ্মিতে তাদের চেহারার মতো দুটো ছায়া ভ্রমরের মতো শব্দ করতে করতে তীব্র বেগে ঘুরতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে কখন যে ঝম্ ঝমিয়ে বৃষ্টি এলো দু'জনে বুঝতে পারলো না। দুই কিশোর কিশোরীর মন আনন্দে পরিপূর্ণ। মা ব্রহ্মময়ীর অপার করুণা। জয় মা কালী।

গোপাল ঠাকুর ফুল তুলতে এসেছিল। মাথায় পাতা এবং বাঁশের তৈরী মাথা ও পিঠ ঢাকার মতো এক রকম ছাতা। ফুল তুলতে এসে মনে হলো জয়ন্তকে সে বিছানায় দেখতে পায়নি। ভেবেছিলো প্রাকৃতিক কাজ শেষ করতে সে হয়তো বেরিয়ে থাকতে পারে।

এখন মনে হলো — ঘাটে এসেছে কিনা একবার দেখে যাওয়া উচিত। আবার মনে হলো — এই প্রবল বৃষ্টিতে কেউ ঘাটে বসে থাকবে না। ফুল তোলা শেষ হলে মনের তাগিদে একবার ঘাটের দিকে এলো। দেখলো ঘাটে প্রবল বৃষ্টিতে জয়ন্ত আর ভক্তি চুপ করে বসে রয়েছে। গোপাল ঠাকুর ছেলের নাম ধরে ডাকলো — জয়ন্ত ?

জয়ন্ত ও ভক্তির চমক ভাঙ্গলো। কয়েক মুহূর্ত সময় দু'জনেই জাগতিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রবল বৃষ্টিতেও তাদের জাগতিক চেতনা ফিরে আসেনি। গোপালের আহ্বান তাদের মহা আনন্দময় জগৎ থেকে বাস্তবের কঠিনতায় ফিরিয়ে আনলো। দুজনেই চকিতে উঠে দাঁড়ালো। গোপাল দু'জনকেই জিজ্ঞেস করলো— এই প্রবল বৃষ্টিতে তোমরা দুজনে কী করছিলে ? দু'জনেই কোন উত্তর দিতে পারলো না। গোপাল বুঝতে পারলো সেই অজানা দেবীই তাদের ঘাটে নিয়ে এসেছে। বললো — তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে পোষাক বদলে ফেলো। না হলে অসুখ করতে পারে।— গোপালের কথায় দু'জনেই উঠলো। গোপালের অনুগামী হলো।

জয়ন্ত ঘরে এসে কাপড় বদল করে কাঠের চেয়ারে বসলো। গোপাল জিজ্ঞেস করলো— জয়ন্ত, ঘাটে কি কাউকে দেখেছ ? জয়ন্ত সত্যি কথা বলতে যাচ্ছিল। ঠিক্ এমন সময় কানের কাছে কে যেন বলে উঠলো — তোমার বাবাকে কোন কথা বলো না। বলে দাও কোন কিছুই দেখনি। তোমরা বৃষ্টিতে বসে দীঘির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলে। আমার কথা বললে তোমার বাবা বিশ্বাস করবে না, বরং তোমাকে ঘাটে আসতে বারণ করবে। জয়ন্ত বললো — বাবা, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর দীঘিতে ছোট ছোট মাছের ঝাক্ খেলা করছিলো। তাদের খেলা দেখতে দেখতে সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। মাছেদের খেলা দেখে খুব আনন্দ হচ্ছিল। জয়ন্তর কথা শুনে গোপালের মনের শংকা দূর হলো। বললো —

— তোমার উপনয়ন হয়ে গেলে তোমাকে পূজোর কাজে লাগিয়ে দেব।

— আচ্ছা বাবা।

পূজো না হওয়া পর্যন্ত গোপাল এবং পুরোহিত মশায় কোন খাবার গ্রহণ করেন না। জয়ন্ত হাত মুখ ধোয়ে ভোরে দৈ আর চিড়া খেয়ে নেয়। দুপুরে মায়ের কাছে অন্নভোগ হয়। একটা থালি কল্যাণদেব এর ঘরে যায়। একটি ভোগ মেখে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় আর বাকী থালি পুরোহিত, দুই সেবক আর জয়ন্ত গ্রহণ করে। রাতে মায়ের কাছে মিষ্টি ভোগ দেওয়া হয়। গোপাল এবং সহকারী সেবক যতীন্দ্র নিজেদের খাবার প্রস্তুত করে। দুপুরে মায়ের কাছে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। রাতে পুরোহিত এবং সেবকগণ আমিষ খাবার গ্রহণ করেন।

আশ্বিন মাসে জয়ন্ত'র উপনয়ন হয়ে গেলো। গ্রামের বাড়ী থেকে মালতি এসেছিল। উপনয়নের গুরুর দায়িত্ব গঙ্গাধর পুরোহিত মশায় পালন করেছেন। তিনদিন ব্রহ্মচারিকে নারীর মুখ দর্শন না করে থাকতে হয়। তিনদিন একমাত্র গর্ভধারিনী মা কিংবা মাতৃস্থানীয়

নারীগণ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে পারেন। উপনয়নের তিনদিন ব্রহ্মচর্য পালন এবং গেরুয়া পরিধান করতে হয়। ব্রহ্মচারীর জন্য একটি দণ্ড নির্দিষ্ট করে দেওয় হয়। তিনদিন একান্তে গায়ত্রী মন্ত্র জপ্ করতে হয়। তিনদিন পর কাক্ ডাকার আগে গঙ্গায় বা জলাশয়ে স্নান করে আসতে হয়। গেরুয়া পরিধান করে প্রথমে মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারপর তিন ঘর, পাঁচ বা সাত ঘর ব্রাহ্মণের ঘর থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে সেই ভিক্ষান্নের অন্ন গ্রহণ করতে হয়।

কৈলাগড় সৈনিকদের আবাস স্থল। সামান্য দূরে দেবীপুরে যে গ্রাম রয়েছে সেই গ্রামে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ আছেন। ঠিক হয়েছে হাতীর পিঠে চড়িয়ে ছেলেকে নিয়ে গোপাল ঐ গ্রামে ভিক্ষা গ্রহণ করতে যাবে।

জয়ন্ত আর গোপাল একই ঘরে শুয়েছে। গঙ্গাধর জয়ন্তকে গায়ত্রী মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে কেমন করে আঙ্গুলের কড়ে মন্ত্র জপ্ করতে হয় এবং কেমন করে মন্ত্রের হিসেব রাখতে হয় তা শিখিয়ে দিয়েছেন। জয়ন্ত মন্ত্র মুখস্ত করে মন্ত্র জপ্ করার অভ্যেস রপ্ত করতে চেষ্টা করছে। তারমনে প্রশ্ন জাগলো পুরোহিতের দেওয়া গায়ত্রী জপ্ করবে না বড় মা'র দেওয়া মন্ত্র জপ্ করবে ? রাতে তার সংশয় দূর করতে স্বপ্নে বড় মা দেখা দিয়ে বললেন — গায়ত্রী এবং কালীর বীজমন্ত্র দুটোই জপ্ করতে হবে। এতে তার মঙ্গল হবে। জয়ন্ত মনে মনে খুশী হলো। জয়ন্ত যখন বাড়ী থেকে কৈলাগড় দুর্গে আসে তখন এক সৈনিকের ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। সৈনিকের সামনের দিকে ঘোড়ার পিঠে বলে গর্বে তার বুক ভরে উঠেছিল। তার গর্বের হাসি দেখে ছোট বৈমাত্রেয় দুই ভাই তার গমন পথে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। মাছ ধরার সাথী পুলকের জন্য মনটা কেঁদে উঠলো। পুলক মাছ ধরায় খুবই দক্ষ। জেলের ছেলে। অনেক দিন কিছু কিছু মাছ ধরে জয়ন্তকে উপহার দিয়েছে। পুলক জানে জয়ন্তের চার জনের সংসারে অন্তত একবেলার মতো মাছ না নিয়ে যেতে পারলে বিমাতার হাতে মার খাবে। যাবার সময় পুলকের সঙ্গে দেখা হলো না। পুলক এই সময় খালের জলে মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকে। মাছ ধরে বাঁশের ডালায় করে গ্রামের গৃহস্থের বাড়ী এনে মাছ বিক্রি করে প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যাবে।

পৈত ঘর থেকে বের হয়ে গোপালের সঙ্গে যখন দেবীপুর যাওয়ার জন্য হাতীর পিঠে উঠে বসলো তখনো তার বুক গর্বে ভরে উঠলো। বিমাতার দিকে তাকিয়ে একটা গর্বের হাসি ছুড়ে দিল। জয়ন্তের এই সৌভাগ্যকে তার বিমাতা মালতি অবশ্যই স্বাভাবিক মনে গ্রহণ করতে পারলেন না।

সহকারী পুরোহিতের ছেলে উপনয়নের পর ভিক্ষা নিতে দেবীপুর গ্রামে আসবে এই সংবাদ কল্যাণদেব দূত মারফত দেবীপুর গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দেবীপুর গ্রামের লোক নবীন ব্রাহ্মণকে দেখার জন্য ব্রাহ্মণবাড়ীগুলোতে এসে ভীড় জমালো। প্রত্যেকেই বাড়ীর এক দুটো ফল এনে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এনে জমা দিলো নবীন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য।

সকাল এক প্রহর বেলায় কমলাসাগর থেকে যাত্রা করে বেলা দু-প্রহরের আগেই দেবীপুর গ্রামে এলো।। গোপাল খেলেকে নিয়ে হাতীর পিঠ থেকে নামলো। গ্রামের মানুষ হাতীর খাবার হিসেবে যার বাড়ীতে কলা গাছ রয়েছে সে বাড়ী থেকে কলাগাছ সংগ্রহ করে এনে এক স্থানে জমা করে রেখেছিলো। মাহুতের নির্দেশে হাতী মনের আনন্দে জমা করা বিশাল খাদ্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য গ্রহণ শুরু করলো।

বালক থেকে বৃদ্ধ গ্রামবাসী নবীন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে শুরু করলো। যখন থেকে বুঝতে শিখেছে তখন থেকেই বিমাতার রক্তচক্ষু আর কারণে অকারণে বেত্রাঘাতের ঘটনার সঙ্গেই সে পরিচিত ছিল । কৈলাগড় আসার পর অনেক সৈনিক তার সঙ্গে কথা বলার সময় ছোটঠাকুর বলে সম্বোধন করছে। উপনয়ন শেষে একজন বালক ব্রহ্মচারী সমাজের কাছ থেকে যে এমন ভক্তিশ্রদ্ধা পেতে পারে সে ধারণা তার ছিল না । এই বয়সের মধ্যে সে কখনো কারো উপনয়ন অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পায়নি । সে জন্য এই চিত্র তার কাছে একেবারেই নূতন এবং অবাক্ হওয়ার মতো হলো ।

কাছাকাছি তিন বাড়ী থেকে ভিক্ষা নিতে গিয়েই দুপুর গড়িয়ে গেলো । আরো তিন চার ঘর ব্রাহ্মণের বাস দেবীপুর গ্রামে ছিল । সময়ের অভাবে ঐ সব বাড়ী থেকে ভিক্ষে নেওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিতে হলো । গোপালের নির্দেশে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে প্রণামী হিসেবে পাওয়া ফল সে প্রসাদ করে গ্রামবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দিলো । গ্রামবাসীরা নবীন ব্রাহ্মণের দীর্ঘায়ু কামনা করলো।

কৈলাগড় ফিরে এসে ভিক্ষালব্ধ চাওল ও তরকারী মালতির হাতে তুলে দেওয়া হলো । নবীন ব্রাহ্মণ উপনয়ন ঘর থেকে বের হয়ে প্রথম অন্ন মায়ের কাছ থেকেই গ্রহণ করেন । মা জীবিত না থাকলে কিংবা কোন কারণে অপারগ হলে মাতৃ স্থানীয় কোন বিবাহিতা রমনীর কাছ থেকেই ব্রাহ্মণকে প্রথম অন্ন গ্রহণ করতে হয়। সে কারণেই দুর্দিনের জন্য মালতিকে কৈলাগড় নিয়ে আসা হয়েছে ।

জয়ন্ত বাড়ীতে থাকার সময় মালতির মনে একরকম ভাবনা ছিল এখন অন্যরকম ভাবনার উদয় হয়েছে । মনে মনে ভাবছে স্বামীর সহকারী পুরোহিত হিসেবে জয়ন্ত সুযোগ পেলে তার দুই ছেলেকে গ্রামের বাড়ীতেই ভবিষ্যতে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজো করার মর্যাদাই আলাদা । জয়ন্তর জন্য খাবার তৈরী করতে করতে মালতি এই রকম ভাবনায় বার বার ব্যথিত হতে লাগলো । মা কালীর উদ্দেশ্যে রান্না ঘর থেকেই প্রণাম জানিয়ে বললো — মা গো, ভবিষ্যতে আমার ছেলেরা যেন তোমার পূজোর সুযোগ লাভ করে।

মায়ের রান্না করা ভিক্ষে করা চাওলের ভাত আর মা কালীর অন্ন ভোগের প্রসাদ দুটো একত্র করে মা কালীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে মন্ত্র উচ্চারণ করলো — ও ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নৌ । ব্রহ্মণাহুতম, ব্রাহ্মৈব তেন ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

করুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্ কালে অর্জুনের উদ্দেশ্যে এই শ্লোকটি বলেছিলেন। জয়ন্ত ঐ শ্লোক উচ্চারণ করে মুখে খাবার তুলে দেওয়ার পর গোপাল বললো — বাবা, প্রসাদ কখনো আবার নিবেদন করতে নেই।

গঙ্গাধর পণ্ডিত সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, গোপাল, জয়ন্ত ঠিক কাজই করেছে। আমাদের দেহ অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় এই তিন ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতির প্রতিটি শষ্যকেই অন্ন বলে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতিতার উৎপাদিত সব জিনিস যথা ফুল, ফল, জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতি পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন। সেই অর্পণ করা জিনিসই আমরা আবার আমাদের ইষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করি। কাজেই তোমার ছেলে কোন ভুল করেনি। তার জিনিস তাকেই দেওয়া।

আমাদের দেহ প্রকৃতির দান। আমাদের প্রাণ পরম ব্রহ্মের দান। আমাদের ইন্দ্রিয় সমুহ প্রকৃতির দান। আমাদের নিজস্ব বলতে তো কিছুই নেই। অহংকার আমাদের আমি, আমার, আমাদের ইত্যাদি ভাবনা জাগায়।

তুমি পূজোর জন্য যে ফুল তুলে আনছো সে ফুল তুমি সৃষ্টি করোনি। সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি। প্রকৃতি আমাদের দেহকে পুষ্ট করার জন্য যে যে উপাদান দরকার সব দয়া করে দিয়ে থাকেন। মাটির রূপ, রস গন্ধ গ্রহণ করে সৃষ্ট সব ধরনের খাদ্য শষ্য সূর্যের আলো গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। সুতরাং যা কিছু আমরা পাই সবই পরম ব্রহ্মের প্রসাদ। সে প্রসাদ আবার যার যার ইষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করলে একটা মানসিক শান্তি পাওয়া যায়।

পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তক হচ্ছে আকাশ। চন্দ্র ও সূর্য হচ্ছে দু-চোখ। আর বাতাস হচ্ছে শ্বাস ও প্রশ্বাস। তিন লোকে যা কিছু উৎপন্ন হয় পরম ব্রহ্ম সব দেখেন। শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে তা আস্বাদন করেন। কাজেই পরম ব্রহ্মের গৃহীত প্রসাদই আমরা আবার নিবেদন করি।

জয়ন্ত উপনয়নের পর থেকে গায়ত্রী এবং বড় মায়ের দেওয়া কালীর বীজমন্ত্র জপ্ করছে। গঙ্গাধর জয়ন্তকে বললেন — দাদুভাই, এবার থেকে পুজোর নিয়ম কানুন এবং মন্ত্রগুলো আমার কাছ থেকে শিখে নাও। যেসব মন্ত্র পুজো করতে ব্যবহার হয় তাল পাতার পুঁথি তেকে সে সব মন্ত্র তোমায় শিখে নিতে হবে। আগামী দীপাবলীতে মায়ের পাথরের বিগ্রহ স্থাপিত হবে। মায়ের মন্দির যখন পাকা হবে তখন ভক্তের সংখ্যা বাড়বে, তোমার মতো নবীন পুরোহিতের প্রয়োজন হবে।

বাড়ীতে থাকাকালীন সময়েই দেবনাগরী হরফেব সঙ্গে জয়ন্তর পরিচয় হয়ে গেছে। সংস্কৃত শব্দের বাংলা অর্থ না বুঝলেও সে মোটামুটি পড়তে পারে। সংযুক্ত অক্ষর উচ্চারণ করতে বিভ্রাট দেখা দেয়। গঙ্গাধর সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জয়ন্ত মেধাবী। দু-একদিন পড়ানোর পরই গঙ্গধর বুঝতে পেরেছেন গোপালের স্মৃতি শক্তির তুলনায় জয়ন্তর স্মৃতি শক্তি অনেক

বেশী প্রখর। তাই তার কাছে রক্ষিত তাল পাতার পুঁথি থেকে একাদি ক্রমে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা পদ্ধতি তিনি জয়ন্তকে শিখিয়ে দিতে থাকেন। জয়ন্তের ভবিষ্যতে প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতে যাতে কোন সমস্যা না হয় তার জন্যই গঙ্গাধরের এই আগ্রহ।

উপনয়নের পর জয়ন্ত সকালে বাবার সঙ্গে ফুল তুলতে যায়। বাসন পত্র পরিষ্কার করা, রান্নার মশলা করা এবং রান্নার কাজে সাহায্য করার জন্য আলাদা একজন সেবক রয়েছে। গঙ্গাধরের ইচ্ছে পূজোর সময় জয়ন্তকে তাঁর কাছে রেখে জয়ন্তকে পূজোর কাজ শেখায়। সে কারণে তিনি পূজোর সময় জয়ন্তকে মন্দিরের ভেতর তার পাশে নিয়ে বসিয়ে রাখেন। সহকারী গোপালকে বলেছেন— গোপাল, তোমার স্মরণ শক্তি কম। পূজাপার্বণে তোমার চেয়ে তোমার ছেলে ভবিষ্যতে অনেক বেশী দক্ষতা দেখাতে পারবে। তুমি যদি রাজী থাকো তা হলে আমার সঙ্গে জয়ন্তকে রেখে তাকে ভবিষ্যতের এক দক্ষ পূজারী হিসেবে গড়ে তুলবো। গোপাল গঙ্গাধরকে কাকা বলে সম্বোধন করে। বললো— কাকা, আপনি যা বললেন আমি তাতে রাজী। জয়ন্ত আপনার পর পুরোহিতের দায়িত্ব যদি পালন করতে পারে তাহলে আমার পক্ষে সেটা গৌরবের হবে।

দুর্গের এবং আশপাশের কিশোর কিশোরীরা সকাল সন্ধ্যায় খেলা, ধূলায় মেতে উঠে। জয়ন্ত সকালে বাবার সঙ্গে ফুল তুলে ঘরে এসে জল খাবার খেয়ে তাল পাতার পুঁথি নিয়ে দাদু গঙ্গাধর পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও মন্ত্র শিক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকে। তারপর স্নান করে পূজোর সময় মন্দিরে বসে দাদুর পূজো করার রিতিনীতি লক্ষ্য করে। খাবারের পর কিছু ছেলে মেয়ে মা-বাবার কঠোর শাসন মেনে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছু ছেলেমেয়ে দুর্গের ভেতর বিশাল বাগানের গাছের নীচে ছুটাছুটি করে বেড়ায়। জয়ন্ত দুপুরের সময়টুকু কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে কাটানোর অনুমতি বাবার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। আট দশজন ছেলেমেয়ে বাগানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা করে অলস দুপুরকে সক্রিয় করে রাখে। বাগানে বিভিন্ন ফলের গাছের পাশাপাশি চামল, কড়ই, শাল. সেগুন, কুমরি, কাঞ্চন, কুচরা, আড়গাজা, বাদি, জিউল প্রভৃতি গাছও রয়েছে। কয়েকটা বিশাল চামল গাছ আর দুটো বিশাল গর্জন গাছের উপর বাঁশের মাচা তৈরী করে সৈনিকেরা প্রহরার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। টীলার উপর প্রায় সত্তর-আশি ফুট চামল আর গর্জন গাছের উপরে বাঁশের মাচায় বসে সৈনিকেরা সমতল ভূমির কয়েক মাইল দূরের ঘটনা লক্ষ্য করতে পারে।

মেয়েরা কখনো কখনো ছেলেদের দল থেকে আলাদা হয়ে মেয়েদের চিরাচরিত রান্না-বাড়া এবং পুতুল খেলায় মেতে উঠে। খেলাধূলার ফাকে সামান্য সময়ের জন্য জয়ন্ত আর ভক্তি মিলিত হলে নিজেদের মনের কথা বলে। জয়ন্ত আগে যে রকম চঞ্চল ছিলো এখন আর তেমনটা নেই। ভক্তিকে কি জিজ্ঞাসা করবে অনেক সময় সে সেই ভাষা খুঁজে পায় না। ভক্তি কোনদিন তার খাওয়ার বিষয় জিজ্ঞেস করে কোনদিন বড় মাকে স্বপ্নে দেখতে পায় কিনা সে কথা জানতে চায়। জয়ন্ত কোনদিন ভক্তির পুতুলের এবং পুতুলে সাজ-

পোষাকের প্রশংসা করে। পুতুলের প্রশংসায় ভক্তি খুশী হয় সে কথা জয়ন্ত বুঝতে পেরেছে। মালতির একমাত্র লক্ষ্য ছিলো জয়ন্ত যেন কোন অবস্থাতেই তার গর্ভস্থ সন্তানের প্রাপ্য মাতৃস্নেহ ও ভালবাসায় ভাগ জমাতে না পারে । মালতি তার পরিকল্পনায় সফল হয়েছে। জয়ন্ত ঘর ছাড়া হয়েছে । উপনয়নের সময় কমলাসাগর এসে মালতি জয়ন্তর সুখ দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো। কিন্তু এখানে মালতির কোন ক্ষমতা নেই। তাই হিংসার প্রতিফলন দেখানো থেকে মালতি বিরত থাকলো।

মালতির বিয়ের দু-বছরের মাথায় প্রথম পুত্র প্রফুল্লের জন্ম হয়েছে। গোপালের মা জয়ন্তর জন্য একটা নূতন পাতলা কাঁথা সেলাই করেছিলেন। বৃষ্টির দিনে এবং শরৎ ও বসন্ত কালে রাতে পাতলা কাঁথা কিংবা চাঁদর গায়ে দিতে হয়। গরীব বামুনের ঘরে কাঁথাই হচ্ছে একমাত্র বন্ধু । অশৌচ ঘর থেকে ছেলেকে নিয়ে বের হবার পর একদিন জয়ন্তই গা থেকে নূতন কাঁথাটা টেনে নিয়ে গিয়েছিল মালতি। ঘটনাটা কিশোর জয়ন্তর মনে খুব লেগেছিল। এখনো পাতলা কাঁথা গায়ে দেওয়ার সময় মাঝে মাঝে বিমাতা মালতির নিষ্ঠুর ব্যবহারের ঘটনাটা মনে পড়ে। কাপড়ের অভাবে গোপালের মা মাতৃহীন বড়নাতি জয়ন্তকে আর নূতন কাঁথা সেলাই করে দিতে পারেন নি। পুরনো ভারি কাঁথার ছেড়া জায়গাগুলো কাপড়ের টুকরো দিয়ে তালি মেরে নাতিকে গায়ে দিতে দিয়েছিলেন ।

মন্দিরে আসার পর জয়ন্ত গায়ে দেওয়ার জন্য কম্বল আর জুমের তুলার নূতন লেপ পেয়েছে। মালতি এর আগে কখনো কমলাসাগর আসার সুযোগ পায়নি। বাবা ছেলের জন্য দুটো লেপ দেখে মালতি স্বামীকে বললো— বাড়ীতে তোমার দুই ছেলে শীতের সময় কষ্ট পায়। তোমাদের তো দুটো লেপ, আমাদের জন্য একটা লেপ দেবে ?

— এখানকার সব কিছুই সরকারী সম্পত্তি । তোমাকে কেমন করে দেবো বলতো? পুরোহিত মশায়কে একটা নূতন লেপ দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই লেপটা দিয়ে দিয়েছেন জয়ন্তকে । তা ছাড়া এক লেপ এর তলায় বাপ-ব্যাটায় ঘুমানো ঠিক্ নয়। সম্ভব হলে শীতের সময় তোমাকে একটা লেপ দেওয়া যায় কিনা সেনাপতি মশায় এর সঙ্গে আলাপ করে দেখবো।

চকির উপরে বসে জয়ন্তর লেপটা বারবার হাতিয়ে হাতিয়ে দেখিছলো মালতি। জয়ন্ত হঠাৎ বলে উঠলো — মা, আপনি আমার লেপটা নেবেন ? জয়ন্তর কথা শুনে চমকে উঠলো মালতি । জয়ন্তকে সে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সবে মাত্র দেওয়া নূতন লেপটা আগামী শীতে গায়ে না দিয়ে এই কিশোর দান করতে চাইছে।

জয়ন্তর কথা শুনে লজ্জিত হলো মালতি। বললো — না, না, নূতন লেপ তোমাকে দিয়েছে তুমি গায়ে দিও ।

—আপনি লেপটা নিয়ে যাবেন। দাদু আমাকে খুব আদর করে। দাদু আমাকে কিছু বলবেন না।

জয়ন্তর পৈত উললক্ষে এখানে এসে জয়ন্তর জন্য অজান্তেই তার মাতৃমন মমতাময়ী হয়ে পড়েছিল। ভাত দেবার সময় মনে মনে জয়ন্তর দীর্ঘজীবন কামনা করেছিল। পর মুহূর্তে নিজের দুই ছেলের কথা মনে হওয়ায় মনে মনে ভাবছিল— আমার দুই সন্তানের ভাগ্যে কি এমন সৌভাগ্য আসবে !

জয়ন্তকে ভাত দেবার সময় মালতি বললো — বাবা, তোমার পুরোহিত দাদু শীতের সময় গায়ে দেওয়ার জন্য লেপটা দান করেছেন । তোমাদের দুটো লেপই বড়। তিন জনে গায়ে দেওয়া যেতে পারে। সেজন্য ভেবেছিলাম তোমার বাবার পুরনো লেপটা আমাদের দিয়ে দিলে তোমার ছোট দু-ভাই চন্দন ও বলরাম শীতে লেপ গাতে দিতে পারবে। তুমি তো দেখেছ আমাদের ঘরে শীত নিবারণের জন্য কাঁথারও অভাব রয়েছে ।

—আপনি নূতন লেপটা নিয়ে যাবেন । দাদুর ঘরে তিন চারটে পুরনো কম্বল রয়েছে তার থেকে আমি একটা চেয়ে আনবো ।

বাবা গোপালের দিকে চেয়ে বললো— বাবা, আপনি মাকে নূতন লেপটা নিয়ে যেতে দিন। ছোট ভাই দুজন নূতন লেপ পেলে খুব খুশী হবে।

ছেলের উদারতার পরিচয় পেয়ে মনে মনে খুশী হলো গোপাল। ব্রাহ্মণকে উদার, সংযমী, দাতা ও দয়ালু হতে হয় । বললো — ঠিক্ আছে বাবা, তুমি যখন তোমার মাকে তোমার লেপটা দিতে চাইছো দিয়ে দাও। মায়ের কৃপা হলে তোমার জন্য আবার শীতের আগেই নূতন লেপ এসে যাবে ।

কল্যাণ দেব ব্রাহ্মণদের খুব শ্রদ্ধা করেন । তিনি গোপালকে বললেন — মেজো ঠাকুর, আপনার স্ত্রীকে যাবার সময় হাতির পিঠে চড়িয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেবো। সেদিন ভোরে আপনার স্ত্রী যেন যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন। আপনিও এক রাতের জন্য আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ী গিয়ে ঘুরে আসুন। ছোট ঠাকুর পুরোহিত মশায়কে পূজোর কাজে সাহায্য করবেন ।

কল্যাণদেব এর কথা শুনে খুব খুশী হয়েছে গোপাল । কল্যাণদেব এর স্ত্রী লতিকা লোক পাঠিয়ে মালতিকে দুর্গের ভেতর তার ঘরে নিয়ে গিয়ে আসনে বসিয়ে কিছু ফল, দুটো টাকা আর একটা নূতন দামী শাড়ি প্রণামী দিয়েছে। প্রণাম করে বলেছে — ঠা কুরাণ দিদি, আপনি আশীর্বাদ করবেন আমার গোবিন্দ জগন্নাথ আর ভক্তি যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করে সুখে বেঁচে থাকতে পারে।

মালতি বললো — মা তোমাদের সব আশা পূর্ণ করবেন।

দুপুরে বাগানে কয়েকদিন ভক্তিকে দেখা যায়নি । অন্য কিশোরীরা কল্যাণদেব এর ঘরে দু-একদিন পর পরই কোন না কোন কারণে যাতায়াত করে। গোবিন্দ, জগন্নাথ এবং ভক্তির অনুপস্থিতি তাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। ধাইমাকে জিজ্ঞেস করবো করবো করেও কোন কিশোরই তাদের খবর জানতে সাহস পায় নি। একদিন সকালে

জয়ন্ত মন্দিরের পুরোহিত গঙ্গাধরকে জিজ্ঞেস করলো — দাদা ঠাকুর, কয়েকদিন ধরেই গোবিন্দ, জগন্নাথ এবং ভক্তিকে দেখতে পাচ্ছি না। তাদের সম্পর্কে কিছু জানেন?

—হ্যাঁ দাদু ভাই ওরা তিনজনই উদয়পুর চলে গেছে। দু'বছর তাদের ঘোড়ায় চড়া, অসিচালনা, তীর চালনা প্রভৃতি কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গোবিন্দ যৌবনে পা দিয়েছে। রাজধানীতে রাজকুমার এবং কুমারদের সঙ্গে পরিচিত হলে এবং বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে সিংহাসনের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পাবে।

—দাদা ঠাকুর, শুনেছি উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী দেবী নাকি খুবই জাগ্রত। আপনি ত্রিপুরেশ্বরী মাকে দেখেছেন?

— দেখেছি কি গো, আমি তো প্রায় বার বছর দেবীর পুজোর কাজে নিযুক্ত ছিলাম। চন্তাই মুকুন্দ হরি আমাকে কসবা কালী পুজোর দায়িত্ব নিতে বললেন। ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমের মহন্ত প্রমোদানন্দ গিরিও আমাকে খুবই ভালো বাসতেন। তিনিও আমাকে কসবা কালী বাড়ীর দায়িত্ব নেওয়ার অনুরো জানালেন। চন্তাই মুকুন্দ হরি এবং মহন্ত পরমানন্দ গিরিকে সেনাপতি কল্যাণদেব একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে কসবা কালীবাড়ীতে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ কিংবা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের কেউই রাজধানী ছেড়ে, জাগ্রতা দেবী ত্রিপুরেশ্বরী কালীর সান্নিধ্য ছেড়ে এখানে আসতে রাজী হলেন না। শেষমেশ দু'জনে আমাকে ধরলেন। আমি জানি সারা বিশ্বেই মায়ের অবস্থান রয়েছে। ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকলে মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী করে তোলা যায়। ঐই যে মায়ের মাটির বিগ্রহ এই মাটির বিগ্রহেই মা কত লীলা করে চলেছেন। তুমি তো মন্দিরের পাশেই থাকো কোন রাতে কোন কিছু টের পাওনি?

—দুদিন পেয়েছি। রাত কত হবে জানিনা। ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাত কত হবে জানিনা। ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম নাট মন্দিরের কাছে কে যেন নূপুর পায়ে নাচছে। বাবাকে ডাক দিইনি. মন আনন্দে ভরে উঠেছিলো। দরজা খুলে বাইরে এলে বাবা টের পেয়ে যাবেন। আনন্দে ভাটা পড়বে। তাই চুপ করে শুমধুর নাচ শুনলাম।

—মা সখীদের নিয়ে মধ্যরাতে মন্দিরে নাচগান করেন।

—আপনি দেখেছেন?

—আমিও তোমার মতো ঘরে শুয়ে কান পেতে থাকি। নাচের শব্দ থেমে গেলে মশাল নিয়ে বের হই। নাট মন্দিরের ধূলো মাথায় ঐ বুকে মাখি। মায়ের কাছে প্রর্থনা জানাই মা আমাকে ভক্তি ও বিশ্বাস দান করো।

ভক্তির অদর্শন কিশোর জয়ন্তের মনে বিরহের বেদনা সৃষ্টি করেছিল। ভক্তির মিষ্টি হাসি কিশোর জয়ন্তকে আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে দিতো। সেদিন রাত্রে ভক্তির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমই আসছিল না। বড় মার দেওয়া মন্ত্র জপ্ করতে করতে ক্রমে অশান্ত

মন শান্ত হলো । ঘুমিয়ে পড়লো। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো তা সে জানে না। বড় মা তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন — জয়ন্ত উঠো, কান পেতে শুনো চিন্ময়ী মা মনের আনন্দে সখীগণ সহ কেমন সুন্দর নাচছে। নূপুরের সুমিষ্ট শব্দে স্থানটি মুখরিত হয়ে আছে।

জয়ন্ত দাদা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলো — দাদা ঠাকুর, দেবী কালীর কি সখী আছে? তারা কারা ?

—ভক্তরাই মায়ের সখী । শাস্ত্র মতে একমাত্র পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ আর সবই প্রকৃতি। আমাদের এই যে দেহ এই দেহটি প্রকৃতির পাঁচটি উপাদান দ্বারা গঠিত। এই পাঁচটি উপাদান হলো ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু এবং আকাশ। ক্ষিতি হচ্ছে পৃথিবী। অপ হচ্ছে জল বা সমুদ্র । তেজ হচ্ছে সূর্য রশ্মি। বায়ু হচ্ছে বাতাস আর আকাশ হচ্ছে মহাবোম বা মহা শূন্যতা । পৃথিবী থেকে আমরা যে অন্ন অর্থাৎ সকল প্রকার খাবার গ্রহণ করি সেই খাবার দ্বারা আমাদের শরীরের সমস্ত কোষ সমূহ শক্তিশালী এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর তিনভাগ জল। এক ভাগ স্থল। তোমাকে একদিন বলেছিলাম — শ্রীমতি রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ দিব্য সহস্র বৎসর রতিক্রিয়া করার সময় শ্রীমতি রাধারাণীর দেহ থেকে যে শ্রমজল অর্থাৎ ঘাম সৃষ্টি হয়েছিলো তা থেকেই সমুদ্রের সৃষ্টি। ঘাম লবণাক্ত হয়ে গেল। সূর্য কিরণ এবং বায়ু মিলিতভাবে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে বাষ্পীভূত করে মেঘের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠায়। মন্থন করা সমুদ্রের বাষ্পীভূত জল সুমিষ্ট রূপ ধারণ করে পর্বত গাত্রে বর্ষণ করে। সেই জল ধারা কোথাও ঝর্ণা রূপে কোথাও নদীরূপে পৃথিবীকে প্লাবিত করে আবার সমুদ্রের গভীরে এসে লয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টি যেখানে সেখানেই লয়।

সূর্য রশ্মি তেজরূপে লোম কূপ দ্বারা আমাদের দেহে প্রবেশ করে অগ্নির ধর্ম পালন করে। আমরা যেসব খাদ্য গ্রহণ করি সেই অগ্নি তেজ দ্বারা সেসব খাদ্য পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তিরূপে শরীরের সমস্ত কোষগুলোতে শক্তি ও পুষ্টি সঞ্চার করে। বাকী সব বর্জ পদার্থ হিসেবে মলরূপে বের হয়ে ধরিত্রী বা পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়। বায়ু আমাদের দেহে পাঁচভাবে দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। এই পাঁচ বায়ুর নাম হলো — প্রাণ, অপাণ, সমান উদ্যান এবং ব্যান । প্রাণ বায়ু আবার পাঁচ ভাবে পাঁচ প্রাণ রূপে দেহে অবস্থিত থেকে আমাদের অচল দেহকে সচল রাখতে সাহায্য করে। এই পাঁচ প্রাণ হলো — জীবাত্মা, ভুতাত্মা, পরমাত্মা, আত্মারাম এবং আত্মা রামেশ্বর। জীবাত্মা আমাদের দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেহ ধারণ করে। ভূতাত্মা বা প্রেতাত্মা আমাদের কর্মফল অনুযায়ী ফলভোগ করে। আর পরমাত্মা, আত্মারাম ও আত্মা রামেশ্বর এই তিন আত্মা বা জ্ঞান আমাদের দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরম ব্রহ্মে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

জয়ন্ত, তুমি যখন আরো বড় হবে তখন আমাদের আঠার পুরাণ, আঠার

উপপুরাণ, বেদ, পুরাণ, উপনীষদ, পাতঞ্জলি দর্শন আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কি উপদেশ দিয়েছেন তা তুমি জানতে পারবে। সংক্ষিপ্ত আকারে আমি পুঁথিতে লিখে রেখেছি।

ভগবান কশ্যপের চৌদ্দজন স্ত্রীর মধ্যে পাঁচজনকে আমরা বিশেষ ভাবে জানি। এই পাঁচজনের এক স্ত্রী হলেন — অদিতি। যার গর্ভে ইন্দ্র, বামনসহ বহু দেবতা জন্ম গ্রহণ করেছেন। ঐ সব দেবগণ অদিতি মাতার নাম অনুসারে আদিত্য নামে পরিচিত। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে ১২জন প্রধান।

আর এক পত্নী হলেন দিতি। দিতির গর্ভজাত সন্তানেরা মায়ের নাম অনুসারে দৈত্য নামে পরিচিত। সতীন পুত্র ইন্দ্র চিরকাল দেব সমাজের রাজা রূপে স্বর্গে রাজত্ব করছেন তাই দিতির মনে দুঃখ। তিনি স্বামী কশ্যপের কাছে ইন্দ্রের চেয়েও বলশালী এক পুত্র প্রার্থনা করলেন। কশ্যপ তাকে পরাক্রমশালী পুত্রের জননী হবার বর দিলেন। সে সংবাদ দিতির কানে গেলো। দিতিপুত্র ইন্দ্রকে জানালেন। ইন্দ্র মাকে অভয় দিলেন। এর রাতে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা দিতির গর্ভস্থ সন্তানকে উনপঞ্চাশ টুকরো করে ফেললেন।

দিতি বুঝতে পারলেন সতীনের পরামর্শে ইন্দ্র তার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করেছে। তিনি স্বামীর কাছে গেলেন। তার বরের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ভগবান কশ্যপ যদি এর প্রতিবিধান না করেন তাহলে ইন্দ্রকে অভিশাপ দেবেন এ রখা জানালেন। ভগবান কশ্যম দিতিকে অভয় দিলেন। বললেন — ইন্দ্রের কৃপায় তিনি ৪৯ জন ইন্দ্রের মতো বলশালী পুত্রের জননী হবেন। তবে তারা ইন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না। এরা উনপঞ্চাশ বায়ু নামে পরিচত।

এক সময় কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু শত ডিম্ব এবং বিনতা দুটি ডিম্ব প্রসব করলেন। আর এক পত্নী দনুর গর্ভে যে সমস্ত পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন তারা মায়ের নাম অনুসারে দানব নামে পরিচিত হলেন।

কদ্রু ও বিনতা ডিম্ব প্রসব করায় দুজনেই ব্যথিত চিত্তে মহর্ষি কশ্যপের স্মরণ নিলেন। মহর্ষি কশ্যপ তাদের অভয় দিয়ে বললেন এই ডিম থেকে যে সন্তানের জন্ম হবে তিন লোকে তাদের নাম ও যশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

কয়েক বছর পর কদ্রুর প্রসব করা শত ডিম ফেটে পরাক্রমশালী শত নাগ সৃষ্টি হলো। ঐ সব নাগেদের মধ্যে বাসুকি, শঙ্খচূড়, অনন্তনাগ, শেষ নাগ, তক্ষক, কালীয় নাগ প্রভৃতি নাগেরা ত্রিলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

কদ্রু সন্তানবতী হবার বহু বৎসর পরেও বিনতার দুই ডিম থেকে কোন সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়ায় বিনতা ধৈর্য হারিয়ে একটি ডিম ভেঙ্গে ফেলেন। সেই ডিম থেকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যশালী এক পুত্রের জন্ম হলো। কিন্তু অসময়ে ডিম ভেঙ্গে ফেলায় সেই পুত্র পঙ্গু হয়ে জন্ম নিল। সেই শিশু জন্মের পর মা বিনতাকে বললেন মা সতীনের প্রতি

ঈর্ষাবশত অসময়ে তুমি আমাকে জন্ম নিতে বাধ্য করায় আমি পঙ্গু হয়ে জন্মেছি। তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি যে সতীনের সৌভাগ্যে ঈর্ষাযুক্ত হয়ে তুমি এমন অন্যায় কাজ করেছ সেই সতীনের দাসী হয়ে থাকবে।

একে তো সন্তানের অপূর্ণতাজনিত দুঃখ তার উপর সন্তানের অভিশাপ বিনতার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হবার উপক্রম হলো। তিনি ছেলেকে বললেন— বাবা, আমি না বুঝে মহা অন্যায় করে ফেলেছি। সতীনের দাসত্ব থেকে কিভাবে মুক্ত হতে পারি তুমি আমায় সে কথা বলো।

— মা, তুমি ধৈর্য ধরে দ্বিতীয় ডিম থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। সেই সন্তান তোমাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করবে।

মহর্ষি কশ্যপ সেই সন্তানের নাম রাখলেন অরুণ। তাকে সূর্যের সারথি রূপে নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন পর কদ্রু ও বিনতার মধ্যে সূর্যের রথের ঘোড়ার ল্যাজের রঙ নিয়ে তর্ক বাঁধলো। বিনতা বললেন সূর্যের ঘোড়া যেমন সাদা তাদর ল্যাজও তেমনি সাদা। কদ্রু বললেন, কখনো না। সূর্যের ঘোড়া সাদা হলেও তাদের ল্যাজের রঙ কালো।

সতীনের ঝগড়ায় এবং দৈব বিপাকে বিনতা পুত্রের অভিসাপের কথা ভুলে গেলেন। দু'জনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে বাজীতে হেরে যাবে তিনি আজীবন অন্যের দাসী হয়ে থাকবেন। ঠিক হলো পরদিন ভোরে সূর্য পরিক্রমার সময়ে রথের ঘোড়ার ল্যাজের রঙ পরীক্ষা করে দেখবেন।

কদ্রু ঘরে গিয়ে তাঁর পুত্রদের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা জানালেন। বাসুকি মাকে বললেন— মা, তুমি বাজীতে হেরে যাবে। সূর্যের ঘোড়ার ল্যাজের রঙও সাদা। কদ্রু বললেন — বাবা, তোমরা থাকতে আমি সতীনের দাসত্ব করবো এ তোমরা সহ্য করতে পারবে ? আমাকে যাতে সতীনের দাসীত্ব না করতে হয় তোমরা তার ব্যবস্থা করো।

মাকে রক্ষা করতে প্রধান নাগগণ পরামর্শ করে কিছু নাগকে সূতার ন্যায় সরু এবং কালো রঙ ধারণ করে সূর্যের ঘোড়ার ল্যাজে ঝুলে থাকতে বললেন। দূর থেকে ঘোড়ার ল্যাজ তা হলে কালো বলেই মনে হবে।

নাগেরা তেমনি কাজ করলো। কদ্রু বিনতাকে নিয়ে এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সূর্যের মহা বিশ্ব পরিক্রমার সময় ঘোড়ার ল্যাজ লক্ষ্য করলেন। কদ্রু বললেন— দ্যাখো সূর্যের ঘোড়ার ল্যাজ কালো। দৈব ঘটনায় বিনতার তেমনটাই মনে হলো। তিনি কদ্রুর দাসী হলেন। আদেশ মতো কাজ করতে লাগলেন আর দ্বিতীয় ডিম থেকে করে সন্তান হবে তারজন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি সর্বদা দেবী ভগবতীকে স্মরণ করতে লাগলেন। দেবী ভগবতী একদিন স্বপ্নে বিনতাকে দর্শন দিলেন। বললেন— ঐ ডিম থেকে যে সন্তান হবে সে পরম বিষ্ণুভক্ত এবং ভগবান বিষ্ণুর মতো পরাক্রমশালী হবে। অমর হবে। তোমার দুঃখ দূর করবে। তুমি সর্বদা মাকে স্মরণ করতে থাক।

প্রায় পাঁচশো বছর কদ্রুর দাসত্ব করার পর বিনতার দ্বিতীয় ডিম থেকে এক পরাক্রমশালী পুত্রে জন্ম হলো। সেই পুত্রের জন্ম হবার পর দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন। স্বর্গের সমধুর বাদ্য ধ্বনিত হলো। কশ্যপ সেই পুত্রের নাম রাখলেন গড়ুর।

বিনতা পুত্রের কাছে নিজের দাসীত্বের কথা বললেন। গড়ুর বললেন মা, বিমাতা তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তবুও বিমাতাকে আমি জিজ্ঞেস করবো কি কাজ করে দিলে তিনি তোমায় দাসীত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতারক নাগদের তিনি ক্ষমা করবেন না। তাদের বিনাশ করবেন। গড়ুর বিমাতা কদ্রুকে একদিন বললেন— মা, আপনি এবং আপনার পুত্রগণ প্রতারণা করে আমার মাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করে রেখেছেন। আপনার পুত্রগণ প্রতারণা করায় তাদের আমি ক্ষমা করবো না। এখন আপনি বলুন — আপনার কোন কাজ করে দিলে মাকে আপনি মুক্তি দেবেন। আপনি যদি মাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেন তা হলে আপনার পাপের ভাগ আর একটু বড় হবে।

গড়ুর ইতিমধ্যেই ত্রিভুবন জয় করেছেন। দেবী ভগবতীর বরে পরম বিষ্ণুভক্ত হয়েছেন। বিষ্ণুর বাহন হয়েছেন। কদ্রু মনে মনে ভীত হলেন। বললেন— পুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি পরদিন তাকে শর্তের কথা জানাবেন।

কদ্রু পুত্রদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। বাসুকি, অনন্ত প্রভৃতি নাগগণ গড়ুরের পরাক্রম দেখেছেন। তাই তারা মাকে বললেন— গড়ুর যদি নাগদের জন্য অমৃত এনে দেয় তা হলেই বিনতাকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। গড়ুর রাজী হলেন।

নাগগণ ভাবলেন একবার অমৃত পান করতে পারলে গড়ুর তাদের হত্যা করতে পারবে না। আর স্বর্গলোক থেকে অমৃত আনাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

গড়ুর দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে অমৃত কলস নিয়ে এলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গড়ুরকে বুঝালেন স্বভাবে খল নাগগণ অমৃত পানের সুযোগ পেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। গড়ুর তাদের অমৃত কলস উপহার দেওয়ার পর তিনি অমৃত কলস অপহরণ করবেন। দ্বিতীয়বার যেন গড়ুর অমৃতের জন্য দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হন। মহামতি গড়ুর ইন্দ্রের কথায় রাজী হলেন. তিনি অমৃত কলস নিয়ে নাগদের সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন নাগগণ, কুশ অমৃতের পরশে পবিত্র হয়েছে। তাই অমৃত কলস কুশ বনে রেখে দিচ্ছি। তোমরা স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে কুশ বনে এসে অমৃত গ্রহণ করো। অমৃত কলস রক্ষার ভার তোমাদের। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবার তোমাদের মাকে বলো আমার মাকে যেন দাসীত্ব থেকে মুক্ত করেন।

নাগপুত্রদের কথায় কদ্রু জল হাতে নিয়ে সূর্যকে স্বাক্ষী রেখে বিনতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। কিছু নাগ অমৃত কলস পাহাড়ায় রইলেন কিছু নাগ নদীতে স্নান করতে গেলেন। গড়ুর মাকে সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কাক রূপ ধারণ করে অমৃতের কলস নিয়ে উড়ে পালালেন। নাগগণ কিছু বুঝার আগেই অমৃত

অপহৃত হয়ে গেল। নাগগণ হায় হায় করতে লাগলেন।

ইন্দ্র ঠোঁট দিয়ে কলসী ধরার সময় কলসী কাত হয়ে কিছুটা অমৃত সে স্থানে পড়ে গেলো। স্নান সেরে প্রধান নাগগণ এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে নিজেদের ভাগ্যকে দোষ দিলেন। কুশবনের সেই স্থানে চাটতে গিয়ে তাদের জিহ্বা দু'ভাগ হয়ে গেল। সে থেকে নাগেদের জিহ্বা বিভক্ত রয়ে গেল।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো— দাদাঠাকুর, আপনিতো বলেছেন উদয়পুরের দেবী ত্রিপুরেশ্বরী বিগ্রহ চট্টগ্রাম থেকে আনা হয়েছে। তা হলে ঐ বিগ্রহের তখন নিশ্চয়ই কোন নাম ছিলো। আপনি সে বিষয়ে কিছু জানেন ?

— না দাদু ভাই। ভগবান বিষ্ণুর জন্য চন্দ্রপুরে মন্দির তৈরী করা হয়েছিলো। গৌড় দেশ থেকে বিগ্রহ আনার আলোচনা চলছিলো। ঠিক ঐ সময়ে দেবী কৃপা করে উদয়পুর চলে এলেন। দেবী ভাগবতে মহর্ষি ব্যাসদেব একশত আটটি সতী পীঠের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই ১০৮টি সতী পীঠ হলো— বারানসীতে দেবীর মুখমন্ডল পড়েছিল। দেবী সেখানে বিশালাক্ষ্মী নামে পরিচিতা। নৈমিষারণ্যে দেবী লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগ ক্ষেত্রে ললিতা। গন্ধমাদনে কামুকী। দক্ষিণ মানস ক্ষেত্রে — কুমুদা। উত্তর মানস ক্ষেত্রে বিশ্বকামা। গোমন্তে গোমতী, মন্দর পর্বতে কাম চারিনী। চৈত্ররথ প্রদেশে মদোৎকটা। হস্তিনাপুরে জয়ন্তী। কান্যকুব্জে- গৌরী। মলয়াচলে-রম্ভা। একাম্রপীঠে — কীর্তিমতি, বিশ্বে বিশ্বেশ্বরী। পুস্করে পুরু হূতা। কেদার পীঠে শিবানী। হিমালয়ে মন্দাকিনি। গোকর্ণে — ভদ্রকর্ণিকা। স্থানেশ্বরে ভবানী বিল্বকে বিল্বপত্রিকা। ভদ্রেশ্বরে — ভদ্রা। বরাহশৈলে জয়া। কমলালয়ে কমলা। রুদ্র কোটীতে রুদ্রানী। কালঞ্জর গিরিতে — কালী। শালগ্রামে মহাদেবী। শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া। মহালিঙ্গে কপিলা। মাকোটে — মুকুটেশ্বরী। মায়াপুরীতে —কুমারী। সন্তানপীঠে — ললিতাম্বিকা। গয়াতে-মঙ্গলা। পুরুষোত্তমে — বিমলা। সহস্রাক্ষ পীঠে উৎপলাক্ষী। হিরনাক্ষ্যপীঠে মহোৎপলা। বিপাশায় অমোঘাক্ষী। পুন্ড্রবর্ধনে — পাটলা। সুপাশে নারায়ণী। ত্রিকুট পর্বতে— রুদ্রসুন্দরী। বিপুলাচলে— বিপুলা।

মলয় গিরিতে কল্যাণী। মহাদ্রিতে একবীরা। হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা। রামতীর্থে রমনা। যমুনাতে মৃগাবতী। কোটি তীর্থে— কৌটবী। গোদাবরীতে ত্রিসন্ধা। গঙ্গাদ্বারে — রতিপ্রিয়া। শিবকুন্ডে শুভানন্দা। সেবকী তটে নন্দিনী। দ্বারাবতীতে রুক্মিনী। বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকী। পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকুটে — সীতা, বিন্ধ পর্বতে বিন্ধবাসিনী, করবীর ক্ষেত্রে মহালক্ষ্মী। বিনায়ক পীঠে উমা দেবী। বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, মহাকালে— মহেশ্বরী। উষ্ণতীর্থে অভয়া। মান্ডবে — মান্ডবী। মাহেশ্বরী পুরে স্বাহা। ছলগন্ডে — প্রচণ্ডা। অমর কন্টকে চণ্ডিকা। সোমেশ্বরে বরারোহা। প্রভাসে — পুস্করাবতী নামে প্রসিদ্ধা।

সরস্বতী তটে দেবমাতা, সমুদ্রতীরে পারাবারা, মহালয়ে মহাভাগা, পয়োষ্ণতে পিঙ্গলেশ্বরী। কৃতশৌচে - সিংহিকা। কার্তিকে অতিশাঙ্করী। উৎপলাবর্তে - লোলা। শোন

সঙ্গমে - সুভদ্রা। সিদ্ধবনে - লক্ষ্মী। ভরতাশ্রমে — অনঙ্গা। জালন্ধরে বিশ্বমুখী। কিষ্কিন্ধাচলে তারা। দেবদারুবনে পুষ্টি। কাশ্মীর মণ্ডলে মেধা। হিমালয় পর্বতে —ভীমা। বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরী। কপালমোচনে শুদ্ধি। কায়ারোহনে মাতা। শঙ্খোদ্ধারে - ধরা। পিন্ডারকে ধৃতি। চন্দ্রভাগা নদী তীরে কলা। অচ্ছোদ সরোবরে শিবধারিনী বেনী ক্ষেত্রে- অমৃতা। বদরীক্ষেত্রে উর্বশী। উত্তরকুরুতে ঔষধী। কুশদ্বীপে - কুশোদকা। হেমকুট পর্বতে- মন্মথা। কুমুদ ক্ষেত্রে সত্যবাদিনী। অশ্বত্থে - বন্দনীয়া। কুবেরালয়ে নিধি। দেববদনে - গায়ত্রী। শিব সন্নিধানে - পার্বতী। দেবলোকে ইন্দ্রানী। ব্রহ্মমুখে - সরস্বতী। সূর্যবিম্বে প্রভা। মাতৃগণের মধ্যে বৈষ্ণবী। সতীগণের মধ্যে অরুন্ধতী। রমনীগণের মধ্যে তিলোত্তমা। সমুদয় শরীরিগণের শক্তি স্বরূপা। জীবের চিত্ত মধ্যে ব্রহ্মকলা।

জয়ন্ত, মহর্ষি ব্যাসদেব ঐসব পীঠস্থানের বর্ণনা দিয়ে মহারাজ জন্মেজয়কে বললেন — মহারাজ, যে ১০৮টি পীঠস্থানের বর্ণনা দেওয়া হলো তার মধ্যে কিছু পীঠস্থান রয়েছে যেগুলো শক্তিপীঠ রূপে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। যেমন —ইন্দ্রানী। সরস্বতী, বৈষ্ণবী, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি।

কালের প্রভাবে বিশেষ করে বৌদ্ধযুগে, ইসলামিক যুগে বহু পীঠস্থান এবং সতীপীঠ লুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে কিছু কিছু পীঠস্থান কিংবদন্তী অনুসারে পুনরুদ্ধার হয়েছে। তারমধ্যে সবগুলোই যে সতীপীঠ তেমনটা নয়। আমাদের উদয়পুরের পীঠস্থান সম্পর্ক্যে মতভেদ রয়েছে। মগধে এবং গৌড় দেশে দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর বিগ্রহ, মন্দির এবং জলাশয় রয়েছে। গৌড় দেশের বড়াল গ্রামে যে বিশাল ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ছিল মুসলমানেরা তা ধ্বংস করে দিয়েছে। বিগ্রহ ধ্বংস করেছে কিনা তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ত্রিপুরাসুন্দরী দীঘি এখনো দেবীর নাম প্রচার করছে। উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী পীঠ দেবীরূপে সকলের অন্তরেই বিরাজিতা আছেন। এ বিষয়ে কোন পন্ডিতের মধ্যেই কোন মতভেদ নেই। জয়ন্ত, তোমাকে আবিস্কৃত সতীপীঠ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো। আমার বয়স হয়েছে কখন মা আমায় কোলে টেনে নেবেন সে অপেক্ষায় বসে আছি। তোমার বাবা গোপাল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কিন্তু তত্ত্ব জানার আগ্রহ তোমার বাবার নেই। আমি গত সত্তর বছর ধরে যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা কার কাছে সঁপে যাব সে ভাবনায় ছিলাম। মা আনন্দময়ী সঠিক সময়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

গত চারশো বছরে বহুবার বহুতীর্থ, মন্দির, বিগ্রহ মুসলমানদের দ্বারা অপবিত্র ও ধ্বংস হয়েছে। মায়ের কৃপায় এবং ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় আবার ভক্তরা মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপন করেছেন। কল্যাণদেব যে বিগ্রহ তৈরী করেছেন সেই বিগ্রহও যে মুসলমানদের হাত থেকে কতকাল রক্ষা পাবে তার নিশ্চয়তা নেই।

—দাদা ঠাকুর, যিনি জগৎসৃষ্টি করেছেন, জগৎ পালন করছেন তাকে রক্ষার সামর্থ কি আমাদের আছে? আপনি তো অনেকবার বলেছেন জীব মাত্রই নারায়ণ। জীব মাত্রই

শক্তির অংশ। শক্তির সহায়তা ছাড়া জীবের পক্ষে মুহূর্তমাত্রও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমরা প্রকৃতির দয়ায় এবং প্রকৃতির মায়ায় সংসারে জীবন যাপন করছি। প্রকৃতির ইচ্ছে না হলে, দেবী মহামায়ার ইচ্ছে না হলে কি কেউ মন্দির, বিগ্রহ, জীবন নষ্ট করতে পারে ?

—তুমি ঠিক কথাই বলেছ দাদুভাই। সে জন্যই তো তোমাকে আমার অর্জিত জ্ঞান দান করে দিয়ে যেতে চাই। শক্তির ইচ্ছেতেই জীব জগতের বিভিন্ন জিনিষ সৃষ্টি হয়। কিন্তু উদ্ভিদ, প্রাণ, কীট, পতঙ্গ অর্থাৎ কোন প্রাণই মানুষের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মানুষ জড় পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। এই জড় পদার্থ অনিত্য। আমি নিজেই যেখানে থাকতে পারবো না সেখানে অন্যকে স্থান ছেড়ে দিতে কাপর্ণ কেন ? এই যে কালীমন্দির কয়েকজন সৈনিক যুদ্ধ জয়ের বাসনায় মা কালীর আশীর্বাদ পেতে একটি পাথরকে মায়ের প্রতীক মনে করে পূজো দিয়েছিলেন। যারা পূজো দিয়েছিলেন তারা সকলেই যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছিলেন তেমনটা হয় নি। যুদ্ধ মানেই হত্যা। একজনকে হত্যা করতে গিয়ে একজন নিজেই হত হয়েছেন। সৈনিকেরা যুদ্ধ করেন দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষার জন্য। তারা মারা গেলে বীরগতি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করেন।

দেবী সীতার কথা সংক্ষেপে বলে তোমাকে প্রচলিত সতীপীঠ সমুহের পরিচয় দেবো। ভবিষ্যতে এসব কথা তোমার কাজে লাগবে।

জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা প্রথমে চার ঋষির সৃষ্টি করেন। ঐ চার ঋষি হলেন— সনক, সনাতন, সনন্দ এবং সনৎ কুমার। চার ঋষি সর্বদা ধ্যানমগ্ন থাকায় সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। তখন তিনি বারোজন মানস সন্তান সৃষ্টি করেন। ঐ বারোজনের মধ্যে দেবর্ষি নারদ সৃষ্টি কাজে যুক্ত হতে অস্বীকার করেন। ব্রহ্মা তাকে অসুর কুলে জন্ম নেবার অভিশাপ দেন। দেবর্ষি তিনজন্ম তিন কুলে কাটিয়ে আবার দেবলোকে ফিরে আসেন।

বারোজন মানস সন্তানের মধ্যে প্রজাপতি দক্ষ সৃষ্টি কার্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার বহু সন্তান সন্ততির মধ্যে একজন হলেন সতী। প্রধান প্রধান দেবতা ও ঋষিগণ দক্ষের একাধিক কন্যাকে বিয়ে করেছেন। একা চন্দ্রই দক্ষের সাতাশজন কন্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। দেবী সতী ছিলেন কন্যাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা এবং সর্ব গুণান্বিতা। তিনি মনে মনে মহাদেবকে পতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দেবগণের মধ্যে প্রলয় কর্তা এবং সর্বগুণের আঁধার মহাদেবকে দক্ষ খুব একটা পছন্দ করতেন না। মেয়ের যোগ্য বরও তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি কন্যা সতীর সয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। মহাদেব প্রধান দেবতা হিসেবে সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। দক্ষের ধারণা ছিল সতী কোন যুবক প্রধান দেবতাকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেবেন। কিন্তু সতী মহাদেবের গলায় বরমালা দেওয়ায় তিনি কন্যার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং কন্যা সতীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে জামাতা মহাদেব এবং শ্বশুর দক্ষের মধ্যে বহুবার দেখা হয়েছে। অন্য জামাতাগণ শ্বশুর দক্ষকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেও মহাদেব কোন সময়ই শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম নিবেদন করেন নি। সে কারণে দক্ষ আরো বেশী ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শিবহীন এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

পিতা ব্রহ্মাসহ প্রধান প্রধান দেবগণ দক্ষরাজকে শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করতে বারণ করেন কিন্তু অহংকারে মত্ত মহারাজ দক্ষ তবু শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন। সমস্ত দেব-দেবীকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রধান প্রধান দেবগণের অনেকেই দক্ষের জামাতা। তাই শ্বশুরকে যজ্ঞ যাতে যথাসময়ে সম্পাদন হতে পারে তারা শ্বশুরকে যজ্ঞের কাজে সাহায্য করতে থাকেন।

সতী শিবকে বিয়ে করায় প্রজাপতি দক্ষ সতীকে বর্জন করেছিলেন। যজ্ঞে শিবকে আমন্ত্রণও জানানো হয়নি। দেবর্ষি নারদকে যজ্ঞের নিমন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি সব দেব-দেবীকে নিমন্ত্রণ করে কৈলাশে এলেন। শিব তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। দেবী সতী দেবর্ষিকে পাদ্য অর্ঘ দ্বারা সম্মানিত করলেন। দেব সমাজের এবং পিতা দক্ষের কোশল জিজ্ঞাসা করলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন- দেবী, আপনার পিতা এবং আমার অগ্রজ প্রজাপতি দক্ষ এক মহা অনর্থ বাঁধাতে চলেছেন। শিব ছাড়া কোন যজ্ঞ সম্পাদন হয় না। আপনার পিতা শিবহীন এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সকল দেবদেবীকে আমন্ত্রণ জানানোর ভার আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বারবার আমায় সাবধান করে দিয়ে বলেছেন— ভগবান শিব এবং আপনাকে যেন যজ্ঞের নিমন্ত্রণ না দেওয়া হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণুও দক্ষরাজকে শিবহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেছিলেন। দক্ষ শুনেন নি। দেবগণ ভেবে নিয়েছেন নিশ্চয়ই এর পেছনে আদ্যাশক্তি মহামায়ার কোন লীলা কাজ করছে। প্রজাপতি দক্ষ তাই মহাজ্ঞানী হয়েও অজ্ঞানের মতো কাজ করে এক মহা অনর্থকে আমন্ত্রণ জানাতে চলেছেন।

শিবহীন যজ্ঞের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। দেবী সতী বললেন — দেবর্ষী আমি বাবাকে বুঝিয়ে এই মহা অনর্থ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করবো। আমি বাবার কাছে যাবো।

দেবী সতী স্বামী শিবকে পিতার শিবহীন যজ্ঞের কথা জানালেন। পিতাকে এই অশুভ কাজ থেকে বিরত করতে তিনি বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। শিব জানতেন দেবী সতী পিতার সামনে গেলে পিতা দক্ষের ক্রোধ আরো বাড়বে। দেবী সতীর সামনে শিবের নিন্দা করবেন। দেবী সতী পতি নিন্দা সহ্য করতে পারবেন না। যজ্ঞে এক মহা অনর্থ হবে। তিনি অশনি সংকেতের কথা বলে দেবীকে পিতার বাড়ী যেতে নিষেধ করলেন। দেবী সতী শুনলেন না। তিনি স্বামী শিবকে অভয় দিয়ে তিনিই যে আদ্যাশক্তি মহামায়া তা শিবকে দেখানোর জন্য দশ মহাবিদ্যা রূপ ধারণ করলেন। এই দশমহা বিদ্যা রূপ হলো—

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা। এই দশ মহাবিদ্যার ভৈরব হলেন কাল, অক্ষোভ, পঞ্চ বক্র, এ্যম্বক, কাল ভৈরব, কবন্ধ, আশুতোষ, রুদ্র, মাতঙ্গ এবং শিব।

সবভূতকে যিনি সংহার করেন তিনি হলেন কাল। আর সেই কাল বা সংহার রূপী মহাকালকে যিনি সাধনা দ্বারা জয় করেছেন তিনি হলেন কালী। কালীর আবার বিভিন্ন রূপ রয়েছে। তিনি দক্ষিণা কালী এবং বামাকালী রূপেও দেব সমাজে পূজিতা হয়েছেন। ঐ দুই প্রকার রূপ ছাড়াও কালী-শ্যামাকালী, রুদ্রকালী, গুহ্যকালী এবং শ্মশানকালী নামেও অভিহিতা এবং পূজিতা। ঐ সব রূপ ভেদে ধ্যান, মন্ত্র যন্ত্র ও মুদ্রাও আলাদা আলাদা। কালী চার হাতে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, খড়্গ এবং অসুর মুণ্ড ধারণ করে আছেন। গলায় পঞ্চাশটি অসুর মুণ্ডের মালা শোভিত। তত্বের বিচারে ঐ পঞ্চাশটি মুণ্ড হলো পঞ্চাশটি বর্ণের প্রতীক। অ হতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণ রয়েছে। প্রত্যেক বর্ণকে অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়। প্রত্যেকটি বর্ণ একটি গুণের এবং ভাবের প্রতীক। মহাকালী পঞ্চাশটি গুণের অধিকারীনি। তিনি জ্ঞান রূপ অসি দিয়ে মনরূপী অসুরকে সর্বদা সংযত রাখেন। মায়ের হাতের মুণ্ড হচ্ছে মনকে দমিত রাখার প্রতীক।

মহাকাল মায়ের পদতলে শায়িত। অর্থাৎ মহাকালকে তিনি সর্বদা ভৃত্যবৎ সংযত রাখেন। মায়ের জিহ্বা দাঁত দ্বারা দংশিত হচ্ছে। জিহ্বা হচ্ছে ভোগ ও লালসার প্রতীক। মা রসনা তথা জিহ্বাকে সংযত রেখে জীবকে বাক্ সংযমী এবং লোভ ও লালসাকে সংযত রাখার উপদেশ দিচ্ছেন।

মা মহাশক্তি দুর্গার ললাট থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন — তিনি মহাপ্রকৃতির প্রধান অংশ স্বরূপা। প্রকৃতি সর্বদাই সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত থাকেন। তাই মহাপ্রকৃতি সরূপিনী মহাকালী বিবসনা।

তাঁর পূজায় মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন ক্রিয়ার প্রচলন রয়েছে। সে জন্য যারা স্থূলভাবে দেবী কালীর উপাসনা করেন তারা মধ্যরাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য সহযোগে দেবীর কাছে ভোগ নিবেদন করেন। সাধকগণ কেউ মাতৃভাবে, কেউ বীরভাবে আবার কেউ সখীভাবে ভজনা করেন। মাতৃসাধনা উত্তম সাধনা। সখীভাবে মধ্যম আর বীরভাবের সাধনাকে অধম স্তরের অর্থাৎ তমোগুণী সাধনা বলে গণ্য করা হয়। কোন কোন ঋষি সখীভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সখীভাবে ভজনা একমাত্র গোপীদের দ্বারাই উত্তমভাবে হয়ে থাকে।

জয়ন্ত, আমাদের দেহে সুক্ষাতিসুক্ষ বত্রিশ হাজার নাড়ী আছে। এই বত্রিশ হাজার নাড়ীর মধ্যে বত্রিশটি নাড়ী প্রধান। আর তিনটি নাড়ী অতি প্রধান। এই তিন অতি প্রধান নাড়ীকে ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না বলে অভিহিত করা হয়। তোমাকে বলেছি দেবী কালী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে করতে কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। তার রূপ কোটি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল

আবার চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ। সে জন্য সাধারণের দৃষ্টিতে মায়ের রূপ কালো বলে ভ্রম হয়।

বলা হয়েছে যে সাধক মৎস্য, মাংস, মদ্য এবং মৈথুন ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনিই দেবী কালীর প্রকৃত পুরোহিত হতে পারেন।

আমাদের দেহের ভেতর ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না নামক নদীর ত্রিবেনী সঙ্গমে শ্বাস ও প্রশ্বাস নামে দুটো মাছ আছে। যে সাধক ঐ শ্বাস- প্রশ্বাসরূপী মাছ দুটোকে বশ করতে পারেন তিনি মৎস্য সাধক বলে কথিত হন। অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস ও প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা।

মা শব্দের অর্থ রসনা বা জিহ্বা। যিনি সাধনার দ্বারা রসনাকে জয় করতে পেরেছেন তিনি বাক্ সংযমী এবং লোভ ও লালসাকে জয় করতে পেরেছেন। অর্থাৎ যিনি বাক্ সংযমী এবং লালসাশূন্য তিনিই মাংস সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। আমাদের শরীরে ছয়টি চক্র আছে। তাকে ষট চক্র বলে অভিহিত করা হয়। গুহ্যদ্বারকে বলা হয় মূলাধার। মূলাধারে চতুর্দল পদ্ম রয়েছে। সেই মূলাধার পদ্মে দেবী মহামায়া কুলকুন্ডলিনী শক্তিরূপে আড়াই বার প্যাচ দ্বারা শিবরূপী মহাকালকে বেষ্টন করে রয়েছেন। সাধক সাধনার দ্বারা এই কুলকুন্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার থেকে সহস্রারে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কুল- কুন্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হলে কখনো সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভভ হয় না।

মূলাধারে চক্রের উপরে নাভির নীচে ষষ্ঠদল পদ্ম বিশিষ্ট একটি চক্র রয়েছে। ঐ চক্রাকে স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে। তার উপরে নাভিদেশে রয়েছে দশদল পদ্ম বিশিষ্ট চক্র। ঐ চক্রকে মণিপুর চক্র বলে। বুকে দ্বাদশদল পদ্ম বিশিষ্ট যে চক্র রয়েছে তাকে অনাহত চক্র বলে। কণ্ঠ দেশে যে চক্র রয়েছে তাকে বিশুদ্ধ চক্র বলে। ঐ চক্র ষোড়শদল বিশিষ্ট। আজ্ঞা চক্রের স্থান কপালে দুই ভ্রূর মাঝখানে। ঐ চক্র দুইদল বিশিষ্ট। মাথায় যেখানে মগজ রয়েছে বলা হয় সেখানে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম যাকে সহস্রার চক্র বলা হয়। পরম ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্মময়ী হংসরূপ ধারণ করে সেই সহস্রারে সর্বদা বিরাজমান রয়েছেন। তন্ত্ররাজ এবং শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি গ্রন্থে ঐ ছয় টি চক্র ছাড়া আরো দুটো চক্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। ঐ দুইটি চক্রের নাম হলো — অষ্টদল পদ্ম বিশিষ্ট লম্বিকা চক্র। এর স্থান হলো অনাহত এবং মণিপুরের মধ্যভাগে। আর রয়েছে সূল চক্র। এই চক্র ছয়দল পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর অবস্থান বিশুদ্ধ চক্র এবং আজ্ঞা চক্রের মধ্যস্থলে। সাধারণ ছয়টি চক্রের কথাই অধিকাংশ গ্রন্থে বলা হয়েছে। এই ষটচক্র ভেদ করে সপ্তম চক্র সহস্রারে পৌছাতে পারলে সাধক বা সাধিকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এবার তোমাকে দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারা সম্পর্কে কিছু বলছি শোন—

একবার দেবতা ও দৈত্যগণ সমুদ্র মন্থন করে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন

রত্ন সমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সমুদ্র মন্থনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্র থেকে স্বর্গ লক্ষ্মীকে উদ্ধার করা। স্বর্গ লক্ষ্মীকে হারিয়ে দেবতাগণ স্বর্গ থেকে বিতারিত হয়ে কষ্টে দিন যাপন করছিলেন।

— স্বর্গ থেকে স্বর্গ লক্ষ্মী সমুদ্রে চলে গেলেন কেন ?

— সে এক বিরাট কাহিনী। একবার মহর্ষি দুর্বাশা আকাশ পথে ভ্রমণের সময় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়। দুর্বাশা ইন্দ্রের মঙ্গল কামনায় তাকে একটি মালা উপহার দেন। দেবরাজ ইন্দ্র অহংকার বশে সেই মালা বাহন ঐরাবতের মাথায় রেখে দেয়। ঐরাবত শুঁড় দিয়ে মাথা থেকে মালাটি নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুর্বাশা ঋষি ছিলেন অত্যন্ত রাগী। তাঁর দেওয়া আশীর্বাদের এমন অবমাননা দেখে দুর্বাশা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। বললেন ইন্দ্রের অহংকারে অচিরেই স্বর্গলক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করবেন এবং স্বর্গ দৈত্যদের দ্বারা অধিকৃত হবে।

দুর্বাশা ঋষির অভিশাপ অচিরেই ফলে গেল। ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে দৈত্যগণকে সমুদ্রের বিভিন্ন রত্নের লোভ দেখিয়ে সমুদ্রে মন্থনে রাজী করানো হলো। বাসুকি নাগ মন্থনের দড়ি হলেন। মন্দর পর্বত মন্থনের দণ্ড হলো। ভগবান বিষ্ণু কুর্মরূপ ধারণ করে নিজ পিঠে সমুদ্রের বুকে মন্দর পর্বত ধারণ করলেন।

সমুদ্র মন্থনে সমুদ্র থেকে বিভিন্ন রত্ন উঠতে লাগলো। দুর্বাশার অভিশাপে ঐরাবতও লক্ষ্মীর মতো সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী, ঐরাবত, উচ্চশ্রবা ঘোড়া, কৌস্তভ মণি, পারিজাত ফুল এবং সবশেষে চিকিৎসক ধন্বন্তরি অমৃত কলসীসহ সমুদ্র থেকে উপরে উঠে এলেন। দৈত্যগণ সব দাবী ছেড়ে দিয়ে অমৃতের ভাগ চাইলেন। শুক্রাচার্য বলে দিয়েছেন অমৃত যে পান করবে সেই অমর হয়ে যাবে।

অমৃত লাভের পর কে এই অমৃত বিতরণ করবেন এই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ভগবান বিষ্ণু মোহিনী বেশ ধারণ করে অমৃত বিতরণের প্রস্তাব দেন। মোহিনীর রূপে মোহিত হয়ে দৈত্যগণ সেই প্রস্তাব মেনে নেন। ঠিক এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হন মহাদেব। মহাদেবকে বঞ্চিত করে দেবগণ সব কিছু ভাগ করে নিয়েছেন তাই মহাদেব অবার সমুদ্র মন্থনের আদেশ দিলেন। দৈত্যগণ একমাত্র শিবকেই শ্রদ্ধা করেন। তাই শিবের প্রস্তাবে তারা দ্বিতীয়বার সমুদ্র মন্থনে সহায়তা করতে রাজী হলেন। সমুদ্র মন্থনে ক্লান্ত বাসুকীর মুখ থেকে তীব্র বিষ বের হলো। সেই বিষ যেখানে পড়বে সে স্থান ধ্বংস হয়ে যাবে। শিব একটা পাত্রে সেই বিষ ধারণ করলেন। তারপর দেবতাগণের অনুরোধে সৃষ্টি রক্ষার জন্য তিনি সেই বিষ পান করলেন। বিষের যন্ত্রণায় তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। মহাদেব অচেতন অবস্থায় থাকলে সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে তাই আদ্যাশক্তি মহামায়া মাতৃরূপ ধারণ করলেন। শাড়ির আঁচলে শিশুরূপী শিবকে কোলে নিয়ে স্তন দান করলেন। মহামায়ার ঐ রূপ হচ্ছে তারা। তারার আর এক নাম নীল সরস্বতী।

ভগবান বিষ্ণু ভাবলেন অসুরেরা অমৃতের ভাগ পেয়ে অমর হয়ে গেলে তিনলোকের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হবে। তাই তিনি দৈত্যদের মোহিত করতে মোহিনী বেশ ধারণ করলেন। এরই মধ্যে দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে কে অমৃত বিতরণের ভার নেবে তা নিয়ে উভয় পক্ষেই বিতণ্ডা শুরু হয়। মোহিনীরূপী ভগবান বিষ্ণু দু'পক্ষকে শান্ত করে বললেন— হে দেব ও দৈত্যগণ, আপনারা দু'পক্ষ রাজী থাকলে আমি দু'পক্ষের মধ্যে অমৃত বিতরণের দায়িত্ব নিতে পারি।

ভগবান বিষ্ণুর মায়ায় স্বয়ং মহাদেব পর্যন্ত মোহিত হয়ে পড়েন। মোহিনীর প্রস্তাবে দু'পক্ষই রাজী হলেন। মোহিনী অমৃতের কলস নিয়ে প্রথমে দেবগণকে অমৃত বিতরণ শুরু করেন। দু-একজন দৈত্য এতে আপত্তি করলেন। মোহিনী বললেন— তিনি অবলা নারী। অমৃতের কলস নিয়ে তিনি পালিয়ে যাবেন না। দৈত্যগণ একটু সময় ধৈর্য্য ধারণ করুন।

দৈত্য সেনাপতি রাহু এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন। তিনি দেবতার রূপ ধারণ করে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝে গিয়ে বসলেন। ছদ্মবেশী রাহুকে চন্দ্র ও সূর্য চিনতে পারলেন। মোহিনী রূপী বিষ্ণু রাহুর হাতে অমৃত দেওয়া মাত্র রাহু তা পান করলেন। চন্দ্র ও সূর্য হায় হায় করে মোহিনীকে বললেন ও দেবতা নয়। দেব বেশী রাহু।

ভগবান বিষ্ণু সে কথা শোনা মাত্র মোহিনী বেশ ত্যাগ করে সুদর্শন দিয়ে রাহুর মাথা কেটে ফেললেন। অমৃত পান করায় রাহুর মৃত্যু হলো না। গলা থেকে পা পর্যন্ত অংশ সর্পাকৃতি হয়ে শূন্যে ঘুরতে লাগলো। ব্রহ্মা মুণ্ডহীন ঐ শরীরকে কেতু নামে অভিহিত করলেন।

বিষ্ণুর ছলনা প্রকাশ হবার পর দেব ও দৈত্যদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হলো। ইন্দ্র পুত্র জয়ন্ত অমৃতের কলসী নিয়ে পালাতে শুরু করলেন। দৈত্যরা তাকে তাড়া করলো। জয়ন্ত চার স্থানে অমৃতের কলসী নিয়ে বিশ্রাম করেছিলেন। ঐ চার স্থান হলো — হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়নী এবং নাসিক। ঐ চারস্থানে কুম্ভ মেলা হয়।

দশ মহাবিদ্যার তৃতীয় শক্তি হচ্ছেন দেবী ষোড়শী। তিনি কুমকুমের মতো অরুণ বর্ণা। রাজ রাজ্যেশ্বরী এবং ত্রিপুরা সুন্দরী নামেও তিনি অভিহিতা।

চতুর্থ মহাবিদ্যা হলেন — দেবী ভুবনেশ্বরী। তিনি ভুবনকে পালন করেন। তিনি রক্ত বর্ণা এবং রক্তবর্ণ পদ্মের উপর উপবিষ্ঠা।

পঞ্চম শক্তি হলেন ভৈরবী। তাঁর চার হাত। এক হাতে জপ্ মালা। এক হাতে কমণ্ডলু। এক হাতে বরমুদ্রা। এক হাতে অভয়মুদ্রা। তিনি দুঃখ নাশিনী।

ছিন্নমস্তা হলেন দেবী মহামায়ার ষষ্ঠ মহাবিদ্যা রূপ। তিনি দ্বিভূজা এবং দিগম্বরী। এক হাতে নিজের কাটা মুণ্ডু। অন্য হাতে অসি। তিনটি শোণিত ধারা প্রবাহিত হয়ে একটি ধারা নিজের কাটা মুন্ডের মুখে অপর দুই ধারা দু'পাশের দুই সখীর মুখে পড়ছে।

দেবীর সপ্তম শক্তি হলো ধূমাবতী। তিনি বিধবা। তার এক হাতে কুলা, অপর হস্ত কর্মক্ষম ও কম্পমান। তিনি ধূম্রবর্ণা এবং দ্বিভূজা। বৃদ্ধা। অষ্টম শক্তি হচ্ছে — বগলা। এই দেবীর নাম স্মরণে সর্বকার্যে সফলতা আসে। দেবী এক হাতে অসুরের জিহ্বা টেনে ধরেছেন, অপর হাতে রয়েছে গদা।

মাতঙ্গী দেবীর নবম রূপ। দেবী চতুর্ভূজা। তিন হাতে অংকুশ অসি, ও পাশ চতুর্থ হাতে বরাভয়। দশম শক্তি হচ্ছে কমলা। চারটি হস্তী চারটি জলপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা দেবীর অভিষেক ক্রিয়ায় রত।

দেবী সতী নিজের দশমহাবিদ্যারূপ স্বামী শিবকে দেখানোর পর শিব দেবীকে দক্ষালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি এসে দেখলেন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। দেবী পিতাকে অনুরোধ করলেন দূত পাঠিয়ে শিবকে যজ্ঞে আনার জন্য। দক্ষ শুনলেন না। অশ্লীল ভাষায় কন্যা সতী ও শিবের নিন্দা করতে লাগলেন। পতী নিন্দা সহ্য না করতে পেরে দেবী সতী যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগ করলেন। ত্রিলোকে মহা উৎপাৎ শুরু হলো দুপুরে ঘন ঘন উল্কাবৃষ্টি হতে লাগলো। দক্ষ মহাদেব ধ্যানযোগে সবকিছু জেনে ক্রোধে নিজের জটা ছিড়ে এক মহাবীরের জন্ম দিলেন। সেই বীরের নাম বীরভদ্র। মহাদেব বীরভদ্রকে যজ্ঞ পণ্ড করার পরামর্শ দিলেন। বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে গিয়ে দক্ষের মস্তক ছিন্ন করে যজ্ঞের আগুনে ফেলে দিলেন। যজ্ঞ পণ্ড হলো। দেবগণের অনুরোধে শিব দক্ষের দেহের সঙ্গে একটি ছাগমুন্ড যুক্ত করে দক্ষকে জীবিত করে তুললেন। দক্ষ ছাগ মুন্ড হয়ে বেঁচে রইলেন। শিব সতীর দেহ কাঁধে তুলে ত্রিলোক ভ্রমণ করতে লাগলেন। দেবগণের কৃপায় দক্ষের পূর্ণজ্ঞান বজায় রইলো।

শিবকে নিজের কাজে নিযুক্ত না করতে পারলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা দেবীর দেহ টুকরো টুকরো করে ফেললেন। শিব যখন বুঝতে পারলেন সতীর দেহ নষ্ট হয়ে গেছে তখন তিনি মহা সাধনায় মগ্ন হলেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে শিবকে তাঁর কাজে নিযুক্ত করতে মহামায়া পার্বতীরূপে হিমালয় ও মেনকার ঘরে আবির্ভূতা হলেন।

জয়ন্ত, তোমাকে দেবী ভাগবতে বর্ণিত ১০৮টি পীঠের কথা বলেছি। কুব্জিকা তন্ত্রে, পীঠ মালা তন্ত্রে এবং তন্ত্র চূড়ামণিতে ত্রিপুরা পীঠের নাম পাওয়া যায়। তবে ঐ ত্রিপুরা সেই ত্রিপুরা কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে কারণ উদয়পুরের পূর্বনাম ছিল রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মগরাজাগণ রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ সম্প্রদায়ের লিকা নামক রাজাকে রাঙ্গামাটি থেকে বিতারিত করে রাঙ্গামাটিতে রাজধানী স্থাপন করেন ডম্বুর ফা বা ডাঙ্গর ফা।

পীঠমালাতন্ত্রে দেবী সতীর যে ৫১টি পীঠের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অতি সংক্ষেপে তোমায় তা শুনাচ্ছি। মানুষের পরমায়ু পদ্মপাতার জলের মতো। কখন জীবন প্রদীপ নীভে যায় তার ঠিক নেই।

—দাদু, আমি মায়ের কাছে আপনার শতায়ু কামনা করবো। আপনি আরো দীর্ঘকাল সুস্থ দেহে মায়ের সেবা করুন । সাধক ছাড়া তীর্থ হয় না । আপনার সাধনায় দেবী মহামায়া এখানে জাগ্রত রূপে অবস্থান করছেন। ভক্ত ও ভগবান, মা ও সন্তান অভিন্ন সত্যা। আপনার সাধনায় মা এখানে সর্বদা বিরাজিতা। আপনার কৃপায় আমি মাঝে মাঝে মায়ের উপস্থিতি বুঝতে পারি।

— তুমি ঠিকই বলেছো জয়ন্ত, মা এখানে সর্বদা বিরাজমান। আসলে মা এখানে বাঁধা পড়ে আছেন কল্যাণতনয়া ভক্তির ভক্তিতে। ও শাপ ভ্রষ্টা মহা যোগিনী। সেই যোগিনীকে কল্যাণ উদয়পুর পাঠিয়েছে সামরিক বিদ্যালাভ করার জন্য । সবই মায়ের ইচ্ছে । মায়ের ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। আজ তিনদিন হলো ভক্তি কৈলাগড়ে নেই । মনে হচ্ছে এই তিনদিন ধরে মাও এখানে নেই। ভক্তির সঙ্গে মাও উদয়পুর চলে গেছেন। তিনদিন ধরে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি মা, তুমি ভক্তিকে ফিরিয়ে আনো। ভক্তি ছাড়া কমলাসাগর মন্দির ভক্তি শূন্য হয়ে পড়েছে।

দু'জনের কথোপকথনের এই মুহূর্তে কল্যাণদেব এসে হাজির হলেন। গঙ্গাধর পণ্ডিতকে প্রণাম করলেন। তারপর মাকে এবং পরে হাতজোর করে জয়ন্তকে । গঙ্গাধর পুরোহিত কল্যাণদেবকে বললেন— কল্যাণ, মায়ের সামনে কিংবা বিগ্রহের সামনে রক্তমাংসে গড়া মানুষকে প্রণাম করতে নেই।

কল্যাণদেব জিভ্ কেটে বললেন— পুরোহিত ঠাকুর এমনটা বলবেন না। তা হলে শাস্ত্র মিথ্যে হয়ে যাবে। আপনারা পুজো কিংবা যজ্ঞের সময় প্রথমে গণেশের পূজা করেন তারপর ব্রাহ্মণের পুজো করেন তারপর অন্য দেবদেবীর ।

— সে তো ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মাকে ব্রাহ্মণ রূপে যজ্ঞে ও পূজায় আবাহন করে পূজাকার্য সম্পাদন করার প্রার্থনা জানানো নয়। আমরা তো প্রকৃতির পাঁচ উপাদানে গড়া নশ্বর দেহের অধিকারী। প্রকৃতির দেহ প্রকৃতিতেই মিশে যায়।।

— তারজন্য কি হলো, আপনারা হলেন দেব-দেবীর সজীব তথা চলন্ত বিগ্রহ। আপনারা যজমানকে আশীর্বাদ করেন । যজমানের কল্যাণে যজ্ঞ ও পূজা করেন । পুরোহিত এবং সাধক সাধিকাগণ হলেন ভক্ত ও ভগবান, জীব ও ভগবানের মধ্যে মিলনের সেতু।

— ভক্তির জন্য আমার মন কেমন করছে। মনে হচ্ছে ভক্তিবিহনে আমার মনের ভক্তি চলে গেছে। কল্যাণ, ভক্তিকে কি সামরিক শিক্ষা না দিলে হয় না ? ওতো একজন পরম সাধিকা। ওর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে তোমার পরম কল্যাণ। তুমি তাকে দূরে সরিয়ে রাখলে মনের দিক থেকে শান্তি পাবে না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন পুরোহিত ঠাকুর । আমি ক্ষত্রিয়। শত্রুর মোকাবেলা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভক্তিকে কুড়িয়ে পেলেও ভক্তিই আমার ছেলেদের চাইতেও আপনজন

হয়ে উঠেছে। ভক্তিকে দূরে পাঠিয়ে আমরা স্বামী স্ত্রী মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। গতকাল রাতে মা কালী স্বপ্নে দেখা দিলেন। বিষণ্ণ মনে মা বললেন— ভক্তিকে ছাড়া তিনিও আনন্দ পাচ্ছেন না। ভক্তিকে যেন ফিরিয়ে আনা হয়। আমার ঘুম ভাঙ্গার পরই আমি ঠিক করলাম ভক্তিকে ফিরিয়ে আনবো। ভোরে এক দূতকে উদয়পুর পাঠিয়ে দিয়েছি। পরশু ভক্তি তার লীলা ক্ষেত্রে হয়তো পৌঁছে যাবে।

আপনাকে এই খবরটা না দেওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। স্বপ্নের কথা সকালে লতিকাকে বলেছি। এখন আপনারা দু'জন জানলেন। এই কথা আর অন্য কাউকে বলবেন না। জয়ন্ত ঠাকুর, তুমিও অন্য কাউকে এমনকি তোমার বাবাকেও বলবে না।

গঙ্গাধর বললেন— কল্যাণ, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো। জয়ন্ত খাঁটি ব্রাহ্মণ। এসব গোপন কথা অন্য কোথাও প্রকাশ করবে না।

জয়ন্ত বললো — সেনাপতি মশায়, আমি বয়সে আপনার ছেলে গোবিন্দের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। তবুও আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই দিব্য স্বপ্নের কথা আমি কাউকে বলবো না। আপনি ভক্তিকেও বলবেন না। তাতে তার সাধনার ক্ষতি হবে।

—ঠিক আছে ছোট ঠাকুর। তোমার কথা স্মরণে থাকবে। পুরোহিত ঠাকুর, আমি চলি। জয় মা কালী।

কল্যাণদেব চলে যাওয়ার পর গঙ্গাধর বললেন — জয়ন্ত, পীঠমালা তন্ত্রে সতীপীঠের বর্ণনা অর্থাৎ ক্রম শুরু হয়েছে উত্তর পশ্চিম কোন থেকে। শেষ হয়েছে দক্ষিণে। আমি তোমায় সেই ক্রম অনুসারে কাহিনী শুনবো দেবতাত্মা হিমালয়ে অধিষ্ঠিত সতী পীঠের বর্ণনার মাধ্যমে।

মানস সরোবর তথা সহস্রার থেকেই সতী পীঠের বর্ণনা শুরু করছি। মানস সরোবরে দেবীর দক্ষিণ হাত পড়েছে। সেখানে দেবীর নাম মহামায়া বা নবদুর্গা বা দাক্ষায়ণী। ভৈরবের নাম — কপালী বা অমর।

কাশ্মীরের পুণ্যধাম অমরনাথে পড়েছে দেবীর কণ্ঠ। দেবী সেখানে মহামায়া বা ভগবতী নামে পরিচিতা। সেখানে ভৈরবী হলেন — সন্ধ্যেশ্বর। এখানে দেবী শিলারূপে অধিষ্ঠিতা। এখানে এক সময় দেবীর বিশাল স্বর্ণ নির্মিত বিগ্রহ ছিল। আলাউদ্দীন খলজী সেই বিগ্রহ নষ্ট করে স্বর্ণ লুণ্ঠন করে। তারপর থেকে আর বিগ্রহ নির্মিত হয়নি।

— ঠাকুর মশায়, আমরা যাদের জাগ্রত বিগ্রহ বলি। পীঠস্থান বলি। ঐসব স্থান মানুষের দ্বারা কেন ধ্বংস হয়?

— যখন তীর্থ মাহাত্ম্য বেশী করে প্রচারিত হয় তখন অগণিত ভক্ত ও তীর্থযাত্রী সেই বিগ্রহ দর্শন ও পূজন করতে আসেন। দর্শক ও ভক্তের আগমনে সে স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পড়ে। পুরোহিত তাদের কৃতিত্বকে বড় করে দেখতে থাকেন। তখন দেব কিংবা দেবী

সেই স্থান ত্যাগ করেন। তীর্থস্থান ধ্বংস করে দেবার ব্যবস্থা করেন। না হলে বহু ভক্ত এখানে এসে পুরোহিত এবং সেবকদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকেন। ধর্মের গ্লানি হয়।

হিঙ্গুলাতে পড়েছে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র। দেবীর নাম হিঙ্গুলা। দেবীর নাম অনুসারেই স্থানের নাম হয়েছে। এখানে ভৈরব হলেন — ভীমলোচন। বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী শহরের প্রায় শত মাইল দূরে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

প্রয়াগের ত্রিবেনী ঘাটের প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক মন্দিরে গর্ভগৃহে এক পাথরের বেদীতে দেবীর অবস্থান। দেবীর নাম ললিতা। ভৈরব হলেন ভব। এখানেও এক সময় দেবীর অপূর্ব বিগ্রহ ছিল। আলাউদ্দিন সেই বিগ্রহ ধ্বংস করার পর বেদীকেই ললিতা দেবীর বিগ্রহরূপে পূজা করা হচ্ছে।

বারাণসীর মণি কর্ণিকা ঘাটের নিকট দেবীর মণিময় কুন্ডল পড়েছিল। দেবীর নাম বিশালাক্ষ্মী ভৈরব হলেন — কাল ভৈরব। বারানসী পৃথিবীর পুরনো শহর। প্রাচীন হস্তিনাপুর রাজ প্রাসাদের প্রায় দু'ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল কন্যাশ্রম তীর্থ। সেখানে দেবীর পৃষ্ঠ দেশ পড়েছিল। দেবীর নাম সর্বানী। ভৈরব হলেন — নিমিষ। দেবী কুন্তী ও দেবী গান্ধারী সেখানে প্রায়শই পূজো দিতে যেতেন। পৃথ্বিরাজ চৌহানকে পরাজিত করে হস্তিনাপুর দখলের পর ঐ তীর্থস্থান তৈমুর লঙ এর সৈন্যদের দ্বারা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। তারপর দিল্লীতে ক্রমান্বয়ে মুসলমান শাসন চালু থাকায় ঐ তীর্থ আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

দেবীর ত্রিনেত্র কোথায় পড়েছে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে না পাকিস্তানের করাচী শহরের কাবেরী গ্রামে তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। দু'স্থানেই দেবী মহিষ মর্দিনী এবং ভৈরব ক্রোধীশা নামে পূজিত হচ্ছেন। সুগন্ধায় পড়েছে দেবীর নাক। দেবীর নাম সুগন্ধা। ভৈরব — ত্রম্ব্যকেশ্বর। বরিশাল শহরের সামান্য দূরে সুনন্দা নদীর তীরে সুগন্ধা দেবীর মন্দির। বিগ্রহের উপরে চালার মধ্যে কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বিগ্রহ রয়েছে।

জ্বালামুখীতে পড়েছে দেবীর জিহ্বা। দেবীর নাম অম্বিকা, ভৈরব হলেন— উন্মত্ত। মন্দিরের নীলাভ অগ্নি শিখাকেই দেবীর রূপ কল্পনা করে ভক্তগণ পূজা দিয়ে থাকেন। জ্বালামুখী সতী পীঠ পাঠান কোটের কাছে অবস্থিত। মগধের বৈদ্যনাথ ধামে পড়েছে দেবীর হৃদয়। দেবীর নাম জয়দুর্গা। মহাদেব এর নাম বৈদ্যনাথ। প্রবাদ অনুসারে রাক্ষসরাজ রাবণ বৈদ্যনাথ মহাদেবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৈজু নামে এক ভক্ত রাবণের পর মহাদেব এর পূজো করেন। বৈজু থেকেই বৈদ্যনাথ হয়েছে এমনটা অনেকে মনে করেন।

উৎকলে পড়েছে দেবীর নাভি। দেবী সেখানে বিমলা এবং মহাদেব জগন্নাথ

রূপে পরিচিত। মগধের উত্তর অংশে গন্ডকী নদীর তীরে শিলারূপে পূজিতা হচ্ছেন দেবী গন্ডকী। প্রবাদ এখানে দেবীর গল দেশ পড়েছিল। সেখানে মহাদেব চক্রপাণী নামে পরিচিত। বর্দ্ধমান জেলার কাটুয়াতে দেবীর বাম বাহু পড়েছে। সেখানে দেবী বহুলা এবং মহাদেব- ভীরুক নামে পরিচিত।

উজ্জ্বয়নীতে পড়েছে দেবীর ডান কনুই। উজ্জয়নী শহরের রুদ্রসাগরের কাছে হরসিদ্ধিতে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। দেবী মঙ্গল চণ্ডিকা এবং মহাদেব কপিলেশ্বর নামে পরিচিত। প্রবাদ মহর্ষি কপিল এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চট্টল প্রদেশে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দেবীর ডান হাত পড়েছে। দেবীর নাম এখানে ভবানী। অগ্নি শিখাকে দেবী ভবানী রূপে পূজা করা হয়। এখানে মহাদেব হলেন চন্দ্রশেখর। মহারাজ ধন্যমাণিক্য এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তার বহু আগে সেখানে মন্দির ছিল। কালক্রমে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ধন্যমাণিক্য তা নূতন করে তৈরী করান।

আরাকানের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ে বর্তমান ত্রিপুরা সুন্দরী মগরাজার পুরোহিত দ্বারা পূজিতা হতেন। আরাকানের রাজার সঙ্গে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের যুদ্ধ শুরু হবার পর একদিন রাতে দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী ত্রিপুর সেনাপতি রাম কচাককে দেবীর পূজা করে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দেন। সেই মতো রায়কচাক্ দেবীর পূজো দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার পর সেই যুদ্ধে ত্রিপুর বাহিনী জয়ী হয়। আরাকানরাজ পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। দেবী মহারাজ ধন্যমাণিক্যকেও দেবীকে উদয়পুর এনে প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দেন। সেই মতো রায়কচাক্ দেবীকে হাতীর পীঠে চড়িয়ে রাজধানীতে নিয়ে আসার পর ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দিরেই ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবী খুব জাগ্রত। রাজধানীতে গেলে অবশ্যই দেবীকে দর্শন করে জীবন ধন্য করবে।

তিস্তানদীর তীরে শালবাড়ী গ্রামে পড়েছে দেবীর বাম পা। দেবীর নাম ভ্রামরী আর মহাদেব অম্বর নামে পরিচিত।

কামরুপ কামাখ্যায় পড়েছে দেবীর যোনী। ভৈরব সেখানে রামানন্দ। তিনি শিবানন্দ এবং উমানন্দ নামেও পরিচিত। দেবী সেখানে কামাখ্যা নামে পরিচিতা। কথিত আছে মদন ধ্যানস্ত শিবের ধ্যান ভঙ্গ করায় মদন তথা কামদেবকে মহাদেব ভস্ম করেছিলেন। নিজের রূপ ফিরে পাওয়ার জন্য কামদেব ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করে পুনরায় তার রূপ ফিরে পেয়েছিলেন। সে জন্যই এই স্থানের নাম কামরূপ। কামাখ্যা পর্বতকে নীল পর্বত নামেও অভিহিত করা হয়। প্রতিবছর দেবী আষাঢ় মাসে ঋতুবতী হন। তখন তিনদিন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে।

গৌড় দেশের ক্ষীর গ্রামে দেবীর ডান পায়ের আঙ্গুল পড়েছিলো। দেবী সেখানে

যোগাদ্যা নামে পরিচিত। ভৈরব ভূতধাত্রী। কথিত আছে ক্ষীর গ্রামের দেবী পাতালে রাবণ পুত্র মহিরাবণের পূজা গ্রহণ করতেন। রাবণ বধের খবর পেয়ে মহিরাবণ রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালে এনে দেবীর কাছে বলি দেওয়ার প্রস্তুতি নেন। হনুমান মহিরাবণকে বধ করে দেবীকে পাতাল থেকে এন ক্ষীর গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরে একদিন বৈশাখের সংক্রান্তিতে দীঘির জল থেকে তুলে এনে পূজা করা হয়। পুনরায় বিগ্রহ সেই দীঘিতে রেখে দেওয়া হয়। ভৈরবকে ক্ষীর খণ্ডকও বলা হয়। গৌড় প্রদেশের গঙ্গানদীর ধারে দেবীর ডান পায়ের চারটি আঙ্গুল পড়েছিল। দেবী এখানে কালী এবং মহাদেব নকুলেশ নামে পরিচিত।

মেঘালয়ের শৈল শহর শিলং এর জয়ন্তীয়া পাহাড়ের বাউরডাঙ্গা গ্রামে পড়েছে দেবীর বাম জঙ্ঘা। দেবীর নাম জয়ন্তী। দেবীর নাম অনুসারে পাহাড়ের নামও জয়ন্তীয়া পাহাড়। ভৈরব -জগদীশ্বর নামে পরিচিত।

কিরীট কোনা গ্রামে দেবী সতীর মাথার কিরীট পড়েছিল। সেজন্য গ্রামের নাম হয়েছে কিরীট কোনা সেখানে একটি কষ্ঠি পাথরকে দেবী এবং শিবরূপে পূজা করা হয়। দেবীর নাম বিমলা। ভৈরব হলেন — সম্বর্ত।

কুরুক্ষেত্রে পড়েছে দেবীর পায়ের গোড়ালী। সেখানে দেবী স্থানু বা সাবিত্রী মামে পরিচিতা। ভৈরব সেখানে অশ্বনাথ স্থানেশ্বর। এখানে ও একটি শিলা খণ্ডকেই পূজো করা হয়।

মণিবন্ধে পড়েছে দেবীর মণিবন্ধ। দেবী সেখানে গায়ত্রী এবং ভৈরব সর্বানন্দ নামে পরিচিত। পুস্কর হ্রদের কাছে এই সতী পীঠ অবস্থিত।

শ্রী শৈলে পড়েছে দেবীর গলদেশ। এখানেও দেবীর কোন বিগ্রহ নেই। একটি কালো পাথরই দেবীর প্রতীক হিসেবে পূজিতা হচ্ছেন। ভৈরব-সর্বানন্দ নামে পরিচিত। কথিত আছে সেই স্থানের মালিক দেবীর জন্য লক্ষ ইট দ্বারা মন্দির তৈরী করে দিতে চেয়েছিলেন। দেবী মন্দিরে থাকতে রাজী হলেন না। ভৈরব মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত। ইট দ্বারা চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চী দেশে পড়েছে দেবীর কঙ্কাল। দেবীর নাম দেবগর্ভা। ভৈরব হলেন — রুরু। দক্ষিণ ভারতের কাশী বলে পরিচিত কাঞ্চীপুরম। আদি শংকরাচার্য কাঞ্চীপুরমে তপস্যা দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করে সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি অষ্ট শিদ্ধি দেবী যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কাল মাধবে দেবীর বাম নিতম্ব পড়েছিল। দেবী সেখানে কালী। ভৈরব-অসিতাঙ্গ মুসলমানদের দ্বারা ঐ সতীপীঠ সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার পর এখনো সঠিক স্থান নির্ণয় করা যায় নি। গৌরী তন্ত্রের মতে এই সতীপীঠ উৎকলের কোন এক স্থানে অবস্থিত।

অমর কন্টক পর্বতে নর্মদা নদীর উৎস স্থলে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণ নিতম্ব। ভৈরবের নাম ভদ্রসেন। দেবী শোনাক্ষী। কষ্ঠিক পাথরের দেবী বিগ্রহ। এক হাতে

কমন্ডুল অন্য হাতে বরা ভয়। এখানে আচার্য গোবিন্দপাদ শিষ্য আদি শংকরকে অক্ষয় যশের অধিকারী হবার বরদান করেছিলেন। আচার্য শংকর দেবীর উদ্দেশ্যে যে স্তব রচনা করেছেন তা নর্মদাষ্টক নামে প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে দেবী নর্মদা হলেন মহাদেবের মানস কন্যা। দেবী অতি রূপবতী ছিলেন। তিনি সর্বদা ভেগবান বিষ্ণুর তপস্যায় রত। চির কুমারী প্রধান প্রধান দেবগণ দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে উদ্যোগী হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি চির কুমারী এবং বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণা মহা তপস্বিনী। ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান কপিল এবং ভগবান শংকর নর্মদা দেবীর কৃপাতেই সর্বসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং ভগবান পদবাচ্য হয়েছেন। মার্কন্ডেয় ঋষির আশ্রম ও তপস্যা স্থলও এই নর্মদা। ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ নর্মদার তীরে অবস্থিত। সেখানে তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মাহেশ্বর সর্বদা বিরাজিত রয়েছেন।

রাম গিরিতে পড়েছে দেবীর স্তন। শিব চরিতের মতে জলন্ধরে দেবীর বামস্তন এবং রামগিরিতে দেবীর ডান স্তন পড়েছে। রামগিরির অপর নাম চিত্রকুট পর্বত। দেবীর নাম শিবানী। ভৈরব চণ্ড।

বৃন্দাবনে পড়েছে দেবীর কেশ বা চুল পড়েছে, কেশ পড়ায় স্থানের নাম হয়েছে — কেশস্থলি। দেবী সেখানে উমা এবং ভৈরব ভুতেশ নামে প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনের কেশী ঘাটের কাছে সেই পীঠ অবস্থিত।

শ্রী পর্বতে দেবীর ডান গলদেশ পড়েছিল। দেবী সেখানে শ্রীসুন্দরী এবং ভৈরব সুন্দরী নন্দ নামে পরিচিত। এই সতীপীঠ বা স্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে শ্রী পর্বত হলো হিমালয়ের লাদাকে। কারো মতে দক্ষিণে শ্রী শৈলমে আবার গৌরীতন্ত্রের মতে উৎকলের ময়ুর ভঞ্জে।

শুচী নামক স্থানে দেবীর দাঁতের উপরের অংশ পড়েছিল। দেবী সেখানে নারায়ণী। ভৈরব সংহার নামে পরিচিত। এই স্থান নিয়েও মত পার্থক্য রয়েছে। কারো মতো ঐ পীঠ পশ্চিম ভারতের নল হ্রদের কাছে আবার কারো মতে বঙ্গ দেশের ঈশ্বরপুরের কাছে।

পঞ্চম সাগরে পড়েছে দেবীর দাঁতের নীচের পাটি। দেবীর নাম বারাহী। ভৈরব মহারুদ্র। এই পীঠস্থান নিয়েও মতভেদ আছে। কারো মতে এই পীঠস্থান রয়েছে উৎকলের ময়ুর ভঞ্জে। কারো মতে হরিদ্বারে। বঙ্গদেশের উত্তরে বগুড়া জেলার ভবানীপুর গ্রামে করতোয়া নদীর তীরে দেবীর তল্প পড়েছিল। দেবীর নাম অপর্ণা। ভৈরব-বামেশ। শিবের কর থেকে অর্থাৎ কৈলাশ পাহাড় থেকে উৎপন্না করতোয়া নদী ভারতের পবিত্র নদীগুলোর একটি। বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই তীর্থভূমি। দেবী কালীর স্বর্ণ প্রতিমা রয়েছে।

বিভাষকে পড়েছে দেবীর বাম স্কন্দ দেশ তমলুকের কাছে এই পীঠ অবস্থিত।

দেবীর নাম বর্গভীমা। ভৈরবের নাম সর্বানন্দ। কালা পাহাড় মায়ের মন্দির ধ্বংস করতে এসে মায়ের বেদীতে বিগ্রহের পরিবর্তে নিজের গর্ভধারিনী মৃতা মাকে দর্শন করে বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস না করে শ্রদ্ধা সহকারে দেবীকে প্রণাম করে স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

প্রভাস তীর্থে পড়েছে দেবীর উদর। ভারতের বিখ্যাত তীর্থসমুহের মধ্যে প্রভাস তীর্থ অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিবারবর্গের সঙ্গে মানব লীলার শেষ সময় এই তীর্থেই অবস্থান করেন। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি তমাল গাছের ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। মানবলীলা সম্বরনের কথা স্মরণ করছিলেন। এমন সময় জরা নানে এক ব্যাধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুমকুম বর্ণের পায়ের পাতাকে মায়ামোহে পাখী ভেবে তীর ছুড়েন। যন্ত্রণায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর্তনাদ করে উঠেন। ব্যাধ ছুটে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আহত অবস্থায় দেখে শোকে কাতর হয়ে আত্মহত্যার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ের পাতা থেকে তীরটি বের করে আত্মহত্যার উদ্যোগ নেওয়ার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে আত্মহত্যার পথ থেকে নিবৃত্ত করেন। তিনি এই ঘটনাকে দৈব নির্দেশিত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ঘটেছে এমনটা বলে ব্যাধকে পূর্ব জন্মের একটি কাহিনী শোনান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে বলেন — জরা, ত্রেতাতে রাবণ বধের জন্য আমি রাম অবতার রূপে মহারাজ দশরথের ঘরে জন্ম নিয়েছিলাম। তোমার বাবা বালী ছিলেন পরম শিব ভক্ত। অভিশপ্ত হয়ে বানররূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দৈবক্রমে একবার দুন্দভি নামক দৈত্য কিস্কিন্দা আক্রমণ করে। মহাবীর বালি, সুগ্রীব, জাম্বুবান, হনুমান প্রভৃতি বানব বীরগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। দুন্দভি পরাজিতহয়ে পালাতে শুরু করলে বানর বীরগণও তাকে ধাওয়া করেন। এক পর্বতের গুহায় সে ঢুকে পড়লে মহাবীর বালী সেই গুহায় গিয়ে দৈত্যকে বধ করার সংকল্প নেন। তিনি ছোট ভাই সুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণকে তিনি না ফেরা পর্যন্ত গুহার মুখে অপেক্ষা করতে বলেন।

মায়াবী দুন্দভি দৈত্য সেই গুহা পথে পাতালে প্রবেশ করে। বালীও মায়াবলে পাতালে প্রবেশ করেন। দুই বীরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। একমাস ভয়ংকর যুদ্ধের পর দুন্দুভি বালীর হাতে নিহত হন। তার রক্ত গুহাপথে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। রক্তধারা দেখে অপেক্ষমান বানব বীরগণ ধারণা করেন মায়াবী দৈত্যের হাতে বালী নিশ্চয়ই মারা গেছেন। দৈত্য এবার তাদের আক্রমণ করবে এমন আশংকা করে পাঁচ বানরবীর বহু কষ্টে এক বিশাল পাথর গুহার মুখে এনে চাপা দিয়ে গুহার পথ বন্ধ করে রাজ্যে ফিরে আসেন। রাজ্যে এসে বালীর যথাবিধি পারলৌকিক কাজ সমাধা করা হয় এবং মন্ত্রীদের পরামর্শে সুগ্রীব রাজ সিংহাসনে বসেন। প্রথামতো বৌদি তারাকে বিয়ে করেন।

প্রায় এক মাস চেষ্টার পর বালী সেই পাথর সরিয়ে গুহা থেকে বের হয়ে আসেন। বালী রাজ্যে ফিরে আসায় সকলেই হতবাক হন। সুগ্রীব ও অন্য বানর বীরেরা তাদের ভুল

বুঝতে পেরে বালীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বালী মায়ার বশে হিতাহীত জ্ঞান শূন্য হয়ে ভাই সুগ্রীবসহ পাঁচ বানর বীরকে রাজ্য থেকে বের করে দেন। পরবর্তী কালে দুই ভাই এর মধ্যে শত্রুতা বাড়তে থাকেএমন সময় সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হন। সীতার খোঁজে বের হয়ে আমার পরিচয় ঘটে সুগ্রীবের সঙ্গে। সুগ্রীব সীতার সন্ধান ও উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আমি বালীকে বধ করার অঙ্গিকার করি।

যুদ্ধের রিতি লঙ্ঘন করে আড়াল থেকে তীর বীদ্ধ করে তোমার বাবা বালীকে আমি বধ করেছিলাম। একবার দেবী গঙ্গা তোমার বাবার অন্যায় আচরণের জন্য তোমার বাবাকে বানরকুলে জন্ম নেবার অভিশাপ দেন। অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করায় দেবী গঙ্গা বলেছিলেন — ত্রেতায় ভগবান বিষ্ণু শ্রীরাম রূপে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি তোমায় অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন। দেবী গঙ্গার কথা রাখতে এবং তোমার বাবাকে শাপ মুক্ত করতে আমি ঐ কাজ করেছিলাম। তোমার বাবা বালী এখনো পরম সুখে বৈকুণ্ঠলোকে বাস করছেন।

অন্যায়ভাবে তোমার বাবাকে বধ করায় তোমার মনে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জেগেছিল। সেই ইচ্ছেকে দমিয়ে রেখে লংকা অভিযানে তুমি রাজধর্ম যথার্থরূপে পালন করেছিলে। সীতা উদ্ধার অভিযানে তুমি ছিলে সেনাপতি। তোমার কর্তব্য নিষ্ঠা আমায় মুগ্ধ করেছিলো। তাই তোমাকে গলারমালা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। হনুমানকে বলেছিলাম দ্বাপরে আমি তাকে হাঁতের বাঁশী বানাবো। আর সুগ্রীবকে মোহনচূড়া। রাজ্যভার গ্রহণের পর একদিন অঙ্গদকে বলেছিলাম দ্বাপরে তুমি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে। দ্বাপরে তুমি জরাব্যাধ নামে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি আমার ভক্ত। তাই তোমার মনের গুপ্ত বাসনা পুরণে সহায়তা করেছি। এতে তোমার বিন্দুমাত্র অপরাধ হয়নি। আমার ভক্ত সর্বদাই বৈকুণ্ঠবাসী হয়। মৃত্যুর পর তুমিও বৈকুণ্ঠে গিয়ে তোমার বাবার ও অন্যান্য বানববীর গণের সঙ্গে পরম সুখে বাস করবে। এখন তুমি আমার পরম সখা অর্জুনকে গিয়ে আমার শেষ কাজ সম্পন্ন করার কথা বলবে। বলবে শেষ সময়ে এটাই আমার একান্ত ইচ্ছে।

জরা ব্যাধের কাছে খবর পেয়ে অর্জুন মুহূর্তে সেই স্থানে ছুটে আসেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার লীলা সম্বরণের সময় উপস্থিত হয়েছে এ কথা জানালেন। শোক প্রকাশ না করে তিনি যেন অনতিবিলম্বে দ্বারকায় গিয়ে যদুবংশীয় নারী, শিশু ও কিশোর কিশোরীদের দ্বারকা থেকে মথুরা নিয়ে আসেন। কারণ তিন দিনের মাথায় সমুদ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করবে। জয়ন্ত, প্রভাস তীর্থের আরো এক পৌরাণিক কাহিনী তোমায় বলছি, শোন — প্রজাপতি দক্ষের ২৭জন কন্যাকে চন্দ্র বিয়ে করেছিলেন। সাতাশ জন কন্যার নামে সাতাশটি নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছে। ঐ সাতাশ কন্যা চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধিতে স্বামীকে সহায়তা করে থাকেন।

সাতাশ কন্যার মধ্যে চন্দ্র রোহিনীকে খুব বেশী ভালবাসতেন। এই নিয়ে বাকী ছাব্বিশ বোনের এবং চন্দ্র পত্নীদের ক্ষোভ ছিল। তারা স্বামীকে সকলের প্রতি সমান ব্যবহারের জন্য আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিশেষে পিতার স্মরণ নেন তারা।

পিতা দক্ষ প্রজাপতি জামাতা চন্দ্রকে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কিন্তু চন্দ্র কারো কথায় কান না দিয়ে রোহিনীর প্রতি অধিক ভালোবাসা এবং অন্যান্য পত্নীদের প্রতি উপেক্ষা দেখাতে থাকেন। কন্যাগণ তখন পিতার কাছে পুনরায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। প্রজাপতি দক্ষ জামাতা চন্দ্রকে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার অভিশাপ দেন।

চন্দ্র ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তার উপর ত্রিলোকের যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। তিন লোকেই অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ত্রিলোকবাসী এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে দক্ষের স্মরণ নেন। দক্ষ প্রভাস তীর্থে গিয়ে চন্দ্রকে ভগবান শংকরের আরাধনা করার পরামর্শ দেন। সে অনুসারে চন্দ্র প্রভাস তীর্থে গিয়ে ভগবান শংকরের তপস্যা শুরু করেন। ভগবান শংকর চন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হলেন। তিনি এমন বর দিলেন যাতে দক্ষের মর্যাদা নষ্ট না হয় এবং ত্রিলোকের কোন ক্ষতি না হয়।

শিবের বরে চন্দ্রের পনের দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। চন্দ্রের এই কাজে তার সাতাশ পত্নী সহায়তা করতে থাকেন। প্রভাসে অধিষ্ঠাত্রী দেবী চন্দ্রভাগা এবং ভৈরব. বক্রতুণ্ডকে কোটি প্রণাম। চন্দ্র যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শিবের আরাধনা করেছিলেন সেই শিবলিঙ্গই ভারত বিখ্যাত সোমনাথ। দেবীর উদর পড়েছিল এখানে।

অসুরেরা শিব ভক্ত ছিলেন। তাই কখনো তারা শিব ও শক্তি মন্দিরের ক্ষতি সাধন করেন নি। অসুর এবং রাক্ষসদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন মুণি-ঋষি, দেবগণ ও ভগবান বিষ্ণু।

সোমনাথ মন্দিরে যুগ যুগ ধরে দুর্লভ মণিমুক্তা জমা হয়েছিল। মুসলমান সুলতান মামুদ প্রথমবার সোমনাথ আক্রমণ করার পর সমস্ত হিন্দু রাজগণ মিলে সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। সুলতান মামুদ যুদ্ধে পরাজিত হলেন। জীবন ভিক্ষা চাইলেন। হিন্দুরাজগণ তার প্রতি দয়া দেখালেন। তাকে বিনা বাঁধায় চলে যাওয়ার সুযোগ দিলেন।

কয়েক যোজন দূরে গিয়ে সুলতান মামুদ বিশ্রামের উদ্যোগ নিলেন। এমন সময় এক সৈনিক গিয়ে সুলতান মামুদকে খবর দিলো যে হিন্দুরাজগণ আজ রাতে বিজয় দিবস পালন করবেন। দুর্গ অরক্ষিত থাকবে. রাজা ও সৈন্যরা বিজয় উল্লাসে মত্ত থাকবেন। পান ভোজনে কারোরই যুদ্ধ করার মতো অবস্থা থাকবে না। তিনি যদি ইচ্ছে করেন রাতে গিয়ে নগরী আক্রমণ করতে পারেন। সেই সৈনিক দুর্গে প্রবেশের গোপন রাস্তার সন্ধান দেবে।

এই অভাবনীয় সংবাদে সুলতান মামুদ খুব আনন্দিত হলেন। সেই সৈনিককে অত্যন্ত সমাদরে তাদের তাবুতে রাখলেন। রাতে আবার মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করলো। হিন্দু রাজাদের অনেকেই ঐ আক্রমণে নিহত হলেন। মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত কোন রাজাই বিশেষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলো না। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হলো। সোমনাথ লিঙ্গ ভেঙ্গে ফেলা হলো। দুর্লভ মণি মাণিক্য ভারতের বাইরে চলে গেলো। যাবার সময় সুলতান মামুদ সেই সৈনিককে বললেন যে সৈনিক আত্মীয়, পরিজন, বাদশা, সুলতান এবং দেশের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে তাকে মৃত্যুদণ্ডই পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই বলে তরবারী দ্বারা মামুদ নিজেই ঐ বিশ্বাস ঘাতকের শিরচ্ছেদ করেন।

উজ্জয়নী শহরের পূণ্যতোয়া নদী শিপ্রার কাছেই ভৈরব পর্বত। সেই পর্বতের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন পীঠ দেবী অবন্তিকা। ভৈরব সেখানে লম্ব কর্ণ নামে পরিচিত। সেখানে দেবীর উর্দ্ধ তথা উপরের উষ্ঠ পড়েছে। জনস্থানে পড়েছে দেবীর চিবুক। দেবীর নাম ভ্রামরী। আর ভৈরব হলেন — বিকৃতাক্ষ। গোদাবরী নদীর কাছে ঐ তীর্থস্থান অবস্থিত।

দক্ষিণের রাজমহেন্দ্রী জেলায় গোদাবরী তীরে দেবীর আর এক পীঠ কোটি লিঙ্গেশ্বর মন্দির। সেখানে পড়েছে দেবীর বাম কপাল। দেবীর নাম বিশ্বেশী বা বিশ্বমাতৃকা। ভৈরব সেখানে দণ্ডপাণি নামে পরিচিত।

রত্নাবলী নামক স্থানে পড়েছে দেবীর দক্ষিণ স্কন্দ বা পিঠদেশ। দেবীর নাম কুমারী বা সর্বানী এবং ভৈরব শিব নিমেশ। কারো মতো দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারীর সাধনাস্থলীতেই এই পীঠ অবস্থিত। ঐ শিবকে অনেকে মাদুরাই শিব বলেও অভিহিত করেন। কারো মতে বঙ্গদেশে রত্নাকর নদীর তীরে রত্নাবলীতে এই পীঠস্থান অবস্থিত।

মিথিলায় অর্থাৎ নেপালের তরাই অঞ্চলের জনকপুরে এক পীঠ অবস্থিত। সেখানে দেবীর বামস্কন্দ পড়েছে। দেবীর নাম উমা। ভৈরবের নাম মহোদর। বঙ্গদেশের নলহাটিতে পড়েছে দেবীর নালী। দেবীর নাম কালী। ভৈরব যোগেশ নামে পরিচিত। কারো মতে সেখানে পড়েছিল দেবীর ললাট। তাই দেবীর নাম ললাটেশ্বরী।

বঙ্গের বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরে পড়েছে দেবীর মন, কারো মতে দুই ভ্রুর মধ্যবর্তী স্থান। মন্দিরে রয়েছে অষ্ট ধাতুর মহিষ মর্দিনী। এখানে দেবী মহিষ মর্দিনী এবং ভৈবর বক্রনাথ রূপে পরিচিত। মহামুণি অষ্টাবক্র এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শিবের আরাধনা করে পূর্ব শরীর প্রাপ্ত হন।

— দাদু, ঋষির নাম অষ্টাবক্র হলো কেন ? তিনি কি অষ্টবক্র ছিলেন ?

— জন্ম সময়ে তেমনটা ছিলেন না। তিনি এবং মহর্ষি লোমশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুজনেই মহাতেজা, মহাতপস্বী। একদিন বিশ্ব পরিক্রমা করে দুই বন্ধু ইন্দ্রের

রাজসভায় গিয়ে হাজির হন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ তখন নাচ ও গান শুনছিলেন।

প্রথমে অষ্টাবক্র রাজসভায় এসে হাজির হন। দেবরাজ তখন অপসরার নাচে মুগ্ধ হয়ে নাচ দেখছিলেন। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই আসেন মহামুনি লোমশ। সেই মুনি সভায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেবরাজ সিংহাসন ত্যাগ করে লোমষ মুনিকে সমাদর করে এক দিব্য আসনে বসার স্থান করে দেন। তারপর অষ্টাবক্র ঋষিকেও যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে সিংহাসনে বসান।

অষ্টাবক্র ঋষি লোমশ ঋষির আগে এসেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাকে প্রথমে আসন দান না করায় অত্যন্ত ক্রোধিত হন। ক্রোধে মুণির সারা দেহ কাঁপতে থাকে। তিনি ক্রোধ ভরে দেবরাজ ইন্দ্রকে শ্রীহীন হবার অভিশাপ দেন। অভিশাপ দেওয়ার পর অষ্টবক্র ঋষির দেহও আট ভাগে বাঁকা হয়ে এক বিকৃত রূপ ধারণ করে। নিজের এই বক্র দেহের প্রতি তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়েন অষ্টাবক্র। তার চেতনা আসে। তিনি অন্যায় করেছেন বুঝতে পারেন। ইন্দ্র মুনিকে বলেন মুনিবর আপনি মহাদেব এর তপস্যা করুন। আপনি আপনার পূর্বরূপ ফিরে পাবেন। পতিত পাবনী গঙ্গার তীরে ঋষি লিঙ্গ স্থাপন করে মহাদেব এর তপস্যা শুরু করেন।

মুনির তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তার পূর্বরূপ ফিরিয়ে দেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবই বক্রনাথ বা বক্রেশ্বর নামে পরিচিত। দেবী গঙ্গা পরবর্তী কালে বহুদূরে চলে গেছে। পাহাড়ের উপর এখনো পতিত পাবনী গঙ্গার অস্তিত্ব আছে। এখানে রয়েছে কয়েকটি কৃষ্ণ উন্ড। গন্ধক মিশ্রিত জলে স্নার করে বহু লোক বহু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। জয় বাবা বক্রেশ্বর। দেবীর পাণিপদ্ম পড়েছে যশোরে। দেবী সেখানে যশোরেশ্বরী এবং মহাদেব সেখানে চন্ড নামে পরিচিত। আকবরের সেনাপতি মান সিং রাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে দেবীর বিগ্রহ রাজস্থানে নিয়ে গেছেন। বীর ভূমের কাছে অট্টহাস গ্রামে পড়েছে দেবীর ওষ্ঠ। সেখানে দেবী ফুল্লরা এবং ভৈরব বিশ্বেশর নামে পরিচিত।

বঙ্গদেশের হারপাতো নন্দিপুরে দেবীর হার পড়েছে। দেবীর নাম নন্দিনী। ভৈরব নন্দিকেশ্বর। লঙ্কায় পড়েছে দেবীর নূপুর। দেবীর নাম ইন্দ্রাক্ষী, আর ভৈরব হলেন রাক্ষসেশ্বর। দেবী, শ্রীলঙ্কা ছিল কুবেরের রাজধানী। রাবণ ব্রহ্মার কাছ থেকে ত্রিভুবন জয়ের বর লাভ করে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তার রাজত্ব এবং পুস্পকরথ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। রাবণ শিবভক্ত। মাতৃভক্ত। তাই রাবণ মহা ধূমধামের সঙ্গে রাক্ষসেশ্বর ও ইন্দ্রাক্ষীর পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিরাট রাজ্যে অর্থাৎ উৎকলের ময়ূর ভঞ্জের কাছে পাণ্ড সাগরের তীরে পড়েছে দেবীর বা পায়ের আঙ্গুল। দেবী সেখানে অম্বিকা এবং ভৈরব অমৃতাক্ষ নামে পরিচিত।

জয়ন্ত, নেপালের কাছে কপিলাবস্তু নামক রাজ্যে রাজা শুদ্ধোধনের ঘরে

আবির্ভূত হয়েছিলেন এক দিব্য বালক । বাবা -মা নাম রেখেছিলেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ সংসারে উদাসীন দেখে সুন্দরী যশোধরাকে পুত্রবঁধু করে ঘরে এনেছিলেন। রাহুল নামে ফুটফুটে এক পুত্রও জন্মেছিল। সংসারের আকর্ষণ, রাজ সিংহাসন, পুত্রের প্রেম কোন কিছুই সিদ্ধার্থকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তিনি এক গভীর রাতে সবকিছু ছেড়ে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধগয়ার কাছে এক বট গাছের নীচে বসে কঠোর তপস্যা করার সময় তিনি দিব্যরূপ দর্শন করেন। নিরাকার সাধনায় দিব্যরূপই হচ্ছে পরম ব্রহ্মের দিব্যরূপ। সেই দিব্যরূপ বা জ্যোতি সিদ্ধার্থের মন প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

মুহূর্তে তার জীবনের জিজ্ঞাসার সব উত্তর পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যার সাধনা তিনি করেছিলেন সেই পরমব্রহ্মের দিব্যজোতি তিনি দর্শন করেছেন। সমস্ত শাস্ত্র তার অধিগত হয়েছে। পরম জ্ঞান তথা তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। সেই জ্ঞান জনগণকে দান করতে বারজন একান্ত ভক্তকে নিয়ে তিনি সারা ভারত পরিক্রমা করেন। অহিংসার মন্ত্রে জনগণ, রাজা ও সামন্তগণ দীক্ষিত হতে থাকেন। পরবর্তী কালে রাজা বিম্ভিসার, অশোক, হর্ষবর্ধন, কনিষ্ক, দেবপাল প্রভৃতি রাজগণের আনুকূল্যে সমগ্র জম্মুদ্বীপে (এশিয়ায়) বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে।

বৌদ্ধরা প্রথমে নিরাকার উপাসনা শুরু করেন। ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সাকার উপাসকদের নিরাকারের সাধনায় নিয়ে আসা হয়। লক্ষ লক্ষ মন্দির বিগ্রহ শূন্য হয়ে পড়ে। বহু দিব্য বিগ্রহ লুকিয়ে ফেলা হয় এবং বহু বিগ্রহ ধ্বংস করে দেওয়া হয় । রাজা কনিষ্কের সময় থেকে শুরু হয় সাকার উপাসনা । বুদ্ধের মূর্ত্তি তৈরী শুরু হয় । মন্দিরেও আবার বিগ্রহ স্থান পেতে থাকে । আদি শংকরাচার্য সারা ভারত ঘুরে পুনরায় বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন । চারদিকে চারটি মঠ স্থাপন করে চার প্রধান শিষ্যকে মঠের আচার্য নিযুক্ত করেন। চার মঠের আচার্যগণ ক্রমে তাদের শংকরাচার্য নামে অভিহিত করেন । সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারা চার মঠের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন মঠের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে দশটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। শংকরাচার্য যে চারটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন সে চারটি মঠ হলো — বদ্রিকাশ্রমে জ্যোতি বা যোশী মঠ। সেই মঠের প্রথম আচার্য হলেন — নরটক বা ত্রোটকাচার্য । সেই মঠের ব্রহ্মচারীগণ আনন্দ নামে পরিচিত, আর যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে তিনটি উপাধী রয়েছে । গিরি, পর্বত এবং সাগর।

উৎকল প্রদেশের পুরীধামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোবর্ধন মঠ। এই মঠের প্রথম আচার্য হলেন শংকরাচার্যের সব থেকে প্রিয়তম শিষ্য — পদ্মপাদ । ব্রহ্মচারীগণের পদবী হলো প্রকাশ আর সন্ন্যাসীদের পরিচয় হলো — বন ও অরণ্য।

পশ্চিম ভারতের দ্বারকায় সারদা মঠ অবস্থিত। সারদা মঠের প্রথম অচার্য হলেন — হস্তামলক। সেই মঠের ব্রহ্মচারীগণকে স্বরূপ উপাধী দেওয়া হয় । আর সন্ন্যাসীদের

বলা হয় — তীর্থ ও আশ্রম। দক্ষিণে শৃঙ্গি পর্বতের পাদদেশে যে মঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে মঠের নাম হলো শৃঙ্গেরী মঠ। কিছু দূরে কাঞ্চীপুরমে ভগবান শংকর কিছুকাল বসবাস করেছিলেন ফলে সেখানেও একটি শংকর মঠ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণে দু'জন শংকরাচার্য আছেন। শৃঙ্গেরী মঠের প্রথম আচার্য হলেন— সুরেশ্বর। ব্রহ্মচারীদের বলা হয় চৈতন্য আর সন্ন্যাসীদের উপাধী হলো — পুরী, ভারতী এবং সরস্বতী। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে ঈশ্বর পুরী থেকে ব্রহ্মচৈর্য নিয়েছিলেন তিনি শৃঙ্গেরী মঠের আচার্যদের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। জয়ন্ত, আজকে পূজোর সময় হয়ে এলো। পরে তোমাকে ভারতের মুণি ঋষিগণ যোগশাস্ত্র সম্পর্কে যা লিখে গেছেন সে সম্পর্কে তোমাকে সাধারণ ধারণা দেবো। যোগ সাস্ত্রের প্রবক্তা হলেন ভগবান শিব। তার কাছ থেকে পাওয়া বিদ্যা মুনি ঋষিগণ জগৎবাসীর কল্যাণে জগৎবাসীকে দান করেছেন।

চারদিন উদয়পুর রাজপ্রাসাদে থেকে হাতীতে চড়ে সন্ধ্যায় ভক্তি কৈলাগড় ফিরে এসেছে। সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় জয়ন্ত ভক্তিকে দেখতে যায়নি। কিছু সময়ের জন্য উপনয়নের পর ভিক্ষা নিতে দেবীপুরে যাওয়া আসা করার সময় সে হাতীর পিঠে চড়ার সুযোগ পেয়েছে। হাতীতে চড়ে সুখ নেই। ঘোড়ায় চড়েও সুখ নেই। একমাত্র ভগবান প্রদত্ত পায়ে হেঁটেই চরম আনন্দ পাওয়া যায়। ভক্তি কিশোরী। উদয়পুর থেকে সারাদিন হাতীর পিঠে চড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভক্তি ক্লান্ত। পরদিন ভোরে ভক্তি অবশ্যই আসবে, তখন দেখা হবে। কথা হবে। মা ত্রিপুরেশ্বরী সম্পর্কে জেনে নেবে।

শরৎকাল, কিছু কিছু কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। মায়ের মন্দিরের সামান্য দূরে দুটো শেফালী ফুলের গাছ রয়েছে। রয়েছে চাঁপা এবং বকুল ফুলের গাছ। শেফালী ফুল শেষ হতে না হতেই বকুল আর চাঁপা ফুল ফুটতে শুরু করে। দুর্গের কিশোর কিশোরীরা খুব ভোরে বাঁশের তৈরী সাঁজিতে শেফালী ও বকুল কুড়িয়ে মায়ের পূজোয় উপহার দেয়।

জয়ন্ত ফুলের সাঁজি নিয়ে ফুল তুলতে যাওয়ার জন্য তৈরী হতেই জয়ন্তের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভক্তি সাঁজি হাতে এসে হাজির হলো। কল্যাণদের এর দুই ছেলে গোবিন্দ আর জগন্নাথ বাবার সঙ্গে দুর্গেই থাকে। ভক্তি যখন দীঘির পাড়ে সময় কাটায় তখন দু'ভাই সৈনিকদের সঙ্গে দেবীপুর পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে ঘোর দৌড়ে অংশ নেয়। শত্রুর মোকাবেলা করতে হলে অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘোড়ায় চড়ার দক্ষতা শিখে নিতে হয়। কল্যাণদেব সুদক্ষ সেনাপতি। তিনি সামরিক বিদ্যায় দু'ছেলেকে দক্ষ করে তোলার সব প্রয়াস চালু রেখেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত যাদব ও বলাই দাদুর কাছ থেকে সমর বিদ্যা শিক্ষা করছে।

চারদিন পর মন্দিরে ভক্তি আর জয়ন্তর দেখা হলো। চারদিনের জমে থাকা উচ্ছাস কেউ প্রকাশ করতে পারলো না। জয়ন্ত ভক্তিকে বললো— চারদিনে তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছো।

গঙ্গাধর বললেন— আসা যাওয়া এই দু'দিনের পথশ্রম; নূতন স্থান, নূতন পরিবেশ, খাওয়ায় অনিয়ম রোগাতো হবেই। ভক্তি, রাজধানী উদয়পুর আর মা ত্রিপুরেশ্বরীর লীলা স্থল তোমার ভালো লাগলো না কেন ?

— দাদু, আমার বড় মা যে এখানেই রয়েছেন। আমি যে দিন উদয়পুর গেলাম সেদিন রাতেই বড় মা আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন— তুই আমায় ফেলে উদয়পুর চলে গেলি! তোরজন্য আমার মন কেমন করছে। তুই ফিরে আয়। তোর বাবা যখন ত্রিপুরার রাজা হবেন তখন তোর বাবাকে বলবি উদয়পুর মায়ের মন্দিরের পাশে এমন বড় একটা দীঘি খনন করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি তো জল ছাড়া থাকতে পারিনা।

—ভক্তির কথা শুনে আনমনা হয়ে পড়েন গঙ্গাধর। ভক্তি যাকে বড় মা বলে সম্বোধন করেন, যার সঙ্গে একাকী গল্প করেন তবে কি তিনি গঙ্গা? হয়তো তাই হবে। জলইতো মা গঙ্গা। বললেন দিদি ভাই, তুমি সে কথা তোমার বাবাকে বলেছ ?

— বলেছি। বাবা আমায় আদর করে বলেছেন ঠিক্ আছে মা তোমার বড় মা'র আশীর্বাদে কোনদিন যদি আমি ত্রিপুরার রাজা হতে পারি তা হলে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির আমি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলবো। একটি বড় দীঘি খনন করিয়ে দেবো।

বাবার কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি মা যেন আমার বাবাকে ত্রিপুরার মহারাজ বানিয়ে দেন।

— তাই হবে দাদু ভাই। তোমার সঙ্গে আমিও মা কালীর কাছে তোমার বাবার জন্য রাজসিংহাসনের প্রার্থনা জানাচ্ছি। ফুল তোলার সময় হয়ে গেলো। এবার জয়ন্তকে ফুল তুলতে যেতে দাও। তুমি ফিরে এসেছ, শাস্ত্রের কিছু গোপন কথা বলবো। তোমাদের ঐ বিদ্যা খুব কাজে লাগবে। আজ শুধুমাত্র তোমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের গূঢ় অর্থ সংক্ষেপে প্রকাশ করবো। গুরু পরম্পরায় এই তত্ত্ব প্রকাশ করার কথা। উপযুক্ত শিষ্য আমি পাইনি। বয়েস হয়েছে। মৃত্যুর আগে বলে যেতে না পারলে মৃত্যুর পর আমার সদ্গতি হবে না। ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রথম বর্ণ হচ্ছে ত্রি। ত্রি শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে বুঝায়। এই তিন মহান দেবতার মিলিত শক্তি হচ্ছেন মহামায়া। তিনি ত্রিনয়না। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই তিনটি নয়ন অর্থাৎ তৃতীয় নেত্র হচ্ছে ক্রোধ তথা অগ্নি স্বরূপা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতীকও হচ্ছে দেবীর ত্রিনয়ণ। পূঃ হচ্ছে— তিনটি পুরের অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত এবং পাতালের প্রতীক। আবার এই পুর মনোময়, অন্নময় এবং প্রাণময় পুরীকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের দেহের তিনটি অবস্থা। অন্নময় দেহ, প্রাণময় দেহ এবং মনোময় দেহ এই তিন দেহকে তিন প্রকার মন্দির বলে অভিহিত করা হয়। এই তিন দেহের অধিকারিনী হলেন পরমা প্রকৃতি মহামায়া স্বরূপিনী, জগজ্জননী।

উঃ বুঝায় - উদ্ধার কারিনী। তিনি জীবকে অজ্ঞানতার অহঙ্কার থেকে উদ্ধার করে আলোকময় জগতে প্রতিষ্ঠা করেন। কুকর্ম থেকে বিরত রেখে ভগবত কর্মে নিয়োজিত

করার চেষ্টা করেন। 'ট বর্ণে আবার সৃষ্টি প্রক্রিয়াকেও সুচিত করে। দেবী সৃষ্টির প্রতীক। তাই নামের মাঝে রয়েছে। র +অঃ র শব্দে ব্রহ্মা। আর আ শব্দে জগজ্জননী। অর্থাৎ তিনি জগজ্জননী, দি্যানন্দময়ী, কল্যাণকারিনী। সু হলো - স+ উঃ শ শব্দে দুর্গতি হারিনী, সুখদায়ীনি। আর ও অর্থে রক্ষাকারিনী। নন্দ অর্থাৎ ন + দ = ন অর্থে নাদ ব্রহ্মা আর দ অর্থে- দয়া, দান, দমন। রী অর্থাৎ র +ঈ — র শব্দে ব্রহ্মা আর ঈ শব্দে যোগমায়া স্বরূপিনী। অর্থাৎ িনি ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্রী, পালন কর্ত্রী, মোক্ষ দায়িনী, তিন গুণের অধিকারিণী বিশ্বজননী। শিব কর্তৃক তিন পুরী ধ্বংসের যে বর্ণনা ব্যাসদেব দিয়েছেন তা তোমাদের জানাবো। এবার ফুল তুলে এসো। — জয়ন্ত মা কালী ও পন্ডিতকে প্রণাম করে ফুলের সাঁজি হাতে ফুল তুলতে চলে গেলো।

কল্যাণদেব ঠিক করেছেন ভক্তিকে আর যুদ্ধ বিদ্যা শেখানোর চেষ্টা করবেন না। কিশোরী ভক্তি পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে। তাকে তার মতোই চলতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কল্যাণদেব। যে অলৌকিকভাবে অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করতে এসেছে তাকে মানুষের তৈরী কৃত্রিম বেড়াজালে আর আটকে রাখবেন না।

কল্যাণদেব তার স্ত্রী লতিকাকেও তার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন । জোর করে ভক্তিকে যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর চেষ্টা করে ভক্তির মনের কোমল ভাবনা গুলোকে অযথা যন্ত্রনা দিচ্ছিলেন. লতিকা স্বামীর মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বললেন — ভক্তি আমাদের আনন্দের মাঝে থাকতে সহায়তা করছে । ভক্তি মায়ের সেবায় রত থাকুক ।

কল্যাণ দেব এর পরামর্শে লতিকা মেয়ে ভক্তিকে এখন আর দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করে না। ভক্তি দিনের অধিকাংশ সময় কালী মন্দিরের বারান্দায় বসে কাটিয়ে দেয়। কালীর ধ্যান করে।

সেদিন বিকেলে ভক্তি আর জয়ন্ত মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে বসেছে। জয়ন্ত আরতির জন্য জুমের তুলা দিয়ে সলতে বানাতে বসেছিল। ভক্তি এসে সেই কাজে যোগ দিলো। বললো দাদু, এসব কাজ মেয়েদেরই ভালো মানায়।

গঙ্গাধর বললেন — তুমি ঠিকই বলেছ। সেজন্যই মন্দিরে দেবদাসী প্রথা চালু হয়েছিল। বিগ্রহের সেবার কাজে পুরুষের পক্ষে তেমনা সম্ভব হয় না। সেজন্য ভগবান এবং আদ্যাশক্তি মহামায়া মহিলাদের জন্য সহজ পথ বলে দিয়েছেন। কোন মহিলা যদি পরিবারের সদস্যদের ভগবৎ জ্ঞানে সেবা করেন তাদের মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করার প্রয়োজন নেই। পুরুষ অহং বশতঃ কর্তৃত্ব করতে এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। আর মেয়েরা সমর্পণের মাধ্যমে সেবায় আত্মনিয়োগ করতে সচেষ্ট থাকেন। তাই ভগবান এবং পরমাশক্তি মহামায়া মহিলাদের ক্ষেত্রে পরিজনের সেবাকেই ভগবৎ সেবা হিসেবে গণ্য করেছেন।

একজন বিবাহিতা নারী স্বামীকে নারায়ণ অথবা শিবজ্ঞানে সেবা করবে। ছেলেকে সেবা করবে গোপাল তথা কৃষ্ণ জ্ঞানে। মেয়েকে সেবা করবে মাতৃশক্তি জ্ঞানে আর

গুরুজনদের শ্বশুরকে পিতা জ্ঞানে, শাশুড়িকে মাতৃজ্ঞানে। কর্তব্য পালনের জন্য অশ্রদ্ধা সহকারে যে সেবা তা কোন কাজে আসে না।

সলতে পাকাতে পাকাতে ভক্তি বললো — দাদু, তুমি বলেছিলে আমাদের মহাদেব কর্তক ত্রিপুর সংহারের কথা শুনাবে। আজ শুনাবে ?

—অবশ্যই সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। কাল তথা মৃত্যু কারো জন্য অপেক্ষা করে না। তাই ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সবকিছু ফেলে রাখা উচিত নয়। আজ আমি সুস্থ রয়েছি কাল সুস্থ নাও থাকতে পারি। মহামায়া সরস্বতীর কৃপায় আজ কথা বলতে পারি কাল সে ক্ষমতা নাও থাকতে পারে।

সুতরাং মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর বধের কাহিনী আজই তোমাদের শুনাবো। শোন— তারকাসুর নামে এক দৈত্য কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে অমর বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা অমর বর ছাড়া অন্য যে কোন বড় প্রার্থনা করতে বলেন। তারকাসুর তখন বহু ভাবনা চিন্তা করে বললেন — শিবের পুত্র ছাড়া অন্য কারো হাতেই যেন আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা তারকাসুরকে সে বর দান করে চলে গেলেন।

ক্রমে তারকাসুরের অত্যাচার বাড়তে থাকলো। দেবগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে খুব কষ্টে দিন যাপন করতে লাগলেন। তখন সমস্ত দেবগণ নারায়ণের পরামর্শ মতো শিবলোকে গিয়ে শিব পার্বতীর কাছে ব্রহ্মার বরের কথা শোনালেন। অনুরোধ করলেন উভয় দেবদেবী যেন ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। দু'জনেই দেবগণকে আশ্বস্থ করলেন। সুন্দর এক প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'জনে রতি ক্রিয়ায় মিলিত হলেন। দেবগণ যখন শিবলোক গিয়ে শিবের ও পার্বতীর কাছে তারকুসুরকে বধ করার জন্য এক পুত্র সৃষ্টির অবেদন জানালেন সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তিনি তপস্যা সেরে এসে শুনলেন দেবগণের অনুরোধে হর-পার্বতী এক মহাক্রমশালী পুত্র সৃষ্টি কামনায় রতিক্রিয়া শুরু করেছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন ঐ পরাক্রমশালী পুত্র তারকাসুরকে বধ করে স্বর্গলোকের রাজা হয়ে বসবেন। তারকাসুরের বধের অন্য উপায় বের করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখবেন। এখন প্রধান কাজ হলো হর- পার্বতীর রতিক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে পুত্র সৃষ্টির পরিকল্পনা নষ্ট করে দেওয়া।

ইন্দ্রত্ব হারানোর ভয়ে ভীত দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান দেবগণকে নিয়ে সভা করলেন। তারপর অগ্নি দেবকে আদেশ দিলেন কপোতের বেশ ধারণ করে যে বনে মহাদেব ও পার্বতী রতিক্রিয়ায় মগ্ন ছিলেন সেই বনে গিয়ে হর-পার্বতীর রতিক্রিয়া বন্ধ করার জন্য। অগ্নি পাশের গাছে বলে গান গাইতে লাগলেন। কপোত বেশী অগ্নির গান শুনে দেবী পার্বতী লজ্জা পেলেন। তিনি রতিক্রিয়া বন্ধ করে উঠে গেলেন। দেবী যে মুহূর্তে রতিক্রিয়া ছেড়ে উঠে গেলেন ঠিক সে মুহূর্তে বীর্যপাত হলো।

মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাকালেন, কপোতরূপী অগ্নির দিকে। কপোত ভয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই মহাদেব বললেন— হে অগ্নিদেব, তুমি ছলনা করে আমাদের রতিক্রিয়া বন্ধ করে ত্রিজগতের অকল্যাণ করেছ। মাটিতে পতিত বীর্য রক্ষার দায়িত্ব তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে, না হলে তোমাকে অভিশাপ দেবো।

অভিশাপের ভয়ে কপোত বেশী অগ্নি ঠোঁটে করে মহাদেবের বীর্য নিয়ে উড়ে পালালেন। গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় একটি বাজ পাখী কপোতের ঠোঁটে খাবার আছে ভেবে ছুটে এলো। কপোত ভয়ে সেই বীর্য গঙ্গায় ফেলে উড়ে পালালো।

মহাদেবের বীর্য কপোতবেশী অগ্নির ঠোঁট থেকে নদীতে পড়ে যাওয়ায় মহাদেব এর বীর্য রক্ষায় গঙ্গাদেবী স্বয়ং এগিয়ে এলেন । তিনি বীর্য ধারণ করলেন। কিছুকাল পর সেই বীর্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে দেবী গঙ্গা সেই বীর্য কোথায় রাখবেন তা ভাবতে লাগলেন।

গঙ্গাদেবী নদী তীরে কুশ তথা শরবন দেখতে পেলেন। মহাবীর গড়র নাগগণকে অমৃত দেওয়ার উদ্দেশ্যে অমৃত কুম্ভ এনে দেবগণের পরামর্শে কুশবনে রেখেছিলেন। সামান্য অমৃত কুশবনে পড়ে গিয়েছিল। অমৃত স্পর্শে কুশ পবিত্র হয়েছে। সে জন্য শ্রাদ্ধাদি কাজে কুশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মহাদেব এর বীর্য পবিত্র কুশবনে রাখাই ঠিক হবে। এই ভেবে গঙ্গাদেবী মহাদেব এর বীর্য কুশ বনে রেখে দিলেন।

অগ্নিদেব এর স্পর্শ এবং গঙ্গাদেবীর স্পর্শ পেয়ে সেই বীর্য থেকে জন্ম নিলেন অপূর্ব সুন্দর এক শিশু। শিশুর আকৃতি পেয়েই সেই শিশু অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করলেন। মহামায়া ছুটে এসে তার আঙ্গুলে মধু দিয়ে গেলেন। শিশু আঙ্গুল চুষে মধুর স্বাদ পেয়ে আরো বেশী ক্ষুধা অনুভব করলো। শিশু সজোরে চিৎকার করতে লাগলো। ঐ সময়ে সে পথ ধরে আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিলেন কৃত্তিকা ও তার পাঁচ বোন। তারা শিশুর কান্নায় কুশবনে নেমে এলেন।

ভক্তি, আমরা দেবগণকে শান্তির প্রতীক বলে মনে করি। দেবতাদের মনে যখন অহংকারের সৃষ্টি হয় তখন মহা অনর্থ ঘটে। সম্রাট হিরণ্যক শিপু ত্রিভুবন জয়ী ছিলেন । তার ঘরেই নাগবংশীয়া স্ত্রী পরম বিষ্ণুভক্ত কয়াদুর ঘরে ভগবান বিষ্ণুর অংশে জন্ম হয়েছিল পরম ভাগবত ভক্ত প্রহ্লাদ। প্রহলাদকে বিনাশ করার জন্য সম্রাট হিরণ্যকশিপু বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ভক্তের আহ্বানে হিরণ্যকশিপুর রাজসভায়স্থিত এক বিশাল স্ফটিক স্তম্ভের ভেতর থেকে নৃসিংহ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। দৈত্যকুলের সম্রাট হন ভক্ত প্রহলাদ। ভক্ত প্রহলাদকে ভগবান বিষ্ণু অক্ষয় কাল সময় পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ লোকে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু, ভক্ত প্রহলাদ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে বললেন— সমগ্র দৈত্য সমাজের মঙ্গলের জন্য তিনি দৈত্যদের সঙ্গেই থাকতে চান। দৈত্যগণের সার্থে তিনি মহৎ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পুত্র দানবীর বলির কথা তো সবাই জানে।

দানবীর বলির রাজত্বকালে ত্রিভুবন বলির অধিকারেই ছিল। ভগবান বিষ্ণু স্বর্গলোক দেবগণকে ফিরিয়ে দিতে বামনরূপ ধারণ করলেন। বামনরূপী নারায়ণ যখন বলি রাজের সভায় এসে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলেন তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ভগবান বিষ্ণুর ছলনার কথা বলিকে জানিয়ে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার জন্য বললেন। ত্রিলোক জয়ী বলি গুরুদেবকে জানালেন ভগবান বিষ্ণু যে বামন রূপ ধারণ করে এখানে এসেছেন তা তিনি জানেন। ভগবান বিষ্ণু আমার কাছে দান প্রার্থী। এমন পরম সৌভাগ্য ক'জনের ভাগ্যে আসে। আমি তাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করবো। ভগবান যে বামন কলেবর নিয়ে এসেছেন সে ক্ষুদ্র পা দ্বারা তিনি কতটুকু ভূমি গ্রহণ করতে পারবেন ?

শুক্রাচার্য বললেন— সম্রাট বলি, তুমি বিষ্ণুর মায়া বুঝতে পারছো না। যুগে যুগেই বিষ্ণু মায়া বলে অসুরদের ঠকিয়েছেন। সম্রাট বলি গুরুর কথা শুনলেন না। ত্রিপাদ ভূমি দান করার জন্য কমন্ডলু থেকে যখন হাতে জল নিতে গেলেন তখন শুক্রাচার্য পোকার রূপ ধারণ করে কমন্ডলুর মুখে গিয়ে বসে রইলেন। জল পড়ছে না দেখে ভগবান বলিকে বললেন— রাজন মনে হয় কমন্ডলুর নলে কোন পোকা বসে রয়েছে। আপনি কুশ দ্বারা নলটি পরিষ্কার করে নিন। বলি তাই করলেন। কুশের আঘাত লাগলো শুক্রাচার্যের চোখে। তিনি চিরকালের জন্য একটি চোখ হারালেন।

শুক্রাচার্য ভগবান বিষ্ণুর উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে বললেন — হে নারায়ণ, তুমি সত্ব গুণের আঁধার হয়েও কপটতা করে বলির হাত থেকে স্বর্গ ছিনিয়ে নিয়েছ। আমি একটা চোখ হারিয়েছি। কলিতে তোমার নাম নিয়ে এভাবেই তোমার ভক্তদের ঠকানো হবে।

বামন রূপী নারায়ণ একপাদে স্বর্গলোক, একপাদে মর্তলোক ধারণ করে তৃতীয় পদ বের করলেন নাভি থেকে। তারপর বলিকে তৃতীয় পাদ কোথায় রাখবেন তা জানতে চাইলেন। ভক্ত বলি নিজের মাথায় তৃতীয় পাদ রাখার কথা বললেন। ভগবান বিষ্ণু বললেন— সম্রাট বলি, তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি পাতালে গিয়ে সুখে রাজত্ব করো। স্বর্গলোক ভিন্ন যে কোন বর প্রার্থনা করো।

বলি বললেন— প্রভু, পাতালে গিয়ে আপনার বিরহে এক পলও আমি থাকতে পারবো না। আপনি যদি সত্যিই আমার প্রতি দয়ালু হয়ে থাকেন তা হলে পাতালে আমার প্রাসাদে থেকে সর্বদা আমার পূজো গ্রহণ করুন।

ভক্ত বৎসল ভগবান বিষ্ণু বললেন — তাই হবে । তোমার ছেলে মর্তলোকে সুখে রাজত্ব করুক।

বলির পুত্র বিরোচন দেবরাজকে মিত্ররূপে গ্রহণ করে দেবগণের সঙ্গে সদ্‌ভাব বজায় রেখে রাজত্ব করতে লাগলেন। মৈত্রীর বন্ধন সরূপ দৈত্য কন্যাগণ দৈত্যগণের সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের হাতেও রাখি পরিয়ে দিলেন।

কিছুকাল সুখে রাজত্ব করার পর ইন্দ্রের মনে অহংকার দেখা দিলো। তার মনে দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হলো। ভাবলেন দৈত্যগণকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। মর্তলোকে বীরোচন নিজের প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ। যে কোন সময়ে তার মনে স্বর্গলোক আক্রমণ করার পরিকল্পনা জাগতে পারে। তাকে বধ করা দরকার। এই ভাবনা অসার পর একদিন ইন্দ্র বীরোচনকে একা পেয়ে বধ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বিশ্বাস ঘাতকতায় দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ হলো। তারকাসুর নামক এক অসুর দেবগণকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

তারকাসুরকে বর দিতে চাইলে তারকাসুর অমর বর প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা অমর বর ভিন্ন অন্য যে কোন বর প্রার্থনা করতে বললেন। তারকাসুর তখন মনে মনে চিন্তা করলেন মহাদেব পরম যোগী। পরম ভোলানাথ। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এই ধ্যান ভাঙ্গতে দিব্য হাজার বছর চলে যাবে। ব্রহ্মাকে বললেন — প্রভু আমায় এই বর দিন যেন আমার মতো ছয় মাথা সম্পন্ন মহাদেব এর কোন পুত্রের হাতে আমার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মা সেই বর দিলেন। তারকাসুর ছয় মাথা বিশিষ্ট ছিলেন। অমর না হয়েও অমরত্ব লাভ করেছেন তেমন গর্ব নিয়ে দৈত্যগণকে একত্রিত করে যুদ্ধে দেবরাজকে পরাজিত করে স্বর্গলোক অধিকার করলেন। দেবরাজ হয়েও অহংকাররূপী অসুরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দেবরাজ বারবার স্বর্গলোক হারিয়ে বহু দুঃখ ভোগ করেছেন। অহংকার, লোভ, ক্রোধ মানুষের বড় শত্রু। পূর্বে তারকাসুরের কথা তোমাদের একটু বলেছিলাম।

তারকাসুরের অত্যাচারে ত্রিলোকবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। দেবগণের অনুরোধে তিনি তপস্যা ভঙ্গ করে সন্তান উৎপাদনে রাজী হলেন। দৈব মায়ায় ইন্দ্র ব্যাঘাত ঘটালেন। দেবী পার্বতী গর্ভ ধারণের সুযোগ হারালেন।

শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কৃত্তিকা এবং তার পাঁচ বোন তাদের ঘরে ফিরে এলেন। শিশু যখন বড় হলো একদিন দেবর্ষি নারদ কৈলাশে গিয়ে শিব-পার্বতীকে প্রণাম করে বললেন— প্রভু, কৃত্তিকার ঘরে আপনার ছেলেকে দেখে এলাম। কার পুত্র কে পুত্র সুখ ভোগ করে। আপনার বীর্য থেকে উৎপন্ন পুত্র পালিত হচ্ছেন অপসরাদের ঘরে। প্রভুর এবং দেবী ভগবতীর এ এক অদ্ভুত লীলা।

মহাদেব এর বীর্য থেকে পুত্রের জন্ম হয়েছে শুনে শিব-পার্বতী দু'জনেই অবাক হলেন। তখন দেবী পার্বতীর সব ঘটনা মনে পড়ে গেলো। শিবকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষনাৎ কৃত্তিকার ঘরে গেলেন। কৃত্তিকা এবং তার পাঁচ ভগিনী মহাদেব এর পুত্রকে এতদিন লালন পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন এই ভেবে তাদের শরীর এবং মন বার বার পুলকিত হতে থাকলো।

কৃত্তিকা কর্তৃক পালিত হয়েছিলেন বলে সেই শিশুর এক নাম হলো কার্তিক। আর এই নামেই তিনি ত্রিলোক প্রসিদ্ধ। কুশবনে কৃত্তিকা ও পাঁচ বোনের মনোবাসনা পূর্ণ করতে

তিনি ছয় মাথা বিশিষ্ট হয়ে একই সময়ে ছয় বোনের স্তন পান করেছিলেন। ছয় মুখ বিশিষ্ট হওয়ায় তার আর এক নাম ষড়ানন ।তিনি ময়ূরকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন সে জন্য তার আর এক নাম ময়ূর বাহন। তিনি পরবর্তী সময়ে তারকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রার সময়ে দেবগণ তাকে দেবতাদের সেনাপতি পদে বরণ করেছিলেন ।সেজন্য তাঁর আর এক নাে দেব সেনাপতি ।

কার্তিক তারকাসুরকে বধ করে ইন্দ্রকে স্বর্গ রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। ত্রিলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলো। ভক্তি, পৃথিবীতেই শুধু নয় ত্রিলোকেই শান্তি দেবী অতি চঞ্চল হয়ে বিরাজমান থাকেন । দেবী লক্ষ্মীরই এক নাম শান্তি । পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তারকাসুরের তিন পুত্র দুন্মালী, তারকাক্ষ এবং কমলাক্ষ ব্রহ্মার তপস্যা করতে লাগলেন। তারাও ব্রহ্মার কা ছ থেকে অমর বর প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে এক অদ্ভুত বর চেয়েনিলেন। তিন ভাই ত্রিভুবন জয়ের পাশাপাশি তিনটি অদ্ভুত নগরী তৈরীর বর চাইলেন। যে নগরী বিমানের মতোই গতিশীল হবে । যে বীর ঐ তিন অদ্ভুত নগরী এবং তিন ভাইকে একই সঙ্গে একটি মাত্র অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করতে পারবে সেই অস্ত্র দ্বারাই তাদের মৃত্যু হবে।

ভগবান ব্রহ্মার কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়ে তিন ভাই সৈন্য সংগ্রহ করে ক্রমে তিন লোক জয় করলেন। দেবগণ আবার স্বর্গ থেকে বিতারিত হলেন। ত্রিলোকবাসী তিন ভাই এর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিলেন। ভগবান বিষ্ণু দেবগণেক মহাদেব এর শরণ নিতে বললেন, মহাদেব রাজী হলেন ।

তিন ভাই তিন লোকে তিনটি অদ্ভুত নগরীতে বসবাস করতেন। তিন লোক শাসন করতেন। মহাদেব স্বর্গলোকে স্বর্ণপুরীতে অবস্থানরত দুন্মালীকে আগ্রমণ করলেন। জেষ্ঠ ভ্রাতা আক্রান্ত হয়েছেন শুনে অন্য দুই লোকে দুই নগরীতে বসবাসকারী তারকাক্ষ এবং কমলাক্ষ জেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। দীর্ঘ সময় ঘোরতর যুদ্ধ হলো। দৈত্যগণ হীনবল হয়ে পড়লো। ভগবান শিব ত্রিশূল দ্বারা তিন ভাই এবং তিনটি পুরী ধ্বংস করে দিলেন। এই হচ্ছে শিবপুরাণে মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর বধের কাহিনী। ত্রিপুর বধের পর ত্রিলোচন রাজা হয়েছিলেন। সে রকম কাহিনী ব্যাসদেব কোথাও লিখেন নি। বংশ পরম্পরায় চলে আসা সেই কিংবদন্তীও অবশ্যই সত্য বলে ত্রিপুরাবাসী মনে করেন।

মহারাজ ত্রিলোচনের একাধিক রাণী ছিলো। প্রথমা রাণী ছিলেন হেরম্ব রাজ্যের রাজকন্যা । হেরম্বরাজ অপুত্রক ছিলেন। হেরম্বরাজ ত্রিলোচনকে বলেছিলেন — তার মেয়ের গর্ভে যদি পুত্র সন্তান আসে মহারাজ যেন সেই পুত্রকে হেরম্ব রাজের হাতে তুলে দেন। রাজা ত্রিলোচন রাজী হলেন । মহারাজ ত্রিলোচনের চার পুত্রের জন্ম হলো। বড়রাণীর গর্ভজাত পুত্র দৃক্‌পতিকে হেরম্ব রাজের হাতে তুলে দিলেন। হেরম্বরাজ মহারাজ ঘটোৎকচের বংশধর। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের বংশধর। অর্থাৎ হেরম্বরাজও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। মহারাজ ত্রিলোচন দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণকে ত্রিপুরার সিংহাসন দান করেন।

দুই ভাই এর মধ্যে পরবর্ত্তীকালে মনোমালিন্য দেখা দেয়। যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে ত্রিপুররাজ দাক্ষিণ পরাজিক হন। ভবিষ্যতে যাতে আর যুদ্ধ না বাঁধে সেজন্য দাক্ষিণ ত্রিপুরার রাজধানী আরো অনেক দক্ষিণে খলংমাতে সরিয়ে আনেন। খলংমাতে থাকাকালীন ত্রিপুররাজ এক বিশাল বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। ষোলজন বিখ্যাত পন্ডিত সেই যজ্ঞ পরিচালনা করেছিলেন। সেই ষোলজন ব্রাহ্মণকে মহারাজ এক দ্রোণ তথা ষোলকানি করে নিস্কর ভূমি দান করেন। রাজমালায় কালীপ্রসন্ন সেন কিংবা অপর রাজমালাকার কৈলাশ চন্দ্র সিংহ লিখেছেন বড়বক্র নদীর সঙ্গম স্থলে দৈত্যপুত্র ত্রিপুর রাজত্ব করতেন। তার নাম অনুসারে রাজ্যের নামও রাখেন ত্রিপুর। তার অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ট হয়ে পরলে মহাদেব ত্রিপুরকে বধ করেন। মহাদেব এর বরে বিধবা পত্নী হীরাবতী রাণীর গর্ভে ত্রিলোচনের জন্ম হয়। মহারাজ ত্রিলোচনের দেওয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণের পাঁচ দ্রোণ জমি নিয়ে গড়ে উঠে পাঁচ দ্রোণী গ্রাম। ঐ গ্রাম এখনো বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবেই পরিচিত।

মহারাজ প্রতীত খলংমা থেকে রাজধানী ধর্মনগরে সরিয়ে আনেন। রাজা ছেঙথুঙফা'র শাসনকালে গৌড়ের সুলতান হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। ছেঙথুঙফা সুলতানের বিশাল বাহিনী দেখে ভয়ে সন্ধির জন্য প্রস্তুত হন। মহারাজের কাপুরুষতা দেখে রাণী অত্যন্ত ক্রুব্ধ হন। তিনি ছিলেন বীরাঙ্গণা। নিজে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে হৈতন খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং জয় লাভ করেন। হৈতন খাঁ এই বীরাঙ্গণার ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন।

ভীরু রাজা ছেঙথুংফা ধর্মনগরে রাজধানী রাখা নিরাপদ নয় মনে করে রাজধানী আরো দক্ষিণে থানাংচিতে নিয়ে আসেন। থানাংচি থেকে পরবর্তীকালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ছাম্বুলনগরে। পরে রাঙ্গামাটি তথা বর্তমান উদয়পুরে।

আরাকান রাজ যখন উদয়পুর আক্রমণ করেন তখন রাজা ছিলেন অমর মাণিক্য। দুর্ভাগ্য তাড়া না করলে অমর মাণিক্য পরাজিত হতেন না। বলা চলে আরাকান রাজার কৌশলের কাছে মহারাজ অমর মাণিক্যের পরাজয় ঘটেছে।

মহারাজ অমর মাণিক্য রাজবাড়ীর ধনরত্ন এক গোপন স্থানে রেখে দিয়ে পরিবার পরিজন সহ উত্তর দিকে পালিয়ে গিয়ে মনুনদীর তীরে ছন বাঁশ দিয়ে তৈরী অস্থায়ী রাজবাড়ী তৈরী করে বসবাস করতে থাকেন।

মহারাজের শ্যালক ছত্রজিৎ নাজির ছিলেন সুদক্ষ সেনানায়ক এবং একান্ত রাজ ভক্ত। কয়েকজন সেনাপতি ছত্রজিৎ নাজিরের প্রভাব খর্ব করতে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। দুর্ভাগ্য মহারাজকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের কথায় বিশ্বাস করে ছত্রজিৎ নাজিরকে প্রাণদণ্ড দেন। পরে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। অনুশোচনায় মহারাজ অমর মাণিক্য আত্মহত্যা করেন। রাজধর পরবর্তীকালে রাজা হন। বর্তমানে তাঁর

পুত্র যশোধর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে বসেন। সংক্ষেপে তোমাদের ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস শোনালাম। দেশের ইতিহাস প্রত্যেক নাগরিকেরই জেনে রাখা ভালো। মহারাজ অমর মাণিক্যের সময়ে এসেছি। এখনো জীবিত আছি। তিন পুরুষের ইতিহাস জানা কম কথা নয়।

গঙ্গাধর পণ্ডিত কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কল্যাণদেবকে বললেন — কল্যাণ, ভক্তি তুমি এবং আমাদের এই নবীণ ব্রাহ্মণ জয়ন্ত ত্রিপুরাবাসীকে নূতন পথের সন্ধ্যান দিতে পারো, আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি কল্যাণ ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেছে। তোমরা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের আশ্রমে বসে ত্রিপুরার জ্ঞান পিপাসু মানুষদের আমাদের পূর্ব পুরুষগণ, মুনি-ঋষিগণ এবং দেব দেবীগণ জীবের কল্যাণে যে সকল উপদেশ রেখে গেছেন তা বিতরণ করার প্রয়াস নেবে।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে মনঃসংযোগ তথা মানসিক একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজন। মন যতক্ষণ স্থির না হয় ততক্ষণ কোন কাজেই সাফল্য আসে না। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য সাধনার একান্ত প্রয়োজন। আর এর জন্য উত্তম পথ হলো যোগ সাধনা, যোগ সাধনা করতে হলে নির্জনতা একান্ত প্রয়োজন। তারজন্য বনে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আলাদা ঘরে নির্দিষ্ট সময় যোগ সাধনা করলে মন স্থির হবে আর তখন সাধন ভজন করা সহজ হবে।

আমাদের দেহে যে ছয়টি চক্র এবং কোন কোন তন্ত্র শাস্ত্র মতে নয়টি চক্র রয়েছে তা তোমাদের সংক্ষেপে বলেছিলাম। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে ? জয়ন্ত বললো — দাদু, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে যোগের আবশ্যকতা রয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছি। আমাদের বয়স কম স্মরণ শক্তি কম। জ্ঞান কম। তাই যোগ শাস্ত্র এবং ষট্ চক্র সম্পর্কে আমাদের আর একবার বুঝিয়ে বললে আমাদের উপকার হবে।

—সংক্ষেপে ষট্ চক্রের কথা আবার তোমাদের শোনাচ্ছি। কোন কোন ঋষি আমাদের দেহে ছোট বড় মিলিয়ে তিন লক্ষ ষাট হাজার নাড়ির কথা বলেছেন, শিব সংহিতা, ঘেরন্ড সংহিতা এবং ব্রহ্ম সংহিতায় যোগশাস্ত্র সম্পর্কে যে কথোপকথন হর-পার্বতী, শিব-নারদ, নারদ-পরাশর প্রভৃতির মধ্যে হয়েছে যাদের প্রসাদে যোগশাস্ত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে তাদের প্রতি কোটি প্রণাম জানিয়ে যোগশাস্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করবো। প্রতিদিন ভোরে ফুল তোলার আগে হাতমুখ ধোয়ে আমার কাছে চলে এসো। বাস্তবে কেমন করে পুরক, কুম্ভক এবং রেচক করতে হয় তা তোমাদের শিখিয়ে দেবো। এই গুরুমুখী বিদ্যা গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা না করলে লোকমুখে শুনে শিক্ষা করতে গেলে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলতে পারে। আজ মোটামুটি শুনে রাখো পরে একটা শুভদিন দেখে জপ,ধ্যান, আসন, প্রাণায়াম সব বাস্তবে শিখিয়ে দেবো। তারজন্য প্রয়োজন শক্তির কৃপা। সে কারণে শক্তি মন্ত্র -ওঁ, ক্রীং মা কালী তোমাদের দান করছি। এই শক্তি মন্ত্র

জপে তোমাদের প্রতি দেবী কালী প্রসন্না হবেন এবং তোমাদের অষ্ট সিদ্ধি প্রদান করবেন।

মানুষের জীবনে প্রিয়, অপ্রিয় এবং উদাসীন এই তিন প্রকার ভাব বা অবস্থা দেখা যায়। যে বস্তু সুখপ্রদ তাই প্রিয়। যে বস্তু দুঃখ কর তাই অপ্রিয়। আর যে বস্তু সুখকরও নয়, দুঃখকরও নয় তাই উদাসী ভাব বলে অভিহিত করা যায়।

আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি। ব্রহ্মবাদীদের মতে একমাত্র ব্রহ্ম ও জীব আলাদা সত্ত্বা তাই জগৎ মিথ্যে হতে পারে না। এ বিষয়ে ভগবান শংকরের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের মত পার্থক্য থাকলেও শংকরের সঙ্গে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কোন পার্থক্য নেই। ভগবান শংকর বলেছেন—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। আর সব ব্রহ্মের মায়া বা মিথ্যার প্রকাশ। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে চৈতন্য চরিত্রামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন— যত্রযত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফোরে। এর অর্থ হলো সমস্ত জগৎই কৃষ্ণ ময়। সে ভাব অতি উচ্চভাব। পরমভাব। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সে দিব্যভাবের কথা স্মরণ করতে পারি। কোন মন্তব্য করতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দিব্য ভাব আমাদের মধ্যে জাগ্রত না হয়।

শব্দ আকাশের লক্ষণ। স্পর্শ বাতাসের লক্ষণ। রূপ তেজের লক্ষণ। জল রসের লক্ষণ এবং গন্ধ পৃথিবী বা ক্ষিতির লক্ষণ। শব্দের একটি মাত্র গুণ। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ দুটো গুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ তেজ এর তিনটি গুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস জলের চারটি গুণ। আর রূপ, রস শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ ক্ষিতি বা পৃথিবীর পাঁচটি গুণ। চক্ষুদ্বারা রূপ গ্রহণ, নাক দ্বারা গন্ধ গ্রহণ। রসনা বা জিহ্বা দ্বারা রস গ্রহণ। ত্বক দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় বা কান দ্বারা শব্দ গ্রহণ করা হয়।

পিতার বীর্য থেকে মাতৃ গর্ভে থেকে মায়ের রক্ত, মেদ শোষণ করে পঞ্চ ভূতের যে দেহ গঠিত হয় তা অনেক সময় ক্লেশকর বলে বোধ হয়। বিন্দু শিব স্বরূপ এবং শক্তি স্বরূপ। এ দুই এর মিলনেই আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী নিজ শক্তি দ্বারা বহুভাবে প্রকাশমান হন। দেহের তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ীর মধ্যে চৌদ্দটি নাড়ী প্রধান। এই চৌদ্দটি নাড়ী হলো —সুষুম্না, ইরা, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহু, সরস্বতী, পুষা, শঙ্খীনি, পয়স্বিনী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী। ঐ চৌদ্দ নাড়ীর মধ্যে তিন প্রধান নাড়ী হলো — ইরা, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই তিন নাড়ীকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলেও ঋষিগণ অভিহিত করেছেন। তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ীর উৎপত্তিস্থল হলো সুষুম্না নাড়ী। সে জন্য এই নাড়ী বা নদী সর্বোৎকৃষ্ঠা।

চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি স্বরূপা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে অধোমুখী হয়ে আছে। সাধন ভজনের জন্য চিত্রা নারীর গুরুত্ব অনেক। এই চিত্রা নাড়ীর ভেতর সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম ব্রহ্ম-বিবর বা নালী রয়েছে। এই পথকে দিব্যপথ বলা হয়। যোগীগণ চিত্রা নাড়ীর ধ্যান করা মাত্র চিত্তশুদ্ধ হয়ে থাকেন।

গুহ্যদ্বার থেকে দু-আঙ্গুল উপর চার আঙ্গুল পরিমিত স্থান নিয়ে রয়েছে মুলাধার চক্র বা মুলাধার পদ্ম। সেখানে পরমাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী আরাই প্যাচ হয়ে সেই ব্রহ্ম বিবররোধ করে শুয়ে রয়েছেন। কুল কুণ্ডলিনী থেকেই বাক্যের তথা শব্দের উদ্ভব হয়। সেজন্য এই কুলকুন্ডলিনীকে বাক্‌দেবী বলেও অভিহিত করা হয়। কুল কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে না পারলে জীবন বৃথা।

উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে দশটি বায়ু প্রধান। পাঁচটি অতি প্রধান। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি বায়ুকে অতিপ্রধান বলা হয়। আর বাকী পাঁচটি প্রধান বায়ু হলো — নাগ, কুর্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

প্রাণ বায়ুর অবস্থান হৃদয়ে। গুহ্য দেশে অপান, নাভি মন্ডলে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্বদেহে ব্যান বায়ু অবস্থিত। নাগ বায়ুর কর্ম উদ্‌গার, কুর্মবায়ুর কাজ উন্মীলন অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের সংকোচ ও প্রসারণ। কুকর বায়ুর কাজ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জাগানো দেবদত্তের কাজ জৃম্ভন ধনঞ্জয়ের কাজ হলো — হিক্‌কার সৃষ্টি।

শিব পার্বতীকে বললেন— মা, বাবা, জেষ্ঠভ্রাতা ও ভগিনী এবং মা ও বাবার সদৃশ্য ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। অন্যথায় যাচাই করে গুরু করণ করা উচিত। না হলে ফল পাওয়া যাবে না।

গুরু যদি কৃপা করেন, তাহলে মুহূর্তে সিদ্ধিলাভ হতে পারে। গুরু সেবা তাই শ্রেষ্ঠ সেবা। গুরুর মধ্যেও আবার ভাগ রয়েছে। গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু এবং পরমেষ্ঠি গুরু। ভগবান লাভ করতে হলে ছয়টি গুণ থাকতে হয়। প্রথম বিশ্বাস, দ্বিতীয় শ্রদ্ধা, তৃতীয় গুরুপূজা, চতুর্থ - সমভাব। পঞ্চম— জিতেন্দ্রিয়তা এবং ষষ্ঠ পরিমিত ভোজন।

দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে হলে আসন ও প্রাণায়াম একান্ত দরকার। যোগীরাজ শিব চৌষট্টি প্রকার আসনের কথা মহাদেবী পার্বতীকে শুনিয়েছেন। মানুষের জন্য তিনি বত্রিশটি আসনের কথাই বলেছেন। এই বত্রিশ প্রকার আসনের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তবে প্রথমে সুখা সনে এবং পরে পদ্মাসনে প্রাণায়াম করলে কোন অসুবিধে হয় না। সাধারণ মানুষের এই দুটো আসনেই ধ্যান করা উচিত।

দিনে রাত্রে মোট চারবার প্রাণায়াম করা সাধকের পক্ষে একান্ত দরকার। ভোরে, দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং মাঝরাতে। সকালে ব্রহ্মগ্রন্থিতে। দুপুরে বিষ্ণু গ্রন্থিতে। সন্ধ্যায় রুদ্র গ্রন্থিতে এবং মাঝ রাতে সহস্রারে মনোনিবেশ করে ধ্যান করা উচিত। কেউ কেউ এই ধ্যানকে সন্ধ্যা বলেও অভিহিত করে থাকেন।

ব্রহ্মগ্রন্থিগুলো — নাভিদেশে অবস্থিত। রজোগুণ সম্পন্ন। বিষ্ণুগ্রন্থি হলো হৃদয়। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন। ললাট বা কপাল হলো রুদ্র গ্রন্থির দেশ। রুদ্রগ্রন্থি তমোগুণ সম্পন্ন। আর সহস্রার তথা মান সরোবরে পরম ব্রহ্মের ধ্যান হলো নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

প্রাণায়ামের তিন প্রকার অবস্থা। উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম প্রাণায়ামে পরমানন্দ লাভ হয়। মধ্যম প্রকার প্রাণায়ামে শরীরে কম্পনের সৃষ্টি হয়। শরীর সুস্থ রাখার জন্য প্রাণায়াম অবশ্যই করণীয়। প্রাণায়ামকে মধ্যম প্রকার বলা হয়।

প্রথম অবস্থায় বেশী সময় প্রাণায়াম করা ঠিক নয়। বেশী প্রাণায়াম এবং নিয়ম বহির্ভূত প্রাণায়াম বিভিন্ন রোগের বিশেষ করে মাথা ব্যথা, হিককা, কর্ণ রোগ, শ্বাস কষ্ট, কাস চক্ষুরোগ এবং মৃত্যু হতে পারে।

প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা ডান নাক চেপে ধরে বাম নাক দ্বারা বায়ু গ্রহণ করে কুম্ভক করবে। তারপর বাম নাক চেপে ধরে ডান নাক দ্বারা বায়ু ত্যাগ করবে। তারপর বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা বাম নাক চেপে ধরে প্রথমে ডান নাক দ্বারা বায়ু গ্রহণ বা পুরক করবে। তারপর দু'নাক, গুহ্যদেশ, কান বন্ধ রেখে কুম্ভক করবে। তারপর ডান হাতে ডান নাক চেপে ধরে বাঁ নাকে রেচক অর্থাৎ পরিত্যাগ করবে। প্রথমে তোমাদের যে বীজমন্ত্র দিয়েছি সেই বীজমন্ত্র চারবার জপতে যে সময় লাগবে সে সময় পর্যন্ত বায়ু পেটে ঢুকাবে। তারপর দেহের সব দরজা অর্থাৎ নাক, কান গুহ্যদেশ বন্ধ রেখে ষোলবার জপ্ করার সময় পর্যন্ত শ্বাস বায়ু আটকে রাখবে অর্থাৎ কুম্ভক করবে। তারপর ঐ বীজ বিপরীত নাদ দ্বারা আট বার জপতে যে সময় লাগবে সে সময় পর্যন্ত ত্যাগ করবে। পুরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন এর সমন্বয়ের নাম হলো প্রাণায়াম। ধীরে ধীরে জপের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কুম্ভকের সময়ও বাড়াতে হবে।

প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে ধ্যানে মনঃসংযোগ সহজ হয়ে পড়ে। ধ্যানে দিব্যদর্শন হয়। চরম আনন্দ লাভ হয। বড় কথা হলো প্রাণায়াম সিদ্ধ সাধক সাধিকাগণ আকাশ পথে চলাচল করতে পারেন।

ভক্তি জিজ্ঞেস করলো — দাদু, আপনি তো বিয়ে থা করেননি মায়ের নাম করেই সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। আপনি যোগ সাধনা তথা প্রাণায়াম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন?

—মায়ের নাম নিয়ে পড়ে আছি মনের শক্তি বাড়াতে হলে প্রাণায়াম সাধন দরকার। তাই আমিও প্রাণায়াম করেছি।

—এখনো প্রাণায়াম করেন ? প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে ক্ষমতা লাভ হয়। ভগবান লাভ ভক্তি ছাড়া হয় না।

— বেশী সময় করি না। অভ্যাস বজায় রাখতে প্রতিদিন দু'বার প্রাণায়াম করি।

— আপনি আকাশ পথে চলাচল করতে পারেন ?

— না দিদি ভাই। তা হলেতো মুনি-ঋষির দলেই থাকতাম। তবে প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে অনেক বিভূতি আপনা থেকেই এসে ধরা দেয়। এরা অনেক সময়ই মনে অহংকার জাগায়। সাধনায় বিঘ্ন ঘটায়।

— প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে তো আকাশ পথে চলাচল করা যায় বললেন। আপনি কি তা হলে প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভও করেননি ?

— প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করেছি কিনা তা যাচাই করার দরকার হয়নি। প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে শরীর হাল্কা হয়ে যায়। সাধনার সময় শরীর শূন্যে উঠে। তেমনটা হয়েছে। তোমাদের বলতে বাঁধা নেই তাই বলে ফেললাম।

—আমাদের একবার করে দেখাবেন ?

— এসব অতি গোপনীয় । তবে, তোমাদের মনে বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য কিছু সময় তোমাদের প্রাণায়াম করে দেখাচ্ছি । তার আগে যোগ সম্পর্কে আরো কথা বলছি শোন ।

ভগবান শিব বর্নিত সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে আদিযামল গ্রন্থে ভগবান ব্যসদেব লিখেছেন যে প্রত্যেক সাধক এবং সাধিকাকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে — সম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, সংযম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা এই আট প্রকার সাধন অবশ্যই পালনীয়।

ভগবান শিব ঘেরণ্ড নামক এক ঋষিকে বলেছেন— দ্বাদশ প্রাণায়ামে এক প্রত্যাহার। দ্বাদশ প্রত্যাহারে এক ধারণা দ্বাদশ ধারণায় এক ধ্যান এবং দ্বাদশ ধ্যানে এক সমাধি হয়ে থাকে। সমাধি লাভে চরম আনন্দ লাভ হয়। সেজন্য যোগীগণ সর্বদাই সমাধিবস্থা লাভ করতে সচেষ্ট থাকেন। সমাধি অবস্থা লাভ করতে হলে শরীরকে শোধন করতে হয়। শোধন বিধি ষড়বিধ্ । এই ষড়বিধ শোধন বিধি হলো— ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপাল ভাতি ।

ধৌতি চতুর্বিধ, অর্ন্তধৌতি, সংযত আহার, নিদ্রায় সংযম, সংযত চিত্ত হচ্ছে যম সাধনা । চঞ্চলতা ত্যাগ, মানসিক স্থিরতা, বিষয় বাসনায় উদাসীনতা, মান-অপমান সমভাব প্রভৃতিকে নিয়ম বলে। দেহ ও মনশুদ্ধি করে বাসনা শূণ্য মনোভাব পোষণ করার নাম প্রত্যাহার। মনসংযত না হলে, বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত না হলে সমদৃষ্টি সম্পন্ন না হলে, হিংসা ও দ্বেষ রহিত না হলে সমাধিবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধৌতি, গজ করণী, বস্তি, লৌলী নেতি এবং কপাল ভাতি, প্রভৃতি ষট কর্ম অনুষ্ঠান করলে শরীর মেদশূন্য হয়। কফ জনিত সমস্যা দূরিভূত হয়। কপালে যে দিব্যদৃষ্টি লাভের যন্ত্র রয়েছে তা পরিস্কার হয়। সাধক ত্রিলোকদর্শী এবং ধ্যান যোগে ত্রিলোকের সবকিছু দেখার শক্তিলাভ করতে পারেন।

ভক্তি, সাধন ভজনে মুদ্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মুদ্রা সম্পর্কে তোমাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শুধুমাত্র যোনিমুদ্রা সম্পর্কে দু-এক কথা বলবো। মুদ্রা বিভিন্ন প্রকার— ১) যোনি মুদ্রা, ২) বজ্রোলী মুদ্রা, ৩) শক্তি চালনী মুদ্রা, ৪) তাড়াগী মুদ্রা, ৫) মান্ডুকী মুদ্রা, ৬। শাম্ভবী মুদ্রা, ৭) পঞ্চ ধারণা মুদ্রা, ৮) আম্ভসী ধারণা মুদ্রা, ১১) আগ্নেয়ী ধারণা মুদ্রা, ১২) অশ্বিনী মুদ্রা, ১৩) পাশিনী মুদ্রা, ১৪) কাকী মুদ্রা, ১৫) ভুজঙ্গিনী মুদ্রা ।

ভক্তি কুল কুন্ডলিনীকে জাগ্রত করতে হলে যোনিমুদ্রা জানা প্রয়োজন। কুল কুন্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়।

সিদ্ধাসন বা পদ্মাসনে বসে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দুই কানের ছিদ্র বন্ধ করবে। দুই হাতের দুই তর্জনী দ্বারা দুই চক্ষু বন্ধ রাখতে হবে। কাকী মুদ্রা দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে অপান বায়ুকে যুক্ত করতে হবে। তারপর মূলাধার চক্রে দেবীর ধ্যান করে হুঁ এবং হংস মন্ত্র জপ্ করতে হবে। তা হলেই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে মুলাধার থেকে ক্রমে ষট চক্র ভেদ্ করে সহস্রারে যাত্রা করবেন। যোনি মুদ্রা সাধন করতে হলে কাকী মুদ্রাও জানা প্রয়োজন তাই কাকী মুদ্রা সম্পর্কেও তোমাদের দু-চার কথা বলছি। শোন —

নিজের মুখকে কাকের ঠোঁটের মতো করে বায়ু পান তথা পূরণ করতে হবে। কাকী মুদ্রায় আর কিছু করণীয় নেই।

প্রাণায়াম সাধন করতে হলে চারটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমে উপযুক্ত স্থান ও সময়, পরিমিত আহার এবং নাড়ি শুদ্ধি। দুরদেশে, অরণ্যে, রাজধানীতে আহার এবং জনসমীপে যোগাভ্যাস করলে সিদ্ধি লাভ কঠিন হয়ে থাকে।

দূরদেশে অভ্যাস করলে সময়ের অভাবে সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হতে পারে। বনে যোগ সাধনা করলে নিরাপত্তার অভাব থাকে। লোকালয়ে বা জনসমক্ষে যোগ সাধনা করলে গোপনীয়তা নষ্ঠ হয়। যে স্থান সুরক্ষিত, খাদ্য ও সেবায় সহায়তা পাওয়া যাবে সে স্থানেই যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে নির্জন কোন আশ্রমে সাধুসন্তের সহায়তায় যোগ সাধনা করলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সিদ্ধ গুরুর ভূমিকা অপরিসীম।

শরৎ এবং বসন্ত এই দুই ঋতু যোগ সাধনার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে থাকে। নাড়ি শুদ্ধ না হলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হওয়া যায়না। নাড়ি শুদ্ধি দুই প্রকারের। সমনু ও নির্মনু। বীজমন্ত্র দ্বারা যে নাড়ী শুদ্ধি তা সমনু এবং ধৌতি কর্ম দ্বারা যে নাড়ী শুদ্ধি তা নির্মনু। ধৌতি কর্মদ্বারা নাড়ি শুদ্ধি করতে হলে উপযুক্ত যোগশিদ্ধ গুরুর কাছ থেকে অভ্যাস করা প্রয়োজন।

কুম্ভক আট প্রকার। যথা— সহিত, সূর্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মুর্ছা ও কেবলী। সাধন ভজনে দুই প্রকার কৃপার কথা বলা হয়েছে। অহৈতুকি কৃপা এবং কৃচ্ছ সাধনার দ্বারা ভগবানকে খুশী করে সিদ্ধিলাভ। যারা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করতে গুরুর উপর সব কিছু সমর্পণ করেন তারা ভক্তিবাদী। আর যারা যোগ সাধনার দ্বারা ভগবানকে দর্শনলাভ করে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা কামনা করেন তারা জ্ঞানবাদী। সংসারী জীবের পক্ষে ভক্তি বাদে থাকাই শ্রেষ্ঠ পথ। ভক্তিই জ্ঞানের পথ প্রদর্শক।

গঙ্গাধর পদ্মাসনে বসে পুরক করে কুম্ভক করার মুহূর্ত পরেই তাঁর শরীর মাটি থেকে প্রায় এক হাত উপরে উঠে এলো। সামান্য পরেই চোখ খুললেন। বললেন, যোগ সাধনার কেমন শক্তি তোমাদের তা দেখানোর জন্যই আমার বিভূতি দেখালাম। এবার

তোমাদের আবার যোগ শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু শোনাবো। ব্যাসদেব শিব সংহিতা নামক গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। শিব সংহিতা এবং ঘেরন্ড সংহিতা থেকে তোমাদের যোগ ও আসন সম্পর্কে কিছু বলছি।

যোগের চারটি অবস্থা। আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা পরিচয়াবস্থা এবং নিস্পত্যবস্থা। সকল যোগাসনেই এই চারটি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে। যোগ সাধনায় সাধক ও সাধিকা যার যার গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র জপ্ করে প্রাণায়াম করেন। তিন প্রকার প্রাণায়ামের কথা তোমাদের বলেছি সব প্রকার প্রাণায়ামেই কেবল কুম্ভক হয়। প্রাণায়াম সাধনায় এই কেবল কুম্ভক সর্বোৎকৃষ্ট এবং সহজ। এই কেবল কুম্ভকের এমনি মহিমা যে সাধক সাধিকা কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হলে সকল প্রকার বাঁধা দূর করতে পারেন। সব সিদ্ধিলাভের দরজা তখন তার জন্য খুলে যায়।

মূলাধারে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু মণিপুরে রুদ্র, অনাহত চক্রে নারায়ণ, বিশুদ্ধ চক্রে সদাশিব এবং আজ্ঞাচক্রে পরাশিব অবস্থান করেন। আর সহস্রারে পরম ব্রহ্ম হংসরূপে বিরাজমান। বিন্দু শব্দের অর্থ হচ্ছে শুক্র। সাধনকালে ঐ শুক্র বাস্পের আকারে পরিণত হয়। কুম্ভককালে ঐ শুক্র মুলাধার থেকে সহস্রারে উঠে তখন সাধক সাধিকা সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সহস্রারে অমৃত রয়েছে। যে সাধক বা সাধিকা অমৃত পান করে অমরত্ব লাভ করতে চান তাকে অবশ্যই খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধি লাভ করতে হবে।

খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে জিহ্বাকে দীর্ঘ করা প্রয়োজন। যারা খেচরীমুদ্রা অভ্যাস করবেন তারা গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী ধীরে ধীরে জিহ্বার নীচের শিরাগুলো কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা ছেদন করে থাকেন। জিহ্বা লম্বা হলে জিহ্বা দ্বারা মুখ গহ্বরের আলজিহ্বায় স্পর্শ করে ক্রমে ভ্রূমধ্য স্থানে যে স্থান আছে সে স্থানে চাপ সৃষ্টি করতে থাকবেন। ক্রমাগত এই অভ্যাস করলে একদিন হঠাৎ করেই সহস্রার থেকে এক বা দু'ফোটা অমৃত বিন্দু জিহ্বাগ্রে পড়বে। ঐ এক ফোটা বা দুই ফোটা অমৃত বিন্দু সাধককে সাধনার কার্যে দারুণভাবে সহায়তা করে থাকেন। ঐ এক ফোটা অমৃত ছয় মাস সময়কাল পর্যন্ত কোন প্রকার আহার গ্রহণ না করলেও সাধক বা সাধিকার শক্তি এবং দেহের কান্তি ঠিক্ রাখে। যারা খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধিলাভ করেন তারা বিশ্বের যে কোন স্থানে যে কোন পরিবেশে সাধন ভজন করতে পারেন। খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধ সাধক অমৃত গ্রহণ করে সমাধিতে ডুবে থাকেন। ছয় মাস গত হলে কুল কুন্ডলিনী শক্তি সাধক বা সাধিকাকে পুর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। এরকম ভাবে হিমালয় এবং হিন্দুকুশ পর্বতের গুহায় কোন কোন সাধক বা সাধিকা হাজারো বছর ধরে তপস্যা করে চলেছেন। এতে বিস্মিত হবার কোন ব্যাপার নেই। সাধকের বীর্য ধারণই অমরত্বের কারণ এবং বিন্দু পতন সাধকের পতনের কারণ হয়।

ভগবান শিব পার্বতীকে সাধক - সাধিকাগণের সাধনায় যে পঁচিশটি মুদ্রার প্রয়োজনের কথা বলেছেন সেই পঁচিশটি মুদ্রা হলো— মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান মুদ্রা, জলন্ধর, মলন্ধর, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীত করণী, যোনি, বজ্রোলী, শক্তি চালনী, আস্তসী ধারণা, মান্ডবী, তাড়াগী, শাম্ভবী, পঞ্চধারণা, অশ্বিনী, কালিনী, কাকী, মাতঙ্গী এবং ভুজঙ্গিনী।

মহাদেব সাধক সাধিকাগণকে ৩২ প্রকার আসনের মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করে সাধন করার কথা বলেছেন। এই ৩২ প্রকার আসন হলো — সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, গোমুখাসন, পশ্চিমোত্তাসন, উৎকটাসন, মর্কটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্মাসন, উত্তান কূর্মকাসন, বৃক্ষাসন, মন্ডুকাসন, গড়ুরাসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন এবং যোগাসন। এই বত্রিশ প্রকার আসনের মধ্যে যোগীগণ সুখাসন বা সিদ্ধাসন এবং পদ্মাসন এই দুই প্রকার আসনই অধিক মাত্রায় অভ্যাস করে থাকেন।

মুলাধারে যে পদ্ম আছে সেই পদ্ম চতুর্দল। স্বর্ণ বর্ণ। এখানে দ্বিরন্ড নামক শিবলিঙ্গ এবং ডাকিনী নামক শক্তি বিরাজমান। এই চক্রের নাম মুলাধার। গুহ্য দেশে অবস্থিত। স্বাধিষ্ঠান চক্রে যে পদ্ম রয়েছে সেই পদ্ম ছয়দল বিশিষ্ট। কমল বা পদ্মের বর্ণ রক্তিম। এখানে বাণ নামক লিঙ্গ এবং রাকিনী নামক শক্তি বিরাজমান। এর নাম স্বাধিষ্ঠানচক্র।

তৃতীয় পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত। এর নাম মণিপুর চক্র। এই কমল দশদল যুক্ত ও স্বর্ণবর্ণ। এখানে রুদ্র নামক লিঙ্গ এবং লাকিনী নামক শক্তি বিরাজমান। অনাহতচক্র হৃদয়ে অবস্থিত। এই কমলের বর্ণ ঘোর লাল। দ্বাদশ দল যুক্ত এই চক্রে পিনাকী নামে লিঙ্গ এবং কাকিনী নামক শক্তি রয়েছেন। কণ্ঠ প্রদেশে বিশুদ্ধ চক্র নামক স্থানে ষোড়শ দল বিশিষ্ট পদ্ম রয়েছে। এই পদ্মের রঙ ধূম্র। এই চক্রে অকলঙ্ক শশধর নামে লিঙ্গ এবং শাকিনী নামে শক্তি রয়েছেন। ভ্রুদ্বয় মধ্যে আজ্ঞা চক্র নামে এক চক্র আছে। এই চক্রে দ্বিদল যুক্ত কমল রয়েছে। এই পদ্মের রঙ সাদা। মহাকাল নামে লিঙ্গ এবং হাকিনী নামে শক্তি বিরাজমান।

ভক্তি, বিশ্বসার তন্ত্র, কঙ্কাল মালিনী তন্ত্র এবং নীলতন্ত্রে মহাদেব পার্বতীকে গুরুর যে রূপ ধ্যানের কথা বলেছেন তা ঘেরন্ড ঋষি শিষ্যদের পালনের উপদেশ দিয়ে সহস্রারে ধ্যান করতে বলেছেন। গুরুর ধ্যানের যে মন্ত্র ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করেছেন তা তোমাদের বলছি শোন।

"সহস্রদল পঙ্কজে, সকল শীতলরশ্মি প্রভং
বরাভয় করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পোক্ষিতম্।
প্রসন্নবদনেক্ষণং সকল দৈবত রূপিণং
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধ্যানপূর্বকং গুরুম।।

অর্থাৎ মাথার উপরে যে সহস্রদল পদ্ম রয়েছে সেখানে হংসোপরি সমাসীন পরমব্রহ্ম গুরুদেবকে চিন্তা করা উচিত। তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তাঁর দেহ বিমলগন্ধ ও কুসুমবাসে সুবাসিত। তার মুখমণ্ডল প্রসন্ন। তিনি সকল দেবতারূপী। তার হাতে বর, অভয় এবং পদ্মশোভিত।

দ্বৈতভাবে এই রূপ ধ্যান আর জ্ঞান বাদে জ্যোর্তিধ্যান করা হয়। জ্যোর্তিধানে সাধক সাধিকা নিজেকেই পরম ব্রহ্ম বলে কল্পনা করেন। তিনি নিজেকে ব্রহ্মতুল্য এবং সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ বলে নিজের ভ্রু-দ্বয়ের মাঝে হৃদয়ে উপবিষ্ট ব্রহ্মের ধ্যান করেন।

সমাধি ছয় প্রকার। এই ছয় প্রকার সমাধি হলো — ধ্যানযোগ সমাধি। নাদযোগ সমাধি। রসানন্দ যোগ সমাধি, লয় সিদ্ধিযোগ সমাধি। ভক্তিযোগ সমাধি এবং রাজযোগ সমাধি। ভ্রামরী কুম্ভক দ্বারা রসানন্দযোগ সমাধি, যোনি মুদ্রা দ্বারা লয়সিদ্ধি যোগ সমাধি, ভক্তিযোগ দ্বারা ভক্তিযোগ সমাধি এবং মনোমুর্চ্ছা কুম্ভক দ্বারা রাজযোগ সমাধি সম্পন্ন হয়।

ধ্যান পূর্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটিয়ে যে পরমানন্দ অবস্থায় পৌঁছানো যায় তাকেই ধ্যানযোগ সমাধি বলে। হৃদয়ে মনকে স্থির করে হৃদয়ে নিজ গুরু বা ইষ্টদেবকে ধ্যান করলে হৃদয়ে যখন সেই মনোনয় বিগ্রহ প্রকাশিত হবে তখন আনন্দে শরীর ও মন পুলকিত হতে থাকে। এরই নাম ভক্তি যোগ সমাধি। মনোমুর্চ্ছানামক কুম্ভকেও মনকে স্থির করে যখন জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মিলন ঘটানো হয় তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মন পরমানন্দে স্থির হয়ে থাকে। এই অবস্থাকেই রাজযোগ সমাধি বলা হয়। তোমাদের সংক্ষেপে প্রাণায়াম এবং কুম্ভব সম্পর্কে আর একটু শোনাতে চাই।

পরমপ্রেমময় ভগবান শিব মানুষের কল্যাণের জন্য দেবী পার্বতীকে প্রথম যোগশাস্ত্র আয়ুর্বেদশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্রের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞ বল্ক্য, ব্রহ্মর্ষি পরাশর, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র মহর্ষি পাতঞ্জল প্রভৃতি বহু ঋষি ঐ সবশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে মানুষের কল্যাণে পৃথিবীতে প্রচার করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যোগ সম্পর্কে যে সব উপদেশে প্রদান করেছেন ব্যাসদেব রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি গ্রন্থে সে সব লিপিবদ্ধ করেছেন। মহর্ষি ব্যাসদেব কৃত হঠযোগ গ্রন্থের যোগ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু কথা তোমাদের অতি সংক্ষেপে শোনাবো। এক শ্রেণীর জন নেতা যুব সমাজকে যেভাবে মদ এবং অপসংস্কৃতিতে ডুবানোর কাজ শুরু করেছে তাতে তোমাদের কাছ থেকে যোগ সম্পর্কে সামান্য তথ্যও যদি যুবসমাজের কিছু অংশ জানতে পারে তা হলে সেটাও সামান্য উপকারে আসবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন — সাংখ্য সদৃশ্ জ্ঞান আর যোগ সদৃশ্য বল পৃথিবীতে আর নেই। এই দুই মহৎ গুণ যে দেশে প্রসার লাভ করে সে দেশ জগতে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে। ভারত এক সময় সাতটি দ্বীপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বা বর্ষ রূপে পরিচিত

ছিল। কিছু রাজনৈতিক নেতা বিদেশের স্বার্থকে রক্ষা করতে দেশবাসীকে চরম সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে।

যোগ সাধনা দুই প্রকারের; সগুণ এবং নির্গুণ। প্রাণায়াম যুক্ত যোগসাধনা সগুণ আর চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত যোগ সাধনা নির্গুণ। জ্ঞানী ভক্তগণ নির্গুণ এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ভক্ত সগুণ যোগ সাধনা করেন। জ্ঞানী ভক্তগণ ব্রহ্মের নিরাকার রূপ ধ্যান করেন আর ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ভক্তগণ সাকাররূপ ধ্যান করেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি আট প্রকার সাধনা সুক্ষ্ম আর অনিমা লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্যা, বশিত্যা, কামবাসয়িতা প্রভৃতি বিভূতিকে স্থূল বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাত্রির শেষ প্রহরকে ভগবান শিব সকল প্রকার সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বলে বর্ণনা করেছেন। যোগ চার প্রকার। মন্ত্রযোগ, লয় যোগ, রাজযোগ এবং হঠযোগ। শরীরের নয়টি চক্রে নাড়ি গ্রন্থিস্থানে মনকে লয় যুক্ত করে যে সাধনা তাই লয়যোগ নামে পরিচিত। মন ও শরীরস্থ সকল প্রকার প্রাণ বায়ু নিশ্চল হলেই রাজযোগ সিদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রাণ বায়ু পাঁচভাবে বিরাজমান। এই পাঁচ প্রাণ বায়ুর কথা আগেও তোমাদের বলেছি। প্রসঙ্গক্রমে আবার বলছি— প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ প্রকার প্রাণ বায়ু আমাদের দেহ ও মনকে সজীব রেখেছে। প্রাণের অভাবে দেহ শবদেহে পরিণত হয়।

প্রাণায়াম যুক্ত নির্গুণ সাধনার সময় মন এবং ইন্দ্রিয় সমুহ যখন নিশ্চল হয়ে পড়ে তখন হঠাৎই যোগ ঘটে যায় বলে এর নামও রাখা রয়েছে হঠ যোগ। আর ইষ্ট মন্ত্র জপ্ করতে করতে ইন্দ্রিয় ও মনের নিশ্চল অবস্থার নামই মন্ত্র যোগ। ভক্তিবাদে বিশ্বাসীগণ মন্ত্রযোগই অভ্যাস করে থাকেন। মন্ত্রময় ধ্যান স্থূল মন্ত্রহীন ধ্যান সুক্ষ্ম।

ভগবান শিব আট প্রকার কুম্ভকের কথা বলেছেন। এই আট প্রকার কুম্ভক হলো— সুর্যভেদন, উজ্জায়ী, সীৎকারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মুর্চ্ছা এবং প্লাবনী।

সূর্যভেদন কুম্ভক —সুখাসনে বা পদ্মাসনে বসে ডান নাক দ্বারা বায়ু পুরক করে চতুর্গুণ সময় বায়ুকে শরীরে আবদ্ধ রেখে পুরকের দ্বিগুণ সময়ে সেই বায়ু বাম নাক দ্বারা রেচক করতে হবে। এর দ্বারা কপাল শোধিত হয়। বাতরোগ এবং ভূমিদোষ নষ্ট হয়। হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া ভাল থাকে। হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়।

সীৎকারী কুম্ভক — মুখ দ্বারা সশব্দে বায়ু পুরক করে চতুর্গুণ সময় শরীরে সে বায়ু ধারণ করে দুই নাক দ্বারা পুরকের দ্বিগুণ সময় দ্বারা সেই বায়ু ত্যাগ করা। এর দ্বারা সাধক রূপবান, বলবান এবং জনচিত্ত জয়ের অধিকারী হন।

শীতলী কুম্ভকঃ সুখাসন বা পদ্মাসনে বসে জিহ্বাকে নলের মতো করে বায়ু পুরণ করে চারগুণ সময় সেই বায়ু ধারণ করে দুই নাক দ্বারা সেই বায়ু দ্বিগুণ সময়ে ত্যাগ করতে হয়। এই কুম্ভকের ফলে দেহের গুল্ম প্লীহাদি রোগ সমুহ ভাল হয়। শরীর সুস্থ থাকে।

ভস্ত্রিকা কুম্ভক — কর্মকারের হ্যাপারের মতো দুই নাক দ্বারা সশব্দে বায়ু পুরণ করে পুনরায় সেই বায়ু সশব্দে দুই নাক দ্বারা পুনপুন পুরক ও রেচকের কাজ করতে হবে। কিছুক্ষণ এই ভাবে পুরক ও রেচকের কাজ করে ডান নাকে বায়ু পুরক করে চারগুণ সময় রায়ু ধারণ করে বাম নাক দ্বারা দ্বিগুণ সময়ে সে বায়ু ত্যাগ করতে হয়।এই প্রাণায়াম বাত পিত্ত্য নাশক। কুলকুন্ডলিনী শক্তিকে দ্রুত জাগ্রত করার ক্ষমতা এর রয়েছে।

ভ্রামরী কুম্ভক — ভ্রমরের মতো শব্দ সহকারে ডান নাক দ্বারা পুরক করে চারগুণ সময় বায়ু ধারণ করে দ্বিগুণ সময়ে ভ্রমরের মতো শব্দ করে বাম নাক দ্বারা রেচক প্রক্রিয়াকে ভ্রামরী কুম্ভক বলে।এই কুম্ভকের ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগ আরোগ্য হয়। শরীর সবল থাকে এবং সাধক দীর্ঘায়ু হন।

মুর্চ্ছা কুম্ভক — অতি ধীরে ডান নাকে বায়ু পুরক করে চারগুণ সময় সেই বায়ু ধারণ করে খুব ধীরে সেই বায়ু বাম নাক দ্বারা রেচক করা। কিছুদিন এই ভাবে প্রাণায়াম করতে করতে প্রাণায়ামের সময় একটি মুর্চ্ছনার ভাব হয়।এরজন্য একে মুর্চ্ছা কুম্ভক বলা হয়।এই কুম্ভক দ্বারাও বিভিন্ন প্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

প্লাবিনী কুম্ভক — ডান নাকে বায়ু পুরক করে ক্রমে বেশী বায়ু পুরক করে উদরপূর্ণ করে যদি সেই বায়ুকে ধরে রাখার অভ্যাস করা যায় তাহলে জলের উপর ভেসে থাকা বা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। প্রাণায়াম সিদ্ধ না হলে প্লাবিনী কুম্ভকে সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল কুম্ভক — প্রাণায়াম দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে পারলে সহিত কুম্ভক সিদ্ধ হওয়া যায় আর সহিত কুম্ভকে দীর্ঘদিন অভ্যাস করলে কেবল কুম্ভকে সিদ্ধিলাভ হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক কুম্ভকের নামই কেবল কুম্ভক। কেবল কুম্ভকে সিদ্ধিলাভ করতে পারলে আট প্রকার সিদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই এসে হাজির হয়। প্রাণায়াম সাধনা মানুষকে দীর্ঘায়ু এবং নিরোগ থাকতে সহায়তা করে। ভক্তিবাদীগণ ভগবানের কৃপার উপরই নির্ভরশীল থাকেন।

সত্যবতী, দুর্গের ভেতর ভক্তির খেলার সাথী দুর্গের ভেতরে পরিবার নিয়ে বসবাস করা কয়েকজন সৈনিকের মেয়ে। এরমধ্যে ভক্তির সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো রংমালা। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ের মেয়ে ।দেখতে শ্যামলা হলেও খুব সুন্দরী।অনেকটা ভক্তির মতো। শুধু চোখের গড়ন আলাদা। ভক্তির চোখ দুটো বড় বড়। টানা টানা। মায়াবী।সাহিত্যিকের ভাষায় হরিণ নয়না বলা যেতে পারে। আর রঙমালার চোখ দুটো খুব ছোট। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বড় বড় চোখ। লম্বা গড়ন। হাত ও পায়ের গড়নও লম্বা। ত্রিপুরায় যাদের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলা হয় তাদের সকলেরই চোখ ছোট। হাত-পা এবং গড়ন বেটে।

কৈলাগড়ের আশ-পাশ এলাকায় বাঙ্গালীদের বাস। বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব দুর্গে বসবাসকারীদের উপর পড়েছে।দুর্গে বসবাসকারী উপজাতি মহিলা ও কিশোর কিশোরীরা বাঙ্গালী পোষাক পরিচ্ছদ এবং ভাষা ব্যবহার করছে। জনজাতিদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার আগ্রহও বাড়ছে।

ভক্তি পূজোর ফুল তুলে ঘরে গিয়ে পোষাক বদল করে। দীঘিতে এসে স্নান সেরে মায়ের নিত্য পূজা করে। ভক্তির জন্য আলাদা ঠাকুর ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাধর পণ্ডিত একটি শীলাতে দেবী কালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিকে পূজোর জন্য দিয়েছেন। ভক্তি রোজ শীলা পূজা করছে। গোবিন্দ, জগন্নাথ, কল্যাণদেব এবং লতিকা প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব সময় অনুযায়ী সেই শিলাকেই দেবী কালীর প্রতীক রূপে পূজা করছে। মহাদেব এর প্রতীক হিসেবে রয়েছে কালো পাথরের প্রায় এক হাত উঁচু এক শিব লিঙ্গ। যে পাথরটি দেবী কালীর প্রতীক হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে সেটিও প্রায় এক হাত উঁচু। এই দুই বিগ্রহ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন মন্দিরের পুরোহিত গদাধর পণ্ডিত।

কল্যাণদেব কারিগড় দ্বারা পাথর থেকে দেবী কালী ও শিবের বিগ্রহ তৈরী করে দীপাবলীতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গঙ্গাধর পণ্ডিত তাতে রাজী হন নি। স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঐ পাথর ধান ক্ষেতের ফোয়ারা থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ভাদ্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে। বিগ্রহ তৈরীর কাজ দুর্গা পূজার আগে শেষ হলেও পুরোহিতের পরামর্শ মেনে বিগ্রহ মহাধুমধামের সঙ্গে ভাদ্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে ১০৮টি পাঁঠা বলি দিয়ে মাকে স্থাপন করা হয়েছিলো। দক্ষ কারিগড় দ্বারা নির্মিত সেই বিগ্রহ আকারে প্রায় এক হাত লম্বা হলেও দেখতে অপূর্ব সুন্দর হয়েছিল। মহারাজ যশোধর মাণিক্য পরিবার পরিজন নিয়ে মায়ের পূজোর সময় মন্দিরে উপস্থিত থেকে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। মন্দিরে রঙমালা এলো। মাকে প্রণাম করলো। পণ্ডিতকে প্রণাম করলো। তারপর ভক্তিকে বললো— চলো আমরা দু'জনে গিয়ে কিছু সময় দীঘির পাড়ে বসে গল্প করি।— রঙমালা ভক্তির খেলার সাথী। ভক্তির অন্যতম প্রিয় সখী। রঙমালার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভক্তি বললো — চলো।

ভক্তি ও রঙমালা দীঘির পাড়ে চলে এলো। বাঁধানো ঘাটে বট গাছের পাশে বসে পশ্চিমের সবুজ ধান ক্ষেত্রের দিকে মুখ করে বসে রঙমালা জিজ্ঞেস করলো— সখি, তুমি কেমন বর কামনা করো?

—সখি, আমিতো মনে প্রাণে শিব ঠাকুরকে ভালোবাসি। ছোট পুরোহিত জয়ন্তকে ভালোবাসি। আমার মনে অন্য কোন পুরুষ সম্পর্কে আগ্রহ নেই। সখি কাঞ্চনমালার সঙ্গে পরশু এই প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা হয়েছিলো। কাঞ্চনমালার বাবা এক হাজারী সেনাপতি। সেনাপতির মেয়ে রাজকুমারের সঙ্গে ঘর করার স্বপ্ন দেখতেই পারে। দাদা গোবিন্দকে ওর খুব পছন্দ। দাদা সত্যিকারেরই একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। দাদা যুদ্ধ বিদ্যা এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি সমভাবে আগ্রহী। দাদা জগন্নাথ এবং রাজ কাংএ বসবাসকারী আমার অন্য দুই দাদা যাদব ও রাজ বলাই যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতিই মনোযোগ দিতে চান না। গোবিন্দ দাদা ভবিষ্যতে কি হবেন তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। বিমাতা মঙ্গলা যাদব ও রাজ বলাই

এর জন্য রাজকাং গ্রামের দুই রিয়াং মেয়েকে বঁধু হিসেবে ঠিক করে রেখেছেন।

— কাঞ্চনমালা আমাকে সব কথা বলে। দাদাকে দেখলেই ওর চঞ্চলতা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। দাদার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে, কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞেস করে। ঘোড়ার লাগাম ধরে দাদাকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করে। ঘরে ভাল জিনিষ রান্না হলে দাদাকে লুকিয়ে এনে খাওয়ায়। কয়েক দিন এমন ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। মাকে সেসব কথা বলেছি। মা শুনে হেসেছেন। বলেছেন— মেয়েটা খুব ভাল। ভবিষ্যতে যদি ওদের মধ্যে বিবাহের ব্যাপার নিয়ে আমার মতামত জানতে চাওয়া হয় তাহলে আমি সমর্থন জানাবো।

সখি, কাঞ্চনমালা মন্দিরে এসে দাদার মঙ্গলের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায়। আমি এ পর্যন্ত যত কিশোর দেখেছি কাউকেই আমি আমার স্বামী বলে ভাবতে পারিনি। তবে জয়ন্তকে আমার খুব আপন বলে মনে হয়। ভাল লাগে। দিনে কয়েকবার জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হয়। কথা হয়, হয়তো সে কারণেই মনে অজান্তে সে একান্ত আপনজন হয়ে পড়েছে। সখি, তুমিতো আমার কথা শুনলে। এবার তোমার কথা বলো। আমাদের দুর্গের কিংবা আশপাশের কোন কিশোরকে কি তুমি পছন্দ করেছ?

— না সখি। ছোট সময় থেকেই আমি শিব ঠাকুরকে আমার স্বামী বলে মনে করে আসছি। যদি বিয়ে করতে হয় তা হলে শিব ঠাকুরকেই বিয়ে করবো।

—আমার কিন্তু শিব ও কালীর সেবাতেই বেশী আনন্দ হয়। আমি তাদের কাছে প্রার্থনা করি, আমি শেষ সময়েও যেন তাদের সেবা করে যেতে পারি।

— তোমার ভাবনা খুব সুন্দর। ধূপ আর ফুল দু'জনেই গন্ধ ছড়িয়ে আনন্দ পায়। ধূপের গন্ধ অনুভব করা যায়। ফুলের গন্ধ অনুভব করার পাশাপাশি ফুলের সৌন্দর্যও উপভোগ করা যায়। দু'জনেরই সেবায় প্রীতি। সেবায় যাদের আনন্দ হয় পৃথিবীতে তাদের মতো ভক্ত আর নেই। ভক্তি, তুমিতো সেদিন বড়ির আঁচার খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলে তাই তোমার জন্য খানিকটা আঁচার নিয়ে এলাম। তুমি এর থেকে জয়ন্ত ঠাকুরকেও একটু দিও।

—আঁচার কোথায় পেলে ?

— শাস্ত্রে আছে উপাদেয় বস্তু পাওয়া মাত্রই গ্রহণ করা উচিত। কোথা থেকে পাওয়া গেল, দাম কত, কোন দোকানীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এসব প্রশ্ন বুদ্ধিমতিরা কখনো করে না। এনেছি খেয়ে নাও। খেয়ে বলো স্বাদ হয়েছে কিনা তা হলে আর এক দিন নিয়ে আসবো।

কচুপাতার পুটলিটা রঙমালা ভক্তির হাতে তুলে দিলো। শ্রাবণ মাস। দীঘি ভরা জল। আকাশে মেঘের ছুটাছুটি। ভরা দীঘিতে মাছেদের আনন্দ মেলা। বিদেশী হাঁসেদের কেউ কেউ এখানকার গরম সহ্য করেও থেকে গেছে। শীতের সময় এখানে বেড়াতে

এসে এরা বংশ বিস্তার করেছে। ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে গরমের শুরুতে আর নিজেদের দেশে পাড়ি দিতে পারে নি। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে। ভক্তি আঙ্গুলে করে একটু আঁচার মুখে দিয়ে বললো— খুব স্বাদ হয়েছে। তারপর আকাশের দিকে তাকালো।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললো — সখি, হয়তো বৃষ্টি আসতে পারে। কয়েকদিন ধরে আমার কেবল কুল বড়ির আঁচার খাওয়ার সাধ জাগছিল। কথা প্রসঙ্গে সেদিন তোমায় মনের কথা বলে ফেলেছিলাম। কুল বড়ির সময়ে মায়ের কথায় বাবা অনেক পাকা বড়ি যোগার করেছিলেন। মাসি সেই বড়ির একটা অংশ শুকিয়ে ভাল আঁচার বানিয়েছিল। রোজ খেতে খেতে কখন যে হাঁড়ি খালি হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। এবার শীতে বেশী করে আঁচার বানিয়ে সঞ্চয় করে রাখতে হবে। মুখে আরো একটু ঢুকিয়ে চাটতে চাটতে বললো— সখি, অপূর্ব স্বাদ হয়েছে। কিছুটা মাকে দেবো। আমার মতোই মা আঁচার খেতে ভালোবাসেন। জয়ন্তকে আর একদিন এনে দিও।

—অধিকাংশ মেয়ে ও মায়েরাই টক্ ভালো বাসেন। ঠিক আছে জয়ন্ত ও তোমাকে আর একদিন এনে খাঁওয়াবো। সন্ধ্যা হয়ে এলো। এবার ঘরে চলো।

পরদিন দুপুরে রঙমালা এলো ভক্তির কাছে। ভক্তি পুতুলের বাক্স নিয়ে বসেছিলো। মাটির কয়েকটা পুতুল কোনটাকে বর আর কোনটাকে কনে সাজিয়ে সুন্দর পুতুলের সংসার সাজিয়েছে ভক্তি। ধাইমা ভক্তিকে পুতুলের কাপড় পরানোর কাজটা শিখিয়ে দিয়েছে। মায়ের পুরনো রেশমী শাড়ীর টুকরো কেটে পুতুলের কাপড় তৈরী করা হয়েছে।

রঙমালা আসার পর দুই সখীতে মিলে পুতুল নিয়ে খেলায় মেতে উঠলো। খেলার ফাঁকে ভক্তি বললো, রঙমালা, গতকাল এক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম হাতীর পীঠে চড়ে আমাদের পরিবারের সকলে দাদাকে দেখতে রাজধানী যাচ্ছি। স্বপ্নে দাদাকে দেখার পর দাদাকে দেখতে মন কেমন করছে।

— তুই স্বপ্নে যা দেখিস তাই সত্যি হয়। নিশ্চয়ই তোরা রাজধানী যাবি।

রঙমালা, কাঞ্চনমালা এরা প্রতিদিনই একবার দু'বার করে ভক্তিদের বাড়ী আসে। কোন কোন দিন মায়েরাই তাদের তাগাদা দিয়ে পাঠায়। সেনাপতি তথা দুর্গাধিপতির মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে পারলে ভবিষ্যতে এবং বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার আশা থাকে।

দু-বছর আগে আশ পাশের কিশোরেরাও খেলা করতে আসতো। সেই কিশোরদের সকলেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকে। যে সময় অবসর পায় সে সময় কোন কিশোর বড়দের সঙ্গে বনে শিকারে চলে যায়। কেউ জ্বালানী কাঠসংগ্রহ করতে যায়। কেউ মাছ ধরতে ছড়া ও নদীতে চলে যায়। জয়ন্ত পুজারী ব্রাহ্মণের ছেলে। সে গঙ্গাধর

পন্ডিতের কাছে পূজার নিয়ম কানুন শিক্ষা করছে। এ ভাবেই চলছে দৈনন্দিন জীবন।

রঙমালার দেওয়া বড়ির আঁচার ভক্তির কাছে যেমন খুবই উপাদেয় মনে হয়েছে তেমনি ভক্তির মা লতিকার কাছেও খুব উপাদেয় মনে হয়েছে। ভক্তির মা ঠিক করেছে পরদিন রঙমালা এলে রঙমালাকে বলবে আঁচার তৈরীর পদ্ধতিটা যেন বলে দেয়। সামনের বড়ির সময়ে বড়ি সংগ্রহ করে রঙমালার মায়ের পদ্ধতি অনুসারে সেও আঁচার বানাবে।

রঙমালা পরদিন ভক্তির সঙ্গে খেলা করতে আসার পর খেলার ফাঁকে ভক্তি বললো— সখি, তোমার মায়ের বানানো বড়ির আঁচার মায়ের কাছেও খুব স্বাদ লেগেছে।

ভক্তির কথা শুনে অবাক হয় রঙমালা। ভক্তি কি বলছে সে কথাই প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করলো— কি বলছিলে সখি আবার বলো।

—তুমি দীঘির পাড়ে গতকাল বিকেলে আমাকে যে বড়ির আঁচার খেতে দিয়েছিলে তার অর্দ্ধেকটা তো আমি মায়ের জন্য নিয়ে এসেছিলাম মা তেঁতুল এবং বড়ির আঁচার খুব ভাল বাসেন বলে। মায়ের কাছেও আঁচারের স্বাদ অপূর্ব লেগেছে।

রঙমালা ভক্তির অবাক্ কথার জবাব দেওয়ার আগেই ভক্তির মা লতিকা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রঙমালাকে ডাকলেন— রঙমালা, এদিকে এসো তো মা। তোমাকে একটা কথা বলবো।

ভক্তি জানে মা কি কথা বলবে। তাই ভক্তি বললো —চলো, মা কি বলেন শুনে আসি।

ভক্তি যে কথা রঙমালাকে শুনিয়েছিল ভক্তির মা লতিকা দেবী সে কথা বলে রঙমালাকে বললেন— তোমার মাকে জিজ্ঞেস করবে এই আঁচার কেমন করে তৈরী করেছে। কি কি মশলা দিয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে আমাকে জানিও। সামনের বড়ির মরশুমে ভাল জাতের বড়ি সংগ্রহ করিয়ে আমিও আঁচার বানাবো।

রঙমালা বললো— মাসিমা, গতকাল বিকেলে আকাশ খুব মেঘ কালো ছিল তাই মা ঝড়বৃষ্টির আশংকা করে আমাকে বাড়ী থেকে বের হতে দেন নি।

বুদ্ধিমতি লতিকা দেবী বুঝতে পারেন মা কালীই কৃপা করে এই জিনিষ ভক্তিকে এনে উপহার দিয়েছেন। তাই দ্বিতীয়বার ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা না করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন —রঙমালা, খেয়ে এসেছো তো ?

— হ্যাঁ। আমাদের তো খুব ভোরে রান্না হয়ে যায়। ভোর হবার কিছু সময়ের মধ্যেই বাবা খেয়ে দেয়ে কাজে যোগ দেয়। আমরাও খেয়ে ফেলি।

— আজ কি খেয়েছ ?

— গোদক আর কুইচ্যা মাছের ঝোল।

গোদক উপজাতি সমাজের প্রিয় খাদ্য। বিভিন্ন সব্জী, সিঁদল, জুমের কাঁচা

লংকা কাঁচা বাঁশের চোঙে সব্জী কাঁচা লংকা, সিঁদল শুটকি এবং সামান্য জল দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তার পর একটা সরু লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে সবকিছু সুন্দরভাবে মিশিয়ে যে তরকারী তৈরী করা হয় সেটাই গোদক। আর কুইচ্যা মাছ দেখতে অনেকটা সাপের মতো। জল কাদার গর্তে বিশেষ করে ধান ক্ষেতের আইলের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। সরু লোহার শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে সেই মাছকে গর্তের মুখে চলে আসতে বাধ্য করা হয়। তখন গর্তের মধ্যেই ধরা হয়।

শান্তনু বললো — মাতাজী, আপনি এতসব কেমন করে জানলেন ?

—আরে ত্রিপুরায় বাস করি, ত্রিপুরার উপজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং খাবার দাবার কথা না জানলে যে ত্রিপুরাকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন উপজাতির বাস। তারা বিবিন্ন পশুর মাংস শুঁকিয়ে শুটকি করে রেখে দিতো। বর্ষাকালে যখন শিকার করা মুশকিল হতো কিংবা যেদিন শিকার পাওয়া যেতো না সেদিন শুঁটকি মাংস কিছুক্ষণ গরম জলে ভিজিয়ে নরম করে নিতো। তারপর কঁচিবাঁশ পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যেতো সেই ছাই মেশানো জল ন্যাকরায় ভালো করে ছেঁকে নিয়ে সেই মাংসের ঝোল হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেই জলকে ক্ষারপানি বলা হয়। ক্ষারপানি শুধু তরকারীতেই ব্যবহার হতো না জামাকাপড় পরিস্কার করতে সোডা হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। শামুকের খোসা পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় সেই ছাই সামান্য জলে মিশিয়ে চুন হিসেবে উপজাতির লোকেরা এখনো ব্যবহার করে থাকে।

শান্তনু, কলির মানুষ খুবই ভাগ্যবান। বৈদিক যুগে খুব কম সংখ্যক রাজারই বিমান ছিল। দেবগণের সকলেরই যার যার বিমান এবং বাহন ছিল। তারা মুহূর্তে সব স্থানে যেতে পারতেন। যে কোন রূপ ধারণ করতে পারতেন। এখনো দেব সমাজ সেই বিদ্যার অধিকারী রয়েছেন। রাক্ষস ও দৈত্যরাও দেবগণের মতো সব বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দেবগণের সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক। দেবগণ অমর। অমৃত খেয়ে তাঁরা সুক্ষ্ম দেহের অধিকারী হয়েছেন। রাক্ষস, দানব, মানুষসহ সমস্ত জীবজগৎই মরনশীল। দু'-একজন মহাপুরুষ সাধন বলে অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। তারা দেবগণের মতো শুক্ষ্মদেহে সর্বত্র চলাচল করতে পারেন। রূপ ধারণ করতে পারেন। কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছেও অপরাজেয় রয়ে গেছেন। অর্থাৎ মৃত্যুকে তারা জয় করতে পারেন নি। তাই মানুষ ও জীব জগৎ মরনশীল। দেব-দেবীগণ অমর।

কয়েক বছর ত্রিপুরাবাসী খুব শান্তিতেই ছিলেন ত্রিপুরায় কোন মুসলমান আক্রমণ ঘটেনি। কমলাসাগর কালী মন্দিরে দূর দুরান্ত থেকে ভক্তেরা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ছুটে আসতেন বিভিন্ন কামনা বাসনা নিয়ে। দীঘির পাড়ে দুই বটগাছের শিকড় ও ডালে লাল কাপড় বেঁধে দিয়ে যেতেন। গঙ্গাধর পন্ডিত তখন আর জীবিত নেই। টিল্লার উপর

গঙ্গাধর পন্ডিতকে সমাহিত করা হয়েছিল। তিনি অসুস্থ হবার পর কল্যাণদেব জয়ন্তকে পূজোর দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন ।

জয়ন্ত একজন সাধক। সাধন ভজন নিয়ে সারা সময় কাটিয়ে দিতো। সে কারণে কল্যাণদেবকে সে বলেছিল তার বৈমাত্রেয় ভাই চন্দন ঠাকুরকে পূজোর দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। চন্দন বাড়ীতে পূজার কাজ করতো। কল্যাণদেব জয়ন্ত ঠাকুরের কথা মেনে নিয়েছেন চন্দন ঠাকুরকে পূজোর দায়িত্ব দিয়েছেন। ভক্তি বড় হয়েছে। ভক্তির বিয়ের আলাপ শুরু করতেই একদিন মা কালী স্বপ্নে কল্যাণদেবকে দেখা দিয়ে বললেন— কল্যাণ, তুই ভক্তির জন্য পাত্র খোঁজার চেষ্টা করিস না। সে আমার অংশে জন্ম নিয়েছে। পরমা ভৈরবী। তাকে ব্রহ্মচারিণী হিসেবে জয়ন্ত ঠাকুরের সঙ্গে সাধন ভজন করার সুযোগ দিলে তোদের সার্বিক কল্যাণ হবে। সামনে ত্রিপুরার উপর দিয়ে এক ভয়ানক ঝড় বয়ে যাবে। সেই ঝড়ে বহুলোক হতাহত হবে। কিন্তু তোর ভাগ্য খুলে যাবে। জয়ন্ত আর ভক্তি চলে যাবে ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমে । সেখানে তাদের সাধন ভজন করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব তোকেই নিতে হবে । তুই তোর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণ করার আগে ভক্তির মতামত গ্রহণ করিস। ভক্তিকে আমি সে ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছি।

কৈলাগড়, সাভারমুড়া গড়, বিশালগড় এই তিনটি গড় মুসলমান আক্রমণের প্রথম লক্ষ্যে পরিণত হয়। কল্যাণ বড় ছেলে গোবিন্দকে উদয়পুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দ এক হাজারী সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলো। সুদর্শন, মিষ্টিভাষী, যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ এবং ধর্মপ্রাণ যুবক। মহারাজ যশোধর মাণিক্য গোবিন্দকে খুব স্নেহ করেন। রাজকুমারী গুণবতীকে এই নবীণ সেনাপতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেন।

পচিশ বছরের যুবক গোবিন্দ । চম্পাবতী সুন্দরি। দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণা এবং শিল্পকলায় পারদর্শী। তিনি খুব ভালো কাপড় বুনতে পারতেন। মহারাজ যশোধর মাণিক্য এবং রাণী হৈমবতীর পরণের কাপড় রাজকুমারী চম্পাবতী হাতে তৈরী তাঁতে বুনতেন। সেজন্য তাকে গুণবতী বলেও ডাকা হতো। রাজা কল্যাণদেব এর কাছে দূত পাঠালেন রাজধানীতে আসার জন্য। ডাক পেয়ে সপরিবারে কল্যাণদেব রাজধানীতে এলেন। ভক্তিও চলে এলো। জয়ন্ত সাধন ভজন নিয়েই অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। ছোট ভাই চন্দন ছোটবেলায় মায়ের হাতে দাদাকে লাঞ্ছিত হতে দেখেছে। তখন মনে হতো মা দাদাকে আরো কয়েক ঘা দিলে ভালো হয়। দাদাকে খুব হিংসে করতো। পুরোহিত হিসেবে মন্দিরে যোগ দেওয়ার পর চন্দন দাদা জয়ন্তর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছে তাতে তার ধারণা হয়েছে মহাসাধক দাদাকে কষ্ট দিয়ে মা পরজন্মের জন্য সীমাহীন শাস্তি জমা করেছেন। দাদার উপনয়ন উপলক্ষে মা কৈলাগড় এসে দাদার মহত্বের পরিচয় পেয়েছেন। দাদার প্রতি মমতাময়ী হয়ে উঠেছেন। মা দাদাকে একবারের জন্য বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসতে বলেছিলেন, দাদা মায়ের মন্দির ছেড়ে এক রাতের জন্যও

কোথাও যেতে রাজী হননি। মায়ের ভাগ্যে দাদাকে আর একবেলাও রান্না করে খাওয়ানোর ভাগ্য হয়নি। ছোট বেলার কথা মনে হলে দাদার জন্য খুব কষ্ট বোধ করে চন্দন।

কল্যাণদেব রাজধানীতে এসেই মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছেন। সঙ্গে ভক্তি আর লতিকা দেবী। মহারাজ যশোধর মাণিক্য কয়েক বছর আগে দু'দিনের জন্য ভক্তিকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভক্তিকে দেখে আশ্রমের মহন্ত অমিয় চৈতন্য সরস্বতী মহারাজ যশোধর মাণিক্যকে বলেছিলেন মেয়েটির কপালে ত্রিশূল চিহ্ন রয়েছে। মেয়েটি জন্ম সিদ্ধা। ত্রিপুরার সৌভাগ্যের প্রতীক।

এবার যখন ভক্তি এলো তখন সে পূর্ণ যৌবনা। অপূর্ব লাবণ্যময়ী, কিন্তু সন্ন্যাসিনী। যশোধর মাণিক্য ভক্তির জন্য অন্দর মহলে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন।

মাতাজী মুহূর্ত থামলেন। ঘটনা মনে করলেন। তারপর বললেন শান্তনু, ত্রিপুরার রাজগণ দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ন ছিলেন। মহারাজ ধন্য মাণিক্যের সময় থেকেই ত্রিপুরায় ভক্তিবাদের এক জোয়ার এসেছিল। গত পঁচিশ ত্রিশ বছরে ভক্তির প্লাবণ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ স্বার্থপর হয়ে গেছে।

তোমাকে তো বলেছি মহারাজ অমর মাণিক্য ভাগ্য বিপর্যয়ে এবং ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ হিতৈষী রাজ হিতৈষী আপন শ্যালক ছত্রজিৎ নাজিরকে হত্যা করানোর পর নিজেই আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তখন তিনি মনুতে ছিলেন। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে তখন মগদের অত্যাচার চলছিল। মগ বাহিনী রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়েই পুরোহিত অম্বিকা প্রসাদ আশ্রমের মহন্ত অদ্বৈতানন্দ গিরির সঙ্গে পরামর্শ করে ত্রিপুরেশ্বরী বিগ্রহ মন্দির থেকে সরিয়ে কুপিলং এক সেবকের বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মগ বাহিনী পুরোহিত অম্বিকা প্রসাদকে বিগ্রহ সম্পর্কে সংবাদ জানতে চাইলে অম্বিকা প্রসাদ বলেছিলেন মহারাজ অমর মাণিক্য বিগ্রহ শুক্ সাগরে বিসর্জন দিয়ে উত্তরে পরিজনসহ পালিয়ে গেছেন। মগ বাহিনী তখন মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে সোনার কলসটিআরাকানে নিয়ে যায়। শুকসাগর থেকে বিগ্রহ উদ্ধার অসম্ভব ছিল।

মহারাজ অমর মাণিক্যের জেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ রাজদুর্লভের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্র রাজধরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। উদয়পুর শহরের সম্পন্ন প্রজাবর্গ মগদের অত্যাচারে সমতল ত্রিপুরায় বিশেষ করে সরাইল, বাকলা, খন্ডল, ভুলুয়া প্রভৃতি রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। মহারাজ অমর মাণিক্যের সময়েই আকবরের আদেশে সেনাপতি মানসিংহ বাংলায় এসেছিলেন। তিনি বাংলা আক্রমণ করে বাংলার ঈশাখাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি সামন্ত রাজাদের পরাভূত করে বাংলা পুনরায় মুঘলদের অধীনস্থ করেন।

রাজধানীর বিশিষ্ট নাগরিকগণ রাজধানী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ায় এবং মহারাজ অমর মাণিক্য ধলাই জেলার মনুনদীতে অস্থায়ী রাজপাট স্থাপন করায় রাজধানীতে অবস্থানরত মগ সৈন্যদের খাবারের সঙ্কট দেখা দেয়। সৈন্যরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে থাকে।

ত্রিপুরায় তন্ত্রবিদ্যার চর্চাও শুরু হয়েছিল মহারাজ ধন্য মাণিক্যের সময় কালে। রাজগুরু লক্ষ্মী নারায়ণ তান্ত্রিক বিদ্যায় সিদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ পন্ডিতের সেবাদাসী ছিলেন বলাগমা নামক এক আদিবাসী যুবতী। বাবার চেয়েও বেশী যত্ন করতেন পণ্ডিতকে। পন্ডিত খুশী হয়ে বলাগমাকে কিছু তন্ত্র বিদ্যা দান করেছিলেন। বলাগম্য শত্রু পক্ষকে তন্ত্রবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত করতে পারতেন। মহামারী, বসন্ত প্রভৃতি রোগ শত্রুপক্ষের সৈন্যদের উপর দু-বার প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজধানী দখল করেও দীর্ঘকাল শত্রুরা রাজধানীতে থাকতে পারেনি। মগ বাহিনী প্রায় দু'বছর পর কলেরা এবং বসন্তে আক্রান্ত হয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে যাবার পর যুবরাজ রাজধর মাণিক্য রাজধানীতে এসে রাজধর মাণিক্য নাম গ্রহণ করে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজগুরু লক্ষ্মী নারায়ণ দু-বার বলাগমাকে দিয়ে মুসলমান সৈন্যদের উপর মহামারী চালান দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে মহারাজ ধন্যমাণিক্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তার পরিজনেরা মনে করেন হয়তো রাজগুরু কোন কারণে রাজার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মহারাজের উপর বসন্ত রোগ চালান করে দিয়েছেন। মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ গোপনে রাজপণ্ডিতকে হত্যা করান। মহারাজ তখন রোগ শয্যায়। রাজগুরুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করানোয় তিনি খুবই মর্মাহত হন। রাজগুরু লক্ষ্মী নারায়ণ মহারাজকে আপন সন্তানের চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন। রাজগুরুর হত্যার তিনদিন পরই বসন্তরোগে আক্রান্ত মহারাজ ধন্যমাণিক্য প্রাণত্যাগ করেন। প্রিয় ভক্ত ধন্যমাণিক্যের মৃত্যুতে পীঠদেবী ত্রিপুরেশ্বরীও কেঁদেছিলেন। পুরো একদিন দেবীর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। দেবীর ঐ অবস্থা দেখে মহন্তের পরামর্শে পুরোহিত একদিন মন্দিরের দরজা বন্ধ রেখেছিলেন।

তন্ত্রবিদ্যা বলাগমার শিষ্য পরম্পরায় চালু ছিল। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের পরও সেই বিদ্যা মুসলমান সৈন্যদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল।

মহারাজ রাজধর মাণিক্য ছিলেন পরম ভক্ত। তিনি রাজসভাকে ধর্মীয় সভায় পরিণত করেছিলেন। রাজধর মাণিক্য ছিলেন ১৫৪তম রাজা। তিনি ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। আরাকান রাজ বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে মহামারী রোগের হাত থেকে রেহাই পেতেই উদয়পুর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজধরের রাজ্যাভিষেকের কাজ সম্পাদন করেছিলেন রাজ পুরোহিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য। রাজ অন্তপুরে অবস্থিত ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন বিরিঞ্চি নারায়ণ এবং রঘুনাথ বাচস্পতি। রঘুনাথ বাচস্পতির পুত্রের নাম ছিল গঙ্গাধর বাচস্পতি। কমলসাগর কালী মন্দিরের পুরোহিতের নামও ছিল গঙ্গাধর ব্যাকরণ তীর্থ। গঙ্গাধর ব্যাকরণ তীর্থ আর রঘুনাথ বাচস্পতি ছিলেন পরস্পরের বন্ধু এবং প্রায় সমবয়সী। কলমাসাগরের পুরোহিত গঙ্গাধরের মৃত্যুতে রঘুনাথ পণ্ডিত অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন।

মহারাজ অমর মাণিক্যের সময় থেকেই সপ্তাহে এক দিন ধর্ম সম্মেলন হতো।

রাজসভায় দুশোজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হাজির হতেন। রাজধানীতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তাদের প্রাত্যহিক ব্যয়ের টাকা রাজকোষ থেকে সরবরাহ্ করা হতো। সেই ব্রাহ্মণেরা রাজধানীর আশপাশ অঞ্চলেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। মগ সৈন্য চলে যেতেই রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন। বিরঞ্চি নারায়ণ ও রঘুপতি সোনার ভুবনেশ্বরী প্রতিমা গোমতীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মগ সৈন্যরা অন্তপুরের পুকুর সিঁচে রাজপরিবারের বহুলোকের লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন আরাকান নিয়ে গিয়েছিল। রাজভবনের বিভিন্ন কক্ষ খুড়াখুড়ি করে ধনরত্নের খোঁজ করেছিল। মহারাজ রাজধর মাণিক্য রাজা হয়ে রাজ প্রাসাদের মহলগুলো ঠিক করেন। পিতা অমর মাণিক্যের প্রস্তাবিত কাজগুলো শেষ করার প্রয়াস নেন।

রাজধর মাণিক্য বৈষ্ণবদের উপদেশ স্মরণ করে শরণাগত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করেছিলেন। রাজপ্রাসাদের এক কোণে বৈষ্ণবদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল বিরামহীন হরিনাম বজায় রাখা। তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবদের মতোই তিলক ধারণ করতেন। মহারাজকে জনকরাজার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। তিনি কখনো রাজভোগ গ্রহণ করতেন না। বৈষ্ণবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে ভোগ নিবেদন করতেন সেই ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করতেন। ভগবান বিষ্ণুর একটি মন্দির তিনি স্থাপন করেছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রাজধরের রাজত্বকালে কোন বৈদেশিক আক্রমণ হয়নি। আরাকান রাজ এবং ঢাকার নবাবের সঙ্গে সম্পর্ক ভালই ছিল। তিনি জীবিত থাকা কালেই পুত্র যশোধরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে কয়েকজন বৈষ্ণব সহ্ তিনি গোমতী নদীতে দেহ্ বিসর্জন দেন। রাজধর মাণিক্য পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর স্মৃতি মন্দির তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে গোমতী সেই স্মৃতি মন্দিরকে নিজের বুকেই স্থান করে দেন। দেহ্ বিসর্জনের আগে যুবরাজ যশোধরকে রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে রাজ সিংহাসনে বাসিয়ে গিয়েছিলেন। রাজধর মাণিক্যের মতো পূণ্যবান রাজা ত্রিপুরায় আসেন নি। তিনি রাজধানীর সামান্য দুরে মগদের আক্রমণে বিধবস্থ স্থানে নূতন করে একটি গ্রামের সূচনা ঘটিয়ে ছিলেন। জোড়া জাম গাছের জন্য সেই গ্রামের নামাকরণ করেন জামজুড়ি। ঐ এলাকায় প্রজার কল্যাণে একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সেই দীঘির নাম রাজধর দীঘি। রাজধর চিরকাল স্বর্গে স্বর্গসুখ ভোগ করুন এই প্রার্থনা।

যশোধর মাণিক্য যখন সিংহাসনে বসেন তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন আকবর। আকবর ১৬০৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছর তাই শান্তিতেই কেটেছিল। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট হন। পার্বত্য ত্রিপুরা হাতীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সময়েও প্রতিবছর কয়েকটি করে হাতী দিল্লীতে পাঠানো হয়েছিল। যশোধর মাণিক্য কয়েক বছর

হাতী না পাঠানোয় সম্রাট জাহাঙ্গীর ত্রিপুর রাজকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য বিশাল এক সেনা বাহিনী ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক এই সময়েই যশোধর মাণিক্য কল্যাণ দেবকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়েছেন। রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত রাজকুমারী গুণবতীকে হাজারী সেনাপতি ধার্মিক গোবিন্দের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গুণবতীকে যশোধর মাণিক্য মেয়ের মতোই লালন পালন করেছেন। রাজমহিষী হৈমবতীর কোন সন্তান হয়নি। রাজদুর্লভের মৃত্যুর পর শিশুকন্যা গুণবতী মায়ের সঙ্গে রাজপ্রাসাদেই ছিলেন। দুই মায়ের স্নেহযত্নে বালিকা গুণবতী সত্যিই গুণবতী ছিলেন। তার গায়ের রঙ চাঁপা ফুলের মতো ছিল। সেজন্য তার আর এক নাম চম্পাবতী।

মহারাজ যশোধর মাণিক্য দেওয়ানকে বললেন দেওয়ান মশায় সাধু সন্তদের জন্য রাজমহলের ভেতরে যে অতিথি শালা রয়েছে তাতেই ভক্তির জন্য স্থান করে দেওয়া হউক। দেওয়ান সেই মতো ব্যবস্থা করলেন। তিনজন দাসী ভক্তির পরিচর্যার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর রাজদুর্লভ এর কন্যা একজন সখী সহ ভক্তির কামরায় ঢুকলো। দুজনেই সমবয়সী। গুণবতীর পরণে বহুমূল্য পোষাক। আর ভক্তির পরণে গেরুয়া কাপড়।

গুণবতী ভক্তির পা ছুয়ে প্রণাম করতে চাইলো। ভক্তি বাঁধা দিয়ে বললো-- প্রণাম নয় সখি, এসো আলিঙ্গণ করি। মোমবাতির আলোতে দুই যুবতী পাশাপাশি বসলো। ভক্তি এক পলক গুণবতীর দিকে তাকিয়ে বললো তোমার বিয়ে কি ঠিক্ হয়েছে?

—না ভাই। মহারাজ তো শুনেছি পাত্রের খোঁজ করছেন। --- কোথায় কোন যুবকের ঘরে যে আমার অন্ন রয়েছে মা ভুবনেশ্বরীই তা বলতে পারেন। শুনেছি তুমি নাকি অনেক কিছু বলতে পারো। আমার বর কেমন হবে, কোথায় রয়েছে আমার শ্বশুর বাড়ি বলবে?

— সখি, তোমার বিয়ের ফুল কিন্তু ফুটে গেছে। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি খুব শীগগীরই তুমি সাত পাকে বাঁধা পড়ছো। তোমার বর খুব ভালো হবে। কাছেই হবে তোমার শ্বশুর বাড়ি। তুমিও রাজরাণী হবে।

— তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

মহারাজ যশোধর মাণিক্য, লতিকা দেবী মহারাণীর খাস কামরায় মহারাজ যশোধর মাণিক্যের মুখোমুখি আলাদা চেয়ারে বসেছেন। যশোধর মাণিক্য বলেলেন — ভাই কল্যাণ, তোমাকেতো আমি আমার আপন সহোদর হিসেবেই মনে করি। দাদার অকাল প্রয়ানের পর মেয়ে নিয়ে বৌদি রাজ প্রাসাদে চলে এসেছিলেন। সেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম সেনাপতি রণজিৎ নারায়ণের সঙ্গে। রনজিৎ নারায়ণের একমাত্র মেয়ে হচ্ছে গুণবতী। মেয়েটি সর্বগুণেই গুণান্বিতা। আমার ইচ্ছে তোমার বড় ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে গুণবতীর বিয়ে হউক। তোমার সম্মতি থাকলে সামনের শুভ দিনেই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হতে পারে।

—মহারাজ, এতো আমার পরম সৌভাগ্য। যাকে আপনি কন্যার মতো লালন

পালন করেছেন সেই কন্যাকে আমার ছেলের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। আমাদের কোন আপত্তি নেই।

— তাহলে পুরোহিত বাচস্পতি মশায়কেডেকে বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলি। কি বলেন লতিকা বৌদি ? — লতিকা মৃদু হেসে বললো — মহারাজের যেমন ইচ্ছে। বাচস্পতি মশায় পাঁজি দেখে বললেন, শ্রাবণের প্রথমেই একটি ভাল দিন রয়েছে।

— মহারাজ বললেন, তাহলে ঐ তারিখেই বিয়ে হবে।

—মহারাজের যেমন আজ্ঞা। সে তারিখেই বিয়ে ঠিক করা যেতে পারে।

—শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিয়ের দিন ধার্য হলো। মাঝে মাত্র দশদিন সময়। প্রত্যেক সামন্তরাজদের কাছে নেমন্তন্ন পত্র সহ দূত পাঠানো হলো। মহা ধুমধামের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে গোবিন্দের সঙ্গে গুণবতীর বিয়ে হয়ে গেল।

কল্যাণদেব রাজসভায় উপস্থিত হয়ে পুত্র ও পুত্রবঁধূসহ কৈলাগড়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। মহারাজ বললেন— নিয়ম অনুসারে দশ দিনের মধ্যে বর এবং কনেকে কনের বাপের বাড়ি আসতে হয়। আমার বিশ্বাস আপনারও সে নিয়ম জানা রয়েছে।

—হ্যাঁ মহারাজ। আমি সপ্তম দিনে বর কনেকে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দেবো।

— তোমার মেয়ে ভক্তি আরো কয়েকদিন রাজপ্রাসাদে থাকুক এই আমার ইচ্ছে। যদি কোন অসুবিধে না হয়।

—তাই হবে মহারাজ। ভক্তিকে আমি এক্ষুণি এই সংবাদ জানিয়ে দেবো।

কল্যাণদেব পুত্র, পুত্রবঁধূ এবং স্ত্রী লতিকাসহ কৈলাগড় ফিরে গেলেন। ভক্তি থেকে গেলো।

রঘুনাথ বাচস্পতি এবং তাঁর পুত্র গঙ্গাধর বাচস্পতির সঙ্গে ভক্তির আলোচনা হয়েছে। ভক্তি এবং জয়ন্ত কৈলাগড়ের কালীবাড়ীর পুরোহিত গঙ্গাধর ব্যাকরণ তীর্থের কাছ থেকে পুরাণের বহু কাহিনী শুনেছে। ভক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে ভক্তির ভাল ধারণা রয়েছে। ভক্তিদেবী গঙ্গার কৃপা প্রাপ্ত তাই কথায় রঘুনাথ বাচস্পতি ভক্তির কাছে হেরে গেলেন। সন্ধ্যার পর মহারাজ মহারাণীর খাস কামরায় ভক্তিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ভক্তি এসেছে। তার বসার জন্য আলাদা আসন দেওয়া হয়েছে। ভক্তি সেই আসনে বসার পর মহারাজ বললেন— মা, শুনেছি তুমি বাক্ সিদ্ধা। গুণবতী তোমার বাক্ সিদ্ধির কথা আমাদের জানিয়েছে। গুণবতীর সঙ্গে গোবিন্দের বিয়ের বিষয় আমরা স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানতো না। বলতো মা, আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যত কেমন যাবে?

—মহারাজ অনেক সময় অপ্রিয় কথা বলতে নেই। আবার অনেক সময় সংবাদটা অপ্রিয় হলেও সে সংবাদ জানাতে হয়। ত্রিপুরার আকাশে মহা বিপর্যয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আপনার ভাগ্যও বিপর্যয় হতে পারে। তবে ভগবান কৃপা করলে সব বিপত্তি দূর হতে পারে। আমার মনে হয় আপনি রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আপনি নিজে

মা ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা জানালে হয়তো আপনার জীবন রক্ষা পেতে পারে।

গোবিন্দের সঙ্গে গুণবতীর বিবাহের রেশ কাটতে না কাটতেই কল্যাণদেব গুপ্তচর মাধ্যমে খবর জানতে পারলেন যে দিল্লীর মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর দুই বিশ্বস্থ সেনাপতি ইস্পিন্দর খাঁ এবং মির্জা নূরউল্লা খাঁকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পাঠাচ্ছে। ঢাকার নবার মুঘল সম্রাটের অনুগত। ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর উৎসাহেই জাহাঙ্গীর বিশাল সেনা ত্রিপুরায় পাঠাচ্ছে।

ইব্রাহিম খাঁ ত্রিপুর রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে যে যশোধর মাণিক্যকে বারবার তাগাদা দেওয়া সত্তেও যশোধর মাণিক্য প্রতিবছর দশটি হাতী পাঠানোর শর্ত লঙ্ঘন করে চলেছে। ত্রিপুর রাজাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিরোধী। মহারাজ ধন্য মাণিক্যের পর থেকে ত্রিপুরায় সনাতন ধর্ম যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে সমতল ত্রিপুরার মুসলমান সমাজ অসন্তুষ্ট ছিল। তারা একে হিন্দু ধর্মের উত্থান বলেই মনে করতো। সে জন্য হিন্দুদের শায়েস্তা করার জন্যই ইব্রাহিম খাঁ জাহাঙ্গীরকে প্ররোচিত করে ত্রিপুরা দখলের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আগে থেকেই খবর পেয়ে যাওয়ায় ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ, বিষ্ণুর বিগ্রহ, ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহ এবং কৈলাগড়ের কালী বিগ্রহ সরিয়ে ফেলা হলো। কৈলাগড়ের কালী বিগ্রহ আকারে ছোট। কমলাসাগরের দশহাত ভেতরে উত্তর-পূর্ব কোণে বিগ্রহ লুকিয়ে রাখা হলো। আর ভুবনেশ্বরীর বিগ্রহ গোমতী নদীর এক স্থানে লুকিয়ে রাখা হলো। ইস্পিন্দর খাঁ কৈলাগড় আর মির্জা নূরউল্লা খাঁ সাভারমুড়া গড় আক্রমণের দায়িত্ব পেল। তাদের সব রকমের সাহায্য দেওয়ার ভার দেওয়া হলো ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর উপর।

ভক্তি বাবা কল্যাণদেবকে বললো— বাবা, আমি যে শিলাকে কালী বলে পূজা করি সেই শিলা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা চালু রাখা হউক। মুসলমানেরা মূর্ত্তি পূজার বিরোধী। পাথর খন্ডকে তারা কখনো বিগ্রহ বলে মনে করে না। বৌদ্ধরা যখন নিরাকার উপাসনা শুরু করে এবং ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে তখন হাজার হাজার দেব দেবীর বিগ্রহ মন্দির থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ভগবান শংকরের সময় কালে আবার মূর্ত্তি পূজার প্রচলন বাড়তে থাকে। বৌদ্ধরাও কনিস্কের সময় থেকে বুদ্ধের বিগ্রহ পূজা শুরু করেন।

কল্যাণ কন্যা ভক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন — মা, আমরা যাতে এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারি মা কি আমাদের সে শক্তি দিতে পারেন না।

—সবইতো মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। মা মঙ্গলময়ী মা ভালই করবেন। বাবা আমার মনে হয় এই যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় হলেও ত্রিপুরা আবার নূতনভাবে গড়ে উঠবে। এই পরিবর্তনের জন্যই একটা যুদ্ধ প্রয়োজন ছিল। মায়ের লীলা বুঝার সাধ্য আমাদের নেই। তুমি আমাদের সবাইকে দেবীপুর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। পুরোহিত চন্দন ঠাকুর মন্দিরে থেকে প্রতিদিন পূজা বজায় রাখুন। আর জয়ন্ত

ঠাকুরকে উদয়পুর আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। মনে হয় তাতে মঙ্গলই হবে।

— তোমাকে আমরা মায়ের শক্তি বলেই মনে করি। তুমি যা বলেছ তেমনটাই হবে।

— মহারাজকেও বলেছি রাজ্যে হরিনাম আরো বেশি করে শুরু করার জন্য। মুসলমানেরা শীতকালেই ত্রিপুরা আক্রমণ করতে পারে। যদি মনে করো যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত তা হলে বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যু বরণের কোন পরিকল্পনা যাতে কেউ না করেন সে কথা সব সেনাপতিদের জানিয়ে দিও।

— ঠিক আছে।

ভক্তির কথাই ঠিক হলো। পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইস্পিন্দর খাঁ কৈলাগড় আক্রমণ করলো আর মির্জা নূরউল্লা সাভারমুড়া গড় আক্রমণ করলো। ত্রিপুর সৈন্যের তুলনায় মুঘল সৈন্যের সংখ্যা এবং কামানের সংখ্যা প্রায় দশগুণ বেশী। ত্রিপুর সৈন্য সাধারণভাবে বাঁধা দিয়ে পিছু হঠতে থাকলো। ইস্পিন্দর খাঁ কৈলাগড় দখল করে বিশ্রামগঞ্জের কাছে এসে শিবির স্থাপন করলো। রাজধানীর কাছে বর্তমান কিল্লাতে আর চন্দ্রপুরে দুটো সেনা শিবির ছিল। মুঘল সৈন্য যেভাবে দ্রুত এগিয়ে আসছে তাতে আর দুদিনের মধ্যে রাজধানী দখল হয়ে যাবে। প্রজারা অমরপুর এবং তেলমুড়ার দিকে পালাতে শুরু করলো। অনেক প্রজা চলে গেলো অমরপুর।

কল্যাণদেব এর দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথ বাবাকে সহায়তা করার আর বড় ছেলে গোবিন্দের উপর প্রাসাদ রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল। গোবিন্দ স্ত্রী গুণবতীকে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশ্রমে পাঠিয়ে দিলো। মহারাজ যশোধর মাণিক্য তরবারী হাতে না নিয়ে বেশী করে নামকীর্তন করতে লাগলেন।

অবস্থাপন্ন প্রজা এবং রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিবার রাজধানী ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেন।

ইস্পিন্দর খাঁর গোলন্দাজ বাহিনীর গোলায় কৈলাগড় দুর্গের প্রত্যেকটি ছনের ছাউনি ব্যারাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। দেবীপুরে পরিজনেরা চলে গিয়েছিল। সকলেই জানে যে সকল বাড়ীতে একাধিক ঘর রয়েছে, খড়ের বড় গাদা রয়েছে শত্রু সৈন্য সেসব বাড়ীতেই মামলা চালায়। সুন্দর যুবতী ও বধূঁরা পরনে ময়লা কাপড় পরে এবং মুখে হাঁড়ির কালি মেখে মুসলমান সৈন্যদের লালসা থেকে নিজেদের রক্ষা করার প্রয়াস নিতে থাকলো যুবতীরা কেউ গোয়াল ঘরে, কেউ পায়খানায় আত্মগোপনের চেষ্টা করলো। সুন্দরী ও যুবতী মেয়েরা সাধারণ প্রজার ঘরে আত্মগোপন করলো।

মুসলমান সৈন্যরাও জানে সুন্দরী ও যুবতীরা কেমন করে শত্রুদের বোকা বানানোর চেষ্টা করে। তাই একটা অংশ মুসলমান সৈন্যদের লালসার শিকার হলো। ঝড়ের বেগে মুসলমান সৈন্য দেবীপুর, মধুপুর, বিশ্রামগঞ্জ হয়ে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কিল্লা থানা আক্রমণ

করলো। গোবিন্দ মহারাজকে বললো — মহারাজ, শত্রু কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাসাদ আক্রমণ করবে। আপনি মহারাণী এবং পরিজনদের নিয়ে অমরপুরে চলে যান। সেই মতো যশোধর মাণিক্য পরিজনদের কিল্লাগড়ের কয়েকমাইল উত্তরে আদিবাসী জনপদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে হরিনামে বিভোর হলেন। সেনাপতি গোবিন্দদেব প্রাসাদ রক্ষায় প্রস্তুত রয়েছেন। যে কোন সময় শত্রু প্রাসাদে এসে হামলা চালাতে পারে। রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত পরিজনেরা নিজেদের ধন রত্ন লুকিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে।

কল্যাণদেব পিছু হঠতে হঠতে কিল্লায় শেষ বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অনুগত সৈন্যরা কল্যাণদেবকে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করার অনুরোধ জানাতে লাগলেন। বিশ্বস্থ অনুগামীদের অনুরোধে কল্যাণদেব দু'তিনজন দেহরক্ষী সহ গোপনে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে তেলমুড়া অভিমুখে চলে গেলেন।

মহারাজ, মুসলমানদের বাঁধা দেওয়ার অর্থ মৃত্যুবরণ করা। আপনি রাণী মা সহ অমরপুর গমন করুন। আমি রাজপ্রাসাদে থেকে আত্মসমর্পণ করবো। আমার ভাগ্যো যা হবার তাই হবে।

—আমি ঠিক করেছি কীর্তন করে সময় কাটাবো। ভগবান যা করার তাই করবেন।

বৈষ্ণবদের সঙ্গে মহারাজ যশোধর মাণিক্য তখনো কীর্তনে ব্যস্ত। তিনি বুঝতে পেরেছেন মুঘলদের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা মানে লোক ক্ষয় এবং প্রজাদের সর্বনাশ। তাই তিনি মৌখিক আদেশে বলে দিয়েছিলেন যার যার ধন-দৌলত লুকিয়ে রেখে তারা যেন আত্মগোপন করেন। ফলে একে প্রকৃত যুদ্ধ না বলে আত্মরক্ষার সামান্য প্রয়াস হিসেবে ধরে নেওয়াই ভাল। গোবিন্দ এসে হাত জোর করে দাঁড়ালো। কীর্তন বন্ধ হলো। গোবিন্দ বললো মহারাজ আপনার জন্য ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রয়েছে। রাণী মা, আপনি, কয়েকজন সেবক-সেবিকা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি অনুগ্রহ করে চলুন আর দেরী করলে প্রাসাদের ভেতরেই আপনি শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যাবেন। আপনি দয়া করে চলুন। মহারাণী আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহারাজ কীর্তনীয়াদের আদেশ দিলেন কীর্তন চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মহারাজ, মহারাণী, গুণবতী সহ পুররমনীদের এবং একান্ত সেবকদের নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে যখন গোবিন্দ প্রাসাদে ফিরে এলেন তখন মুসলমান সৈন্যদের বিজয় উল্লাস শোনা গেল।

গোবিন্দ প্রাসাদের প্রতিরোধ ছেড়ে দিয়ে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে সৈন্যসহ অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেখানেই মুসলমান সৈন্যরা গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করলো । সাধারণ সৈন্যদের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে জানতে পারলো— গোবিন্দদেব মহারাজ যশোধর

মাণিক্যের জামাতা। ইস্পিন্দর খাঁ ঠিক করলেন গোবিন্দদেবকে বন্দী করে ঢাকা নিয়ে যাবেন। তার উপর যেন অত্যাচার করা না হয় সৈন্যদের সে আদেশ দিলেন। গোবিন্দ একে মায়ের কৃপা বলে মনে করলো। মহারাজ নৌকাযোগে নদীপথে অমরপুরের দিকে যাত্রা করলেন। রাজকাং এ আত্মগোপন করে থাকার ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। মহারাজ অমর মাণিক্য রাজকাং গ্রামেই বড় হয়েছিলেন। সেখানেই মহারাজ আত্মগোপন করে থাকবেন। নদীপথে মহারাজের নৌকা এগিয়ে চললো। নুরউল্লা মহারাজের সংবাদ নিতে গিয়ে গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন নদীপথে মহারাজ অমরপুর যাচ্ছেন। মহারাজকে বন্দী করতে সৈন্য পাঠানো হলো।

মির্জা নূরউল্লা খাঁ উদয়পুর শহরে গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ে শিবির স্থাপন করলেন। আর ইস্পিন্দর খাঁ রাজপ্রাসাদের দখল নিলেন। রাজধানীতে পুরবাসীর ঘরে যে সব খাবার মজুদ ছিল সৈন্যরা সেসব সংগ্রহ করে খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগলো। শত শত যুবককে বন্দী করে এনে মুসলমান সৈন্যদের সেবা কাজে নিযুক্ত করা হলো। প্রতিদিন শত শত রমনীর সতীত্ব নষ্ট হতে থাকলো।

মহারাজ দুটো বজরায় করে পরিজনসহ গোমতীর নদী দিয়ে রাজকাং অভিমুখে যাত্রা করেন। স্থলপথে কিছু অনুগামী মহারাজকে অনুসরণ করতে থাকে। অনুচরদের মাধ্যমে মহারাজ খবর পেলেন রাজ প্রাসাদ মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। গোবিন্দদেব বন্দী হয়েছে। নূরউল্লার আদেশে স্থল পথে মুঘল সৈন্য মহারাজকে বন্দী করার জন্য এগিয়ে আসছে।

মহারাজ মহারাণীকে বললেন— মহারাণী, তোমার সঙ্গে গুণবতীসহ কয়েকজন যুবতী রয়েছে। মুসলমান সৈন্যরা এদের ধরতে পারলে শ্লীলতা নষ্ট করবে। সে জন্য আমাদের এক্ষুণি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

মহারাণী এবং অন্য যুবতীরা দামী পোশাক খুলে উপজাতি রমনীদের চিরাচরিত পোষাক পরিধান করে পাশের কোন উপজাতি পল্লীতে আশ্রয় নেওয়া দরকার। মুসলমানেরা দুটো নৌকায় করে জল পথেও এগিয়ে আসছে। নারীদের ইজ্জত বাঁচাতে এখানেই নেমে পড়তে হবে। তারপর আজ বিশ্রাম নিয়ে কাল ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার বিশ্বাস ভক্তি মাতার আশ্রয়ে পৌঁছতে পারলে মুসলমানেরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মহারাণী বললেন— মহারাজ, পতিই সতীর গতি, পতির যে গতি হবে আমারও সে গতিই হবে। আপনাকে ছেড়ে আমি যাবো না।

— মহারাণী এই সময়ে বুদ্ধি অনুসারেই কাজ করতে হয়। ভাবাবেগ এ সময়ে চলে না। আমার স্থির বিশ্বাস ভগবান শ্রীহরি আমায় রক্ষা করবেন। সামান্য দূরে যে গ্রাম দেখা

যাচ্ছে মহারাণী ও সঙ্গীরা সেখানেই আজকে বিশ্রাম নেবে এটাই আমার আদেশ।

— মহারাজের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। মা ত্রিপুরেশ্বরী মহারাজ এবং ত্রিপুরার মঙ্গল করুন। মহারাজকে প্রণাম।

মহারাণী সাতজন অনুগামীসহ পাশের রিয়াং গ্রামে আশ্রয় নিলেন। প্রজাগণ মহারাণীক পেয়ে খুশী হলেন।

মহারাণী ও সঙ্গীদের সেবায় নিয়োজিত হলেন। রাতে পাহাড়া দিলেন। পরদিন ভোরে দুইজন সাহসী যুবক বনের পথে মহারাণী ও সাত সঙ্গীকে নিয়ে ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমের পথে যাত্রা করলেন।

মহারাণী এবং সঙ্গীরা পরদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। মহন্ত অদ্বৈতানন্দ গিরি আশ্রমবাসীদের মহারাণীসহ অন্যান্যদের সেবার কার্যে নিযুক্ত করলেন। পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত মহারাণী ও অন্যদের জল গরম করে স্নান করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। শীতের সন্ধ্যা। গরম জলে স্নান করার পর সবাই একটু সুস্থ বোধ করলো।

আশ্রমে নিরামিষ খাবার দেওয়া হয়। আশ্রমে উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের সব্জী আর রাজবাড়ী থেকে প্রতিদিন বরাদ্দকৃত আতপ চাওলের সঙ্গে ডাল মিলিয়ে খিচুরি রান্না করে পরিবেশন করা হলো। দু'দিনের অনাহারের পর মহারাণী ও অন্যদের কাছে আশ্রমের গরম খিচুরি অমৃত বলেই মনে হলো।

পরদিন ভোর আরতির পর ভক্তি যখন নিজের ঘরে গেলো তখন মহারাণী ও গুণবতী ভক্তির ঘরে ঢুকলো। ভক্তি দাঁড়িয়ে দু'জনকে হাতজোর করে প্রণাম জানালো। চকির উপর কম্বল বিছানো ছিল। দু'জনকে চকির উপর বসতে অনুরোধ করলো। মহারাণী ও গুণবতী কম্বল বিছানো চকির উপর বসলেন। এমন সময় এক দূত এসে আশ্রমে হাজির হলো। মহারাণী ভক্তির ঘরে আছেন শুনে সেখানে এসেই মহারাণীকে প্রণাম জানিয়ে মহারাজ যশোধর মাণিক্যের বন্দী হওয়ার সংবাদ জানালো।

মহারাণী এমনটাই আশংকা করেছিলেন। ভক্তি চকির উপর মহারাণীর পাশেই বসেছে। মহারাণী জিজ্ঞেস করলেন — মা ভক্তি, এরপর মহারাজের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে তা জানার জন্যই তোমার কাছে এসেছি। মহারাজ বন্দী হয়েছেন, আমাকে এই সময় তার পাশেই থাকা দরকার। যাবার আগে তোমার পরামর্শ নেওয়া উচিত সে কারণেই এলাম।

— মহারাণী, ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না। মহারাজ কৃষ্ণভক্ত। মহারাজের রক্ষা করার দায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। মহারাজ অর্জুনের মতো শ্রী কৃষ্ণকে সব সমর্পণ করেছেন। আপনার ভাবনার কিছু নেই। আপনি শান্ত হউন, বিশ্রাম করুন।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সবকিছু সমপর্ণ করার পর ভগবান কেন এমন পরিস্থিতিতে আমাদের ফেলেছেন?

—সে কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বলতে পারতেন। তিনি লীলা ময়, মহারাজকে নিয়ে কোন খেলা খেলবেন তাও তিনিই জানেন। আপনাকে এটুকু বলতে পারি ভগবানে যারা বিশ্বাস রাখেন ভগবান তাদের কোন অকল্যাণ করতে পারেন না। আপনি হয়তো বলবেন— ভগবান ভক্তকে রক্ষা করলে মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই উদয়পুর দখল করতে পারতো না। আমি বলবো মহারাজ যদি যুদ্ধ করতেন তা হলে ত্রিপুরার লক্ষ্যাধিক মানুষের প্রাণ যেতো। কৃষ্ণ ভক্ত মহারাজ প্রাণহানি চান নি। রাজসুখ চিরকাল থাকবে না। এক সময় রাজ সিংহাসন ছাড়তে হতো। নইলে কালের কাছে পরাজয় স্বীকার করে সব কিছু ছাড়তে হতো।

—আমি চাই মহারাজের বিপদের সময়ে মহারাজের পাশে থাকতে। তাকে যদি হত্যা করা হয় আমিও মুসলমানদের কাছে প্রার্থনা জানাবো মহারাজকে হত্যা করার আগে যেন আমাকে হত্যা করা হয়। আমাদের জন্য ভাবনা নেই। গোবিন্দও বন্দী হয়েছে। গোবিন্দ যুবক। গোবিন্দের জন্যই আমাদের বেশী ভাবনা।

—দাদার কাছে মায়ের আশীর্বাদ রয়েছে। যতক্ষণ মায়ের আশীর্বাদ দাদার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ দাদার প্রাণ সংশয়ের কোন আশংকা নেই। মহাকালের কাছে আমরা সকলেই পরাজিত। তাই মানুষের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই তিন অবস্থার কথা কোন সাধক কিংবা সাধিকার পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। যারা বীর তারা অনেক সময় দৈবকে অস্বীকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। নিয়তিকে রোধ করার ক্ষমতা যে আমাদের নেই তা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই জানেন। তথাপি অহং বশত অনেক সময় সে কথা ভুলে গিয়ে নিজের মনো কষ্ট ভোগ করেন। আপনারা মানসিকভাবে অবসাদ গ্রস্থ। কি করতে হবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। মহন্ত অদ্বৈতানন্দ গিরি মহারাজ সিদ্ধ পুরুষ। আপনার মহন্তজির কাছ থেকেই পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মনে হয়।

মহারাণী, পান্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর কাকে পুরুষোত্তম হিসেবে বরণ করা হবে এই প্রশ্নের সমাধানের ভার দেওয়া হয়েছিল পিতামহ ভীষ্মকে। তিনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে শিশুপাল প্রতিবাদী হন। শ্রীকৃষ্ণকে ভীষণ গালাগাল করেন। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন শিশুপাল তোমার মাকে কথা দিয়েছিলাম তোমার ১০৮টি অপরাধ আমি ক্ষমা করবো। ১০৮টি অপরাধ তুমি করে ফেলেছ এখন সংযত না হলে তোমার বিনাশ নিশ্চিত।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের সাবধান বাণীকে গুরুত্ব না দিয়ে আরো তীব্র ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে গালাগাল শুরু করায় শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা শিশুপালকে বধ করেন। যজ্ঞে এমন ঘটনা ঘটার পর কৌরবদের আমন্ত্রণে রাজা যুধিষ্ঠির শকুনির সঙ্গে শর্ত রেখে পাশা খেলে সর্বশান্ত হন। বার বছরের বনবাস এবং এক বছরের অজ্ঞাত বাসের মেয়াদ পূর্ণ করতে পান্ডবেরা বনে গমন করেন। বহু কষ্ট ভোগ করেন।

বার বছর বনবাস শেষ হলে এক বছর অজ্ঞাত বাস বিরাট রাজার রাজ্যে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।এক মধ্যাহ্নে মধ্যম পান্ডব ভীন জেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলেন— দাদা, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলে মনে করো। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হলে আমাদের ভাগ্যে এত কষ্ট আসছে কেন ? তিনি তো আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারতেন।

গ্রীষ্মের দুপুর। প্রচন্ড সূর্যের তাপ। সকলেই এক বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে কিছুক্ষণ রৌদ্রে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। ভীম তাই করলেন। তারপর বটগাছের ছায়ায় ফিরে এসে ঘাম মুছতে মুছতে দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন— দাদা, আমাকে একটু সময় রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন কেন ?

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন— ভীম, সামান্য সময় রৌদ্রে দাঁড়িয়ে তুমি হাঁফিয়ে উঠেছ। গাছের ছায়ায় এসে আরাম বোধ করছো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বটগাছের মতোই আমাদের শীতল ছায়া দান করছেন না হলে যে পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরেরা রয়েছেন আমাদের বেঁচে থাকাটা খুবই অসম্ভব হতো। যেখানে ভগবান সেখানেই শান্তি। বনে বনে ঘুরেও আমরা যে মানসিক শান্তি ভোগ করছি দুর্যোধনের সেই মানসিক শান্তি নেই।

মহারাণী আপনি প্রতিদিন রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতাপাঠ শুনেছেন। মহারাজও শুনেছেন। আপনাদের মৃত্যু কোন বিধর্মীর হাতে হবে এমনটা আমি মনে করিনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছেতেই মহারাজ যুদ্ধ না করে পালিয়ে এসেছিলেন। ধরা পড়ার পেছনেও নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা এর পেছনে রয়েছে। নিয়তি তথা ভাগ্যকে আমরা কেন ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণও জয় করতে পারেনি। ত্রিভুবন জয় করে, রাবণ বিভিন্ন দেব দেবীকে লংকার রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। যমরাজকে নিযুক্ত করেছিলেন রাবণের ঘোড়ার ঘাস কাটার কাজে। সেই বারণকেও মরতে হয়েছিল। একটা ছোট্ট কাহিনী বলছি শুনুন —

মহারাজ রাবণ বৈমাত্রেয় ভাই কুবেরকে পরাজিত করে লংকা অধিকার করেছিলেন। কুবেবের কাছ থেকে পুষ্পক নামক দিব্য রথ কেড়ে নিয়েছিলেন। দেবগণের কাছ থেকে বর পেয়ে শক্তিশালী হয়ে দেবগণকেই কষ্ট দিতে শুরু করেছিলেন। ত্রিলোকবাসী তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ নিলেন। ভগবান বিষ্ণু রামরূপে জন্ম গ্রহণ করে রাবণকে বধ করে ত্রিভুবন বাসীকে রাবণের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন।

একদিন রাবণ পুষ্পক রথে আকাশ পথে যাওয়ার সময় দেখলেন এক বৃদ্ধ এক নদীতীরে একটি বটগাছের শাখায় বসে দুটো শাখা একত্র করে ছেড়ে দিচ্ছেন আবার একই কাজ করছেন । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই ধরনের কাজ রাবণের মনে কৌতুহল সৃষ্টি করলো। তিনি সেইস্থানে নেমে এলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন— ব্রাহ্মণ, পূজা অর্চনা ফেলে নদীতীরে আপনি একি কাজ করছেন ?

—মহারাজ রাবণ, আমি পাত্র-পাত্রীর বিবাহ ঠিক করছি। আমি যার নাম স্মরণ করে যে পাত্র-পাত্রীর বিবাহ ঠিক করছি তাদের সেখানেই বিয়ে হবে।

—আপনি কে ?

—আমি কর্ম পুরুষ। ভাগ্য বিধাতা।

—আপনি ভাগ্য বিধাতা। হেসে উঠলেন রাবণ। বললেন ত্রিভুবনে আমি যা ঠিক্ করি তাই ঘটে। আমিই ত্রিলোকের ভাগ্য বিধাতা।

—মহারাজ রাবণ, আপনি অহংকার বশতঃ এই কথা বলছেন।

— আমি অহংকার বশতও যদি বলে থাকি তাহলেও এটাই ঠিক্ বলে মনে করবেন। বলুন এই মাত্র যে পাত্র-পাত্রীর মিলন ঘটালেন তাদের পরিচয় কি ?

—মহারাজ, মগধের রাজার মেয়ের সঙ্গে বিদর্ভের রাজপুত্রের বিয়ে হবে। আমি তাদের মিলন ঘটালাম। আজ রাতেই তাদের বিয়ে হবে।

—আমি বলছি তাদের বিয়ে হবে না। আমি ওদের বিয়ে বন্ধ করে দেবো। যে যুবকটিকে বিয়ের পাত্র হিসেবে মনোনীত করেছেন তাকে কেটে মাংস রান্না করে খাবো।

মহারাজ রাবণ সে কথা বলে পুষ্পক রথে বিদর্ভ রাজ্যের রাজপ্রাসাদে গিয়ে দেখলেন রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করা হয়েছে। অতি ব্যস্ততা চলছে। বিয়ের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

রাবণ সেই রাজকুমারকে ধরে রথে তুলে লংকায় নিয়ে এলেন। যুবকটি কান্নাকাটি করছিল। বিদর্ভ রাজপ্রাসাদে কান্নার রোল পড়লো।

মহারাজ রাবণ যুবকটিকে এনে রাণী মন্দোদরীর হাতে সঁপে দিয়ে বললেন— এই যুবকটিকে কেটে মাংস রান্না করবে। দুপুরে মাংস ভাত খাব।

সুন্দর এই যুবকটিকে দেখে মহারাণীর মায়া হলো। তিনি যুবকটিকে একটি সুরক্ষিত ঘরে লুকিয়ে রাখলেন, তাকে অভয় দিলেন তার যাতে অযত্ন না হয় দু'জন দাসীকে তা দেখভালের দায়িত্ব দিলেন।

রাবণ দুপুরে এসে পশুর মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে হাসতে লাগলেন। মহারাণী রাবণকেএর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, রাবণ সব কথা খুলে বললেন। মন্দোদরী বললেন— তুমি সেই হতভাগী কন্যাটিকে আমাকে এনে দেখাও। আমি দেখি ওর কপালে বিধি কেন এমন লিখেছিলেন।

রাবণ গিয়ে উৎসব মুখর বাড়ী থেকে সেই রাজকন্যাকে ধরে এনে মন্দোদরীর হাতে সঁপে দিলেন। মন্দোদরী রাতে সেই রাজকুমার ও রাজকুমারীর মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করালেন। সুসজ্জিত ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বারণ পরদিন সকালে সেই কর্মপুরুষের কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। রাবণই যে ভাগ্য নিয়ন্তা সে কথাও জানালেন। ভাগ্য বিধাতা মৃদু হেসে প্রকৃত ঘটনা রাবণকে

জানালেন। রাবণ সত্যতা যাচাই করতে তখনি ফিরে এলেন প্রাসাদে । মন্দোদরীকে জিজ্ঞেস করে সব জানতে পারলেন। বুঝলেন বিধাতার কাছে সর্বশক্তিমানেরও পরাজয় হয়।

মহারাণী, মহারাজ যশোধর মাণিক্য সাধারণ অপরাধে ভুলয়ার রাজাকে কঠোর দণ্ড দিয়েছিলেন। ত্রিপুরার সৈন্যরা ভুলুয়ার সামন্ত রাজা এবং তাঁর প্রজাদের উপর সামান্য অপরাধে যে অমানুষিক অত্যাচার করেছেন তারই প্রতিফল এখন ভোগ করছেন।

পান্ডবদের বনবাসের সময় একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কথা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন— শ্রীকৃষ্ণ, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করলাম। যজ্ঞ স্থলেই তোমার হাতে শিশুপাল বধ হলো। তারপর আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ায় আমরা কৌরবদের আমন্ত্রণে সর্বনাশা পাশা খেলায় রাজী হলাম। সবকিছু হারিয়ে দ্রৌপদীকে পর্যন্ত পণ রেখে পাশা খেললাম।

যজ্ঞের পর আমাদের ভাগ্যের দরজা বেশী করে খোলে যাওয়ার পরিবর্তে আমরা এমন দুর্দশায় কেন পরলাম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— মহারাজ আপনি যজ্ঞ করতে যে ধন ব্যয় করেছেন তা সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে। সে জন্যই যজ্ঞের বিপরীত ফল আপনি পেয়েছেন। মহারাণী, ভুলুয়ার প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্বক যে ধন সংগ্রহ হয়েছে তার কিছুটা মহারাজ সৎকাজে ব্যয় করেছেন। কিন্তু তার ফল তিনি পান নি। মহারাজ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনে মগ্ন থাকেন তাই রাজপাট হারালেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।

মহারাণী বললেন— ভক্তি, আমি কালই রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে চাই। মহারাজকে ওরা কিভাবে রেখেছে, কোন অত্যাচার চালাচ্ছে কি না তা নিজে দেখতে চাই।

—মহারাণী, ইস্পেন্দর খাঁ খবর নিয়ে জেনেছেন মহারাজের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছেই ছিলনা। তিনি লোকক্ষয় এড়াতে চেষ্টা করেছেন। সেজন্য কম পরিশ্রমে, কম লোক ক্ষয়ে মুঘল বাহিনী ত্রিপুরা দখল করে নিতে পেরেছে এবং মহারাজকে বন্দী করতে পেরেছে এতেই তাদের আনন্দিত হওয়ার কথা। আপনি ভাববেন না। মহারাজের উপর তারা কোন অত্যাচার করবেন বলে মনে হয় না। আপনি মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে রাজপ্রাসাদ যাত্রা করবেন। যাওয়ার আগে অবশ্যই মহন্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

— তাই হবে মা ।

গুণবতী বললো— মা, আমিও আপনার সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে যেতে চাই।

মহারাণী কিছু বলার আগেই ভক্তি বললো— বৌদি, আমার মনে হয় আপনি রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলে দাদার সুবিধার চেয়ে অসুবিধাটাই বেশী হবে। আপনারও অসুবিধে

দেখা দিতে পারে। আমি মহারাণীর কাছে প্রার্থনা জানাবো তিনি যেন আপনাকে আশ্রমে থেকে যাওয়ার আদেশ প্রদান করেন।

মহারাণী বললেন— গুণবতী, ভক্তি ঠিক কথাই বলেছেন। শত্রুপক্ষ তোমার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তোমার সতীত্ব লুট করতে পারে। ভক্তির পরামর্শ মেনে তোমার আশ্রমেই থেকে যাওয়া উচিত। আমি তোমার মা। আমি মহারাজের সঙ্গে যাচ্ছি। তোমার স্বামী গোবিন্দ আমাদের জামাতা। তার যাতে কোন ক্ষতি না হয় মহারাজ এবং আমি তা অবশ্যই দেখবো। শত্রু বাহিনী আশ্রমে এসেও হানা দিতে পারে। তুমি ভক্তির পরামর্শ মতো চলবে এই আমার আদেশ এবং উপদেশ। আমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে আর দেখা হবে কিনা, কতদিন মুসলমান সেনা রাজধানীতে থাকেন তা আমরা জানি না। আমাদের ভাগ্যে কি হবে তাও জানিনা। সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর ছেড়ে দিয়েছি। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাই তোমাদের মঙ্গল হউক। ত্রিপুরাবাসী আবার স্বাধীনতা লাভ করুক সুখে থাকুক।

মহারাজ রাজধর মাণিক্য, যশোধর মাণিক্য নামকীর্তন নিয়েই বেশী সময় ব্যয় করতেন। তিনি প্রায় তেইশ বছর রাজত্ব করেছেন। তার রাজত্বের দুঃখজনক ঘটনা হলো ভুলুয়া আক্রমণ। ভুলুয়া আক্রমণ না করে কোন উপায় ছিলনা। ভুলয়ারাজ নিজেকে স্বাধীন রাজ হিসেবে ঘোষণা না করলে মহারাজের রাজত্বকালে কোন যুদ্ধই সংঘটিতহতো না।

ত্রিপুর বাহিনী ভুলায়ার নিরীহ মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছে সেই পাপের ফল সৈন্যরা ভোগ করছে। মহারাজ ভুলুয়া বাসীদের দুর্দশার কথা শুনে কতদিন রাতে ঘুমুতে পারেননি। তিনি ভুলায়াবাসীর দুঃখে বুক্ চাপরিয়েছেন। রাজার দোষে প্রজা কষ্ট পায়। ভুলায়ার রাজার অহংকার ভুলায়ার প্রজাদের দুঃখের কারণ হয়েছিল। ভুলায়াবাসীদের দুঃখের কথা মাথায় রেখেই মহারাজ এবার যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেননি। তবে সেনাপতি কল্যাণদেব শক্ত হাতে ত্রিপুর বাহিনীকে শান্ত করার চেষ্টা না করলে ভুলুয়ার আরও বহু প্রজার সর্বনাশ হতো।

ভুলায়ার যুদ্ধে যাওয়ার আগে কল্যাণদেব কালীমন্দিরে প্রণাম করতে এলে ভক্তি বলেছিল— বাবা, সাধারণ মানুষের যাতে কম ক্ষতি হয় তুমি তা দেখো। সৈন্যদের একটা অংশ সর্বদাই পরাজিতদের উপর অত্যাচার চালায়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যুদ্ধে জয়ী হলে সৈন্যদের একটা বড় অংশ লুটতরাজ চালিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদলাতে চেষ্টা করে। ত্রিপুরার সৈন্যরাও তাই করেছে। বুদ্ধিমান কল্যাণদেব ভুলুয়ারাজকে বন্দী করেই যুদ্ধ বন্ধের আদেশ জারী করেছিলেন। ভুলুয়ারাজও প্রকাশ্যে তার অনুগতদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছিলেন — ভুলুয়ার কোন সৈনিক যেন ত্রিপুরার কোন সৈনিকের উপর অস্ত্র প্রয়োগ না করেন।

ভুলায়ারাজকে উদয়পুর নিয়ে আসার পর মহারাজ ভুলুয়ারাজকে পরম সমাদরে প্রাসাদের অতিথি শালায় স্থান করে দিয়েছিলেন। ভুলুয়ারাজ মনে করেছিলেন ধার্মিক রাজা তার বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। কল্যাণদেব বিচক্ষণ সেনাপতি। না হলে ভুলুয়ার সৈন্যরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো।

ভুলায়ারাজ মহারাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ভুলুয়া রাজকে ভাই সম্বোধন করে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। শুনেছি এই ভুলায়ারাজই ঢাকার নবাবের মারফত মুঘল সম্রাটকে ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেছে। ত্রিপুরাবাসীর প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে সে নিজের বিপদও ডেকে এনেছে। মুসলমানেরা কখনো হিন্দুর প্রতি ভালবাসার মনোভাব দেখায় নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভুলুয়ারাজাকে ক্ষমা করুন। আমি যাই মহন্ত মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

ভক্তি মহারাণীকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। মহারাণী বাঁধা দিয়ে বললেন— তুমি ব্রহ্মচারিণী। তুমি আমাদের সকলের নমস্য, তোমাকে আমার প্রণাম।

অদ্বৈতানন্দ গিরি মহারাজ ভক্তির পরামর্শ মতোই কাজ করার জন্য মহারাণীকে পরামর্শ দিলেন। মহারাজ যেন কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত না হয়ে পড়েন মহারাণীকে বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন— মহারাণী, শত্রুরা বিশেষ করে বিজয়ী সৈন্যরা পরাজিত সৈন্যদের উপর সর্বদাই অত্যাচার চালিয়ে থাকে। জীবন রক্ষার জন্য সেই অত্যাচারকে অনেক ক্ষেত্রেই উত্তেজিত না হয়ে সহ্য করে নিতে হয়। আপনি মহারাজকে ধৈর্য হারা না হতে পরামর্শ দেবেন। শত্রুপক্ষ বেশীদিন ত্রিপুরায় থাকতে পারবে না। মা ত্রিপুরেশ্বরী শত্রুদের বিতাড়িত করবেনই। মা আপনার মঙ্গল করুন।

ভক্তি মাতা সরস্বতী কিছুক্ষণ চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন। হয়তো ঘটনাবলী মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন— শান্তনু, মহারাণী ধরা দেবার পর প্রায় এক মাস সময় মহা আনন্দে রাজপ্রাসাদে কাটিয়ে মির্জা নূরউল্লার উপর রাজধানীর ভার দিয়ে ইস্পিন্দর খাঁ মহারাজ, মহারাণী, গোবিন্দ, কিছু সেবক সেবিকা এবং পঁচিশটি হাতী সহ ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অধিকাংশ মুঘল সৈন্যই রাজধানীতে থেকে গেলো। মির্জা নূরউল্লা খাঁ ত্রিপুরার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর একটি নগরী নিজের নামে প্রবর্তন করলেন। গ্রামের নাম হলো মির্জা। এখনো সে নামেই মির্জা পরিচিত রয়েছে। মির্জাতে একটা মসজিদও তৈরী করিয়েছিলেন তিনি। ত্রিপুরায় ক্ষমতার পালা বদলের পর মির্জার মুসলমানরা ঢাকায় ফিরে গিয়েছিল। মসজিদ প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ধংস হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকার নবার মহারাজ, মহারাণী, গোবিন্দ, হাতী, দাস-দাসী সবই দিল্লীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় চারমাস পর তারা দিল্লীতে পৌছলেন.

দিল্লীতে সাতদিন থাকার পর সম্রাট জাহাঙ্গীর ত্রিপুররাজ ও তার সঙ্গীদের রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। ত্রিপুরার মহারাজার বিচার শুরু হলো।

দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের বন্দী শালায় মহারাজ যশোধর মাণিক্যের সঙ্গে পরিচয় হলো বৈষ্ণব দাস গোস্বামীর সঙ্গে। বৈষ্ণবদাস গোস্বামী বন্দী শালায় রাতের বেলায় সুমধুর কণ্ঠে কৃষ্ণ ভজন গাইছিল। মহারাজ যশোধর মাণিক্য পথশ্রমে এবং ভাগ্য বিপর্যয়ে ক্লান্ত। তবুও কৃষ্ণ ভজন শুনে আর বসে থাকতে পারলেন না। গায়কের পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— গোঁসাই প্রণাম। আপনার গান শুনে আর ঠিক থাকতে পারলাম না। আপনার মতো পরম বৈষ্ণব এবং গায়কের বন্দী দশা কেন ?

— সবই রাধারাণীর কৃপা।

— সেতো বুঝলাম। অপরাধটা কি

—আপনার পরিচয় জানি না। তবুও কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট হয়ে যখন এসেছেন তখন অবশ্যই কৃষ্ণ ভক্ত। আমার গুরুদেব ভারত বিখ্যাত গায়ক পরম ভক্ত হরিদাস গোস্বামী। হরিদাস গোস্বামীর প্রধান শিষ্য ছিলেন ভারত বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ তানসেন। শুনেছি তিনি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারতেন। গাছে ফুল ফোটাতে পারতেন আবার আগুণও জ্বলতো তার গানে। তানসেন এর গানে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবরের কন্যা তানসেনকে বিয়ে করতে চাইলেন। ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়লেন তানসেন। দু'জনের বিয়ে হয়ে গেলো। বৈজুবারার প্রেমের বাঁধনে তানসেন বাঁধা পড়লেন। হলেন মিঁয়া তানসেন।

তান সেন এর মুখে গুরু হরিদাস গোস্বামীর কথা শুনে সম্রাট আকবরের ইচ্ছে হলো গোস্বামীকে দর্শন করার। গান শোনাব। তিনি গোস্বামীর আশ্রমে লোক পাঠালেন। গোস্বামী প্রভু সবিনয়ে দূতকে জানালেন যে তিনি শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারাণীকে খুশী করার জন্য গান করেন। সম্রাটের যদি তার গান শোনার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে তিনি যেন কৃপা করে বৃন্দাবনে তার কুটীরে গিয়ে গান শোনে আসেন।

দূত এসে সভায় সম্রাটকে সে সংবাদ জানানোর পর সভাসদগণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এক ভিখারী কাফেরের এত বড় স্পর্ধা! কয়েকজন সভাসদ উত্তেজিত হয়ে সেই ভিখারী কাফেরকে বন্দী করে রাজ সভায় হাজির করার অনুমতি চাইলেন। কোন সভাসদ সেই কাফেরকে হাতীর পায়ে পিষে মারার অনুমতি চাইলেন।

সম্রাট কিছুক্ষণ মৌণ থেকে সভাসদদের বললেন সে ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দিন। সভাসদগণ চুপ করে গেলেন। একদিন সম্রাট গোপনে ছদ্মবেশে রাজা বীরবলকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাস গোস্বামীর আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন। গোস্বামীজী তখন আপন মনে ভজন গাইছিলেন গোস্বামীজীর আদেশ ছিল যে কোন লোকই তার কুটি য়ায় আসুন তাদের যেন সমাদরে বসার আসন দেওয়া হয়। আসন বলতে পাটের তৈরী আসন। পুরনো,

ময়লা ও ছেড়া। আমি গুরুর আদেশ মতোই কাজ করতাম।

সম্রাট এবং রাজা বীরবল ছদ্মবেশে এসেছিলেন। আমি তাদের চিনতে পারিনি। রাজা বীরবল আমাকে কানে কানে তাদের পরিচয় দিলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে গোস্বামীকে সে সংবাদ জানালাম। তখন আমি সদ্য যৌবন প্রাপ্ত। সম্রাটকে এত কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি। গোস্বমীজী আমার কাছে থেকে সম্রাট আসার খবর পেয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। কোন ভাবান্তর তার মধ্যে দেখা গেলো না। তিনি গান শেষ করলেন। আসন ছেড়ে উঠলেন। সম্রাটের কাছে এসে জোর হাত করে দেরী করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন— ভজন গান অসমাপ্ত রেখে উঠে আসলে প্রভুর কষ্ট হতো। রাধারাণী বিরক্ত হতেন। আমার আপরাধ ক্ষমা করবেন

সম্রাট বললেন— গোঁসাই, আপনি সত্যিকারের প্রভুর সেবক। আপনার জীবন আপনি প্রভুর চরণে সমর্পণ করেছেন। অন্য যে কোন ব্যক্তি আমার আসার খবর পেলে তৎক্ষণাত আমার সেবায় নিযুক্ত হতেন। আপনাকে আমি আপনার আশ্রম সহ এই এলাকা আপনাকে দান করার জন্য বলে দেবো।

—সম্রাট মহানুভব। বিষয় বাসনায় আমাকে জড়ানোর যে আদেশ সম্রাট দিয়েছেন তা যদি তিনি প্রত্যাহার করে নেন তা হলে আমি সম্রাটের কাছে কৃতার্থ থাকবো। আপনি আশ্রমের জন্য গ্রাম দান করলে বিষয়ে আসক্তি আসবে। সম্রাট আমার প্রতি সদয় হুউন। সম্রাট বললেন— আপনার মতো কৃষ্ণ ভক্তের দর্শন পেয়ে আমি ধন্য হলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে দীর্ঘায়ু দান করুন। সম্রাট মুগ্ধ হয়ে ফিরে এলেন। সম্রাটের শাসনকালে হিন্দুরা যেমন স্বাধীনতা ভোগ করতেন জাহাঙ্গীরের সময়ে তেমনটা নেই। গোস্বামীর ঘর ছোট। আমি যে ঘরে থাকতাম সে ঘরেই থাকি। সেই ছোট্ট ঘরে গোস্বামীকে সমাধী দিয়েছিলাম। সেই সমাধিতে ফুল, উৎসর্গ করি। ধুপ আর প্রদীপ দেখাই। গান গেয়ে ভিক্ষা করি। ভিক্ষা করে যা পাই তা প্রভু ও গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে প্রসাদ পাই। কয়েকদিন আগে এক সরাইখানার সামনে ভজন গান করছিলাম। এক সৈনিক আমায় ধরে নিয়ে এলো। জোরে গান করাতে মুসলমান নাগরিকদের নাকি অসুবিধে হচ্ছে। আল্লার নাম ছাড়া অন্য কোন ভগবানের নাম শোনা নাকি তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। প্রভু জানেন সম্রাট আমার প্রতি কেমন ব্যবহার করেন।

—ভক্তকে রক্ষা করা ভগবানের কাজ। ভক্তের অমর্যাদা হলে ভগবানের নামের কলঙ্ক হবে। আপনি নিশ্চিত থাকুন আপনার কোন শাস্তি হবে না।

অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে রাজসভায় রাজা যশোধর মাণিক্য, গোবিন্দ এবং বৈষ্ণবদাস গোস্বামীকেও হাজির করা হয়। প্রথমেই বৈষ্ণবের অপরাধ সম্পর্কে সম্রাট জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। একজন সভাসদ গোস্বামীর অপরাধের কথা প্রকাশ করেন। জাহাঙ্গীর

বললেন— সম্রাট আকবর যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সেই মহান সাধকের শিষ্যের প্রতি দুর্ব্যবহার করা রক্ষীর উচিত হয়নি। হিন্দুস্তানে হিন্দুদের ধর্মাচারণে বাঁধার সৃষ্টি করলে মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুস্তান শাসন করা অসম্ভব হবে। এই বৈষ্ণবকে সসম্মানে তার কুটিয়ায় ফিরে যতে দেওয়া হউক এবং প্রতিদিন তাঁর এবং তার দু'জন অতিথির সেবার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন সে পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক। গোঁসাইর কাজ হবে সঙ্গীতের মাধ্যমে গুরু ও ভগবানের সেবা করা। গোস্বামী এবার যেতে পারেন।

বৈষ্ণব দাস গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা হয়ে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলে নাচতে থাকলেন। সম্রাট সাধকের আনন্দ দেখে হাসতে লাগলেন।

এরপর মহারাজের পালা। সম্রাট জানতে চাইলেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্রাটকে দশটি করে হাতী পাঠানো হচ্ছেনা কেন ?

মহারাজ সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন, সম্রাট ত্রিপুরা ছোট রাজ্য। বনের আয়তনও বিশাল নয়। কয়েক বছর দশটি করে হাতী ধরার ফলে বনে হাতীর সংখ্যা কমে গেছে। দু'বছর ধরে মাত্র দুটো করে হাতী পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

—মহারাজের কয়টি হাতী রয়েছে ?

— প্রায় দেড়শো।

— গত দশ বছর ধরেই হাতী ঠিক্ মতো পাঠানো হয়নি। মহারাজ যদি বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে সম্রাটকে এই বছর একসঙ্গে আপনার পালিত হাতীর মধ্য থেকে একশত হাতী দিতে হবে।

—সম্রাট, যদি অভয় দেন তাহলে একটা নিবেদন রাখতে পারি।

—বলুন, শুনেছি আপনিও একজন ভক্ত । যুদ্ধ বিগ্রহ আপনি পছন্দ করেন না।

— সম্রাট ঠিকই শুনেছেন। সম্রাট যে আদেশ দিয়েছেন তা অবশ্যই পালিত হবে। আপনার এই আদেশ বহন করে আমার জামাতা গোবিন্দকে ত্রিপুরায় ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়ার আবেদন রাখছি। আর আমি যেন আমার স্ত্রী ও দুই-একজন সেবকসহ বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে পারি সে আদেশ দানের আবেদনও রাখছি।

—মহারাজ, আমার বাবা সম্রাট আকবর ও ত্রিপুর রাজের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আপনার দুটো আবেদনই মঞ্জুর করা গেল। আপনি আপনার জামাতাকে বলে দিন রাজ্যে গিয়ে যদি একশত হাতী পাঠানোর ব্যবস্থা না করে তা হলে মুঘল বাহিনী ত্রিপুরা ত্যাগ করবে না।

—সম্রাট মহানুভব। আমার কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমার বিশ্বস্থ সেনাপতি এবং আত্মীয় কল্যাণদেবকে রাজসিংহাসন দান করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি আর ত্রিপুরায় ফিরবো না। কল্যাণদেব জীবিত কি মৃত তাও আমার জানা নেই। তাই আপনার সৈন্যগণ

রাজ্য ত্যাগ করার পর প্রজা ও অমাত্যবর্গ যাকে সিংহাসনে বসাবেন তিনিই বসবেন। সম্রাট ঢাকার নবাবকে সেই মতো আদেশ দান করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

— ঠিক আছে অপনার বৃন্দাবন বাসে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আর ত্রিপুরার সেনাপতিগণ যাকে সিংহাসনে বসাতে চায় তাকেই বসাতে পারবে। আপনি এবার আসুন।

মহারাজ সভা থেকে বের হবার পর দেখলেন সেই গোস্বামী মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন—আপনি ভক্ত, আমি জানতাম শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে মুক্ত করবেন। আপনার খবর শোনার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এবার আপনি কোথায় যাবেন বলুন।

— গোঁসাই, আমি ত্রিপুরার রাজা ছিলাম। সম্রাটের কাছে রাজপদ ত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হবার অনুমতি নিয়েছি। গোঁসাই এর আশ্রমের কাছেই কোথাও কুটির বেঁধে বসবাস করবো। সঙ্গে আমার স্ত্রী তথা মহারাণী এবং কয়েকজন সেবক-সেবিকা রয়েছেন তাদের মুক্তির পর আমরা বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করবো।

— দেখুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কেমন লীলা। আমি জন্মসূত্রেই বৃন্দাবনবাসী। আমার পূর্ব চার পুরুষ বৃন্দাবনে আছেন। আপনার যাতে কোন অসুবিধে না হয় সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ কেমন চমৎকার ভাবে আমাদের মিলিয়ে দিলেন।

— ঠিক কথাই গোঁসাই বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বৎসল আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার যাতে বাসস্থান খুঁজতে কোন অসুবিধে না হয় সে জন্য অপনাকে বন্দী শালায় আনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। না হলে এমন অদ্ভুত ব্যাপার হবে কেন ?

— হয়তো তাই হবে। বন্দী হয়ে বন্দীশালায় না এলে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতো না। আপনি ভাববেন না। শ্রীকৃষ্ণ সব ঠিক করে দেবেন।

একজন সৈনিক এগিয়ে এলো মহারাজের দিকে। একটি আদেশ নামা মহারাজকে দিয়ে বললো আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন এই আদেশ নামা মূলে বৃন্দাবনে ইচ্ছামতো স্থানে বসবাস করতে পারবেন। আপনার পছন্দ মতো স্থানে আপনার বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে। আর একশত হাতী দেওয়ার হুকুম নামা দেওয়া হলো। ঠিক মতো ব্যবস্থা করে তারপর বৃন্দাবনবাসী হবেন।

মহারাজ যশোধর মাণিক্য গোবিন্দকে সম্রাটের হুকুম নামা দিয়ে বললেন— গোবিন্দ, যদি তোমার বাবা কল্যাণদেব কুশলে থাকেন তাহলে তিনিই ত্রিপুরার সিংহাসনে বসুন এটাই আমার ইচ্ছে। তারপর জৈষ্ঠপুত্র হিসেবে তুমি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। আমাদের জন্য ভাবতে হবে না। সম্রাটের যে সহানুভূতি পেয়েছি তাতেই আমি খুশি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন বাঁচার ব্যবস্থাও তিনিই করে দেবেন।

— গোবিন্দ বললো— মহারাজ, আমার একটা নিবেদন আছে।

— বলো।

—আমিও বৃন্দাবনে গিয়ে কিছুদিন মহারাজের সেবা করতে চাই।

— সম্রাটের আদেশের কি হবে ?

— আমাদের সেবক ধনিরাম সম্রাটের হুকুম নামা নিয়ে যাবে। আমিও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি রাজ্যে ফেরার চেষ্টা করবো। রাজ্যে নূতন রাজা হবার পর সম্রাটের হুকুম নামা কার্যকর করার প্রশ্ন আসবে। এখনতো ত্রিপুরায় মুঘলদের রাজত্ব চলছে। শুনেছি তারা আমাদের সব হাতী ঢাকার নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মা ত্রিপুরেশ্বরী যা করেন তাই করবেন।

মা ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহ কষ্টি পাথরের তৈরি। মূল্যবান বিগ্রহ। এই মূল্যবান বিগ্রহ যাতে মুসলমানদের দ্বারা বিনষ্ট না হয় তারজন্য ফুলকুমারীতে যদুমোহনের ঘরে লুকিয়ে পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মগ বাহিনী যখন অমর মাণিক্যের সময় রাজধানী দখল করেছিল তখনো বিগ্রহ সাধারণ সেবকের বাড়ীতে লুকিয়ে পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মগ বাহিনী মন্দিরের চূড়ার সোনার কলসটি চূড়া ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। বিগ্রহ এমন গোপনভাবে রাখা হয় যাতে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না জানতে পারে। লোক মুখে প্রচারিত হলে মুসলমান সৈন্যরা বিগ্রহ ধংস করে দেবে।

ভক্তি প্রতিদিন মায়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাচ্ছে একবার মাকে দর্শন করারসজন্য। ভক্তি ব্রহ্মচারীর নিয়ম মেনে সপ্তাহে একদিন ভিক্ষায় বের হয়। ভিক্ষায় যে চাওল পাওয়া যায় সেই ভিক্ষার চাওল অন্য চাওলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়। মহন্তজি ভক্তিকে এরকম নির্দেশই দিয়েছেন।

ভক্তি ভিক্ষায় বের হয়েছে। মুসলমান সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। রাজপথে না চলে গ্রামের পথেই চলছে। কিছুদুর গিয়ে এক হরিতকী গাছের নীচে এক যুবতী বধূঁ বসে আছেন। ভক্তি জিজ্ঞেস করলো — মা, একা বসে আছ কেন ?

— বিশ্রাম নিচ্ছি। মা ত্রিপুরেশ্বরীকে দেখতে যাবো। আনন্দে ভক্তি বলে উঠলো— আমায় নিয়ে যাবে ?

— ঠিক আছে। কারো কাছে এ কথা প্রকাশ করো না যেন। ভক্তি বললেন, না।

যখন মগ বাহিনী উদয়পুর দখল করেছিল তখনো রাজধানীতে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কাঁসর-ঘন্টা, খোল-করতাল বাজানো এবং সংকীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজধানী মুঘল বাহিনী দখল করে নেওয়ার পর যে সকল প্রজা রাজধানীতে থেকে গিয়েছিলেন তারা পূজা পার্বন বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ভক্তি মাতা সেই মহিলাকে বললেন— মা ত্রিপুরেশ্বরীকে একবার দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

—আপনি ব্রহ্মচারীণি। আমার চেয়ে শাস্ত্র সম্পর্কে আপনি অনেক বেশী জানেন। আপনিতো নিশ্চয়ই জানেন প্রাণ তথা পরমাত্মা, তথা যার যার ইষ্টদেব আমাদের হৃদয় মন্দিরেই বাস করেন। পাথরের মূর্ত্তির চেয়ে আপনার হৃদয়ে অবস্থানকারী চিন্ময়ী জগজ্জননী ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের রূপতো কোটি কোটি গুণ সুন্দর এবং মধুর। চিত্তাকর্ষক । ঠিক কিনা বলুন?

—মাতাজী আমরা আমাদের মনকে স্থির রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিমা গড়ে সেই প্রতিমাকে দর্শন করি। সেই বিগ্রহই হৃদয়ে ধ্যান করি। আজ্ঞা চক্রে দর্শন করার চেষ্টা করি। ত্রিপুরেশ্বরী বিগ্রহতে স্বয়ং মা অবস্থান করেন এই বিশ্বাস সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর এবং সকল প্রকার উপাসকদের রয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ দেখতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষুধার কথা জানিয়ে যজ্ঞের অগ্রভাগ দাবী করলেন। ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ ঘোষের সন্তান বলেই ভাবতেন। ব্রাহ্মণেরা তাই শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপ্ বালকদের নিয়ে এবার ব্রাহ্মণীদের কাছে গিয়ে খাবার চাইলেন। ব্রাহ্মণীরা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনেছেন। চোখে দেখেননি। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা শুনে সেরকম রূপেই হৃদয়ে ধ্যান করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘরের সব রান্নাকরা খাবার শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ বালকদের জন্য দিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের নিয়ে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করতে লাগলেন। একদল ব্রাহ্মণী সেই দৃশ্য চোখ মেলে তাকিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন। আর একদল ব্রাহ্মণী শ্রীকৃষ্ণকে সামনে পেয়েও চোখ বন্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধ্যান করার চেষ্টা করতে লাগলেন। যারা শ্রীকৃষ্ণকে সামনে পেয়ে চোখ ভরে শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং খাওয়া দর্শন করলেন তাদের আনন্দ কোটি গুণ বেশী হলো।

পাথরের প্রতিমাকেই আমরা আমাদের মনের মাধুরি মিশিয়ে দর্শন করার চেষ্টা করি। তাই মনে অর্থাৎ হৃদয়ে ত্রিপুরেশ্বরীর রূপ চিন্তা করার চেয়ে বিগ্রহ দর্শনে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। অধিক আনন্দ লাভ করি।

— চলো আগে মাকে দর্শন করি। ফেরার পথে কথা হবে।

পুরোহিত কমলাকান্ত গোপনে মাকে পূজো করছেন। টিলার উপরে চারধারে রিয়াং রমনীগণ বিভিন্ন কাজ করার ভান করে লক্ষ্য রাখছেন মুসলমান সৈন্য এদিকে আসছে কিনা।

মহিলারা ভক্তিকে আশ্রমে দেখেছেন। তাই পথ না আটকে একজন বললো— মাকে দর্শন করতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

— তাড়াতাড়ি মাকে গিয়ে দর্শন করে আসুন। পূজো প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখুনি খর দিয়ে মায়ের বিগ্রহ আবার ঢেকে ফেলা হবে।

ভক্তি ও সেই যুবতী বধূঁ মাকে দর্শন করলেন। কমলাকান্ত তাদের হাতে চরণামৃত ও প্রসাদ তুলে দিলেন। তারপর বললেন— মা, তোমরা দু'জনে এখানে প্রসাদ পাবে। বসো। গল্প করো।

ভক্তি পুরোহিতকে বললো — বাবা, মহন্তজি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি প্রসাদ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন না।

— তিনি সাধক। তুমি যে প্রসাদ পাচ্ছো তা তিনি মানস চক্ষে ঠিক দেখতে পারেন। প্রসাদ বিতরণের সময় তোমরা এসেছ। তোমাদের প্রসাদ না দিয়ে আমি কি করে প্রসাদ গ্রহণ করি বলো? আমিও তো মা অসূর্যম্পর্শার মতো হয়ে আছি। আমি ভোর হবার আগেই স্নান সেরে এখানে ঢুকি। বের হই সন্ধ্যারতির পর মায়ের কাছে ভোগ নিবেদন করে, মারে শয়ন দিয়ে।

—মা মুসলমানদের শুভ বুদ্ধি দিতে পারেন না?

—মা, তারা নিরাকার উপাসনায় বিশ্বাসী। বিগ্রহ পূজা তাদের রিতি বিরুদ্ধ। তারাওতো তাদের বিবেক অনুযায়ী কাজ করেন। ধর্ম অনুযায়ী কাজ করেন।

— সে কথা ঠিকই বলেছেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান কোরাণ অনুযায়ী চলেন। কোরাণের কয়েকটি আয়াতে লেখা আছে কাফেরদের ধ্বংস করতে পারলে বেহেস্তে গিয়ে অনেক সুন্দরীর সেবা পাওয়া যাবে। এমন সুযোগ কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান কি ত্যাগ করবে?

— মা, আমাদের শাস্ত্রে কিছুলোক দুষ্ট বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এমন কিছু রাজনীতি ঢুকিয়েছে যাতে আমাদের সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে আর মুসলমানেরা দীর্ঘকাল ভারত শাসন করতে পারে। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং অমুসলমানদের ধ্বংস করতে কোন কোন মুসলমান নামধারী রাজনীতিক কোরাণের আয়াতে মানবতা বিরোধী কথা হয়তো ঢুকিয়ে দিয়েছে যার ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ চালু রয়েছে।

শুনেছি ধনিরাম নামে যে সেবক মহারাজের সঙ্গে গিয়েছিল যে গতকাল ফিরে এসেছে। মহারাজ তার মাধ্যমে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন তাতে জানা গেছে মহারাজ এবং মহারাণী মায়ের ইচ্ছায় সম্রাটের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছেন এবং বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন। মহারাজ সেনাপতি কল্যাণদেবকে ত্রিপুরার ভাবী রাজা হিসেবে মনোনীত করেছেন। একথা সত্য হলে ত্রিপুরার মানুষের জন্য শুভদিন এগিয়ে আসছে।

— মা ত্রিপুরেশ্বরী মঙ্গলময়ী। তেমনটা হলে সত্যিই ত্রিপুরার জন্য সুখবর।

যুবতী বধূঁটি বললো — আমিও এমন সংবাদই শুনেছি। তবে মুসলমান সৈন্যদের মা স্বয়ং দমন না করলে তারা সহসা রাজধানী ছেড়ে যাবে না।

পুরোহিত কমলাকান্ত বললেন— মা, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমাদের

আবার তান্ত্রিক বিদ্যার আশ্রয় নিতেই হবে।

সত্যবতী, গোবিন্দ যশোধর মাণিক্যের সঙ্গে প্রায় চার মাস বৃন্দাবন থেকে বৃন্দাবনের সব বন, ঘাট, মন্দির দর্শন করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থল দর্শন করে গোবিন্দ নূতন মানুষ হিসেবে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছিল। গোবিন্দের চোখ দিয়েই ভক্তি বৃন্দাবন দর্শন করেছে। গোবিন্দ ভক্তিকে বৃন্দাবন দর্শন করে আসার জন্য অনেকবার বলেছিল। ভক্তি রাজী হয়নি। দাদার কথার একটাই উত্তর দিয়েছে মা ত্রিপুরেশ্বরীকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। ভক্তি সূক্ষ্ম দেহে আজো মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বিরাজমান আছেন। কোন কোন ভাগ্যবান বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রূপে মহা সাধিকা ভক্তিমাতা সরস্বতীর দর্শন এবং কৃপা লাভ করে থাকেন।

বৃন্দাবনের সব লীলা ক্ষেত্রই ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন মথুরায়। কংসের কারা গারে। মূল গর্ভগৃহ মুসলমানেরা দখল করে মসজিদ বানিয়েছে। পাশের অংশে হিন্দু ভক্তরা মন্দির নির্মাণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থলে প্রণাম নিবেদন করেন।

ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীহরির ভক্তের প্রতি কি অপরিসীম করুণা। প্রজাপতি সুতপা আর তাঁর পত্নী পৃষ্ণি ভগবান শ্রীহরির দর্শনের জন্য বার হাজার বছর কঠোর তপস্যা করেন। তাদের তপস্যায় খুশি হয়ে ভগবান শ্রীহরি তাদের দর্শন দান করেন। তাদের বর প্রার্থনা করতে বলেন।

মহাসতী পতিব্রতা পৃষ্ণি ভগবান শ্রীহরির মতো সর্বগুণ সম্পন্ন এক পুত্র প্রার্থনা করেন। ভগবান শ্রীহরি খুশি হয়ে পৃষ্ণিকে তিনবার তথাস্তু বলে বর প্রদান করেন। পরে ভগবান শ্রীহরির খেয়াল হয় একবার তথাস্তু উচ্চারণ করলেই যেখানে চলতো সেখানে তিনি তিনবার তথাস্তু বলে দেবী পৃষ্ণির ভক্তিতে বাঁধা পড়ে গেছেন।

ভগবান শ্রীহরি ভেবে দেখলেন তিনি পুরুষোত্তম। সকল জীবের আঁধার স্বরূপ। তাঁর মতো দ্বিতীয় আর হতে পারেনা। সুতরাং তাকেই আবির্ভূত হতে হবে। তিনি পৃষ্ণির মায়া গর্ভ সৃষ্টি করে দশমাস পর আবিভূত হলেন। তিনি অংশত যে তার ঘরে এসেছেন সে কথা সুতপা ও পৃষ্ণিকে জানালেন। ভগবান শ্রীহরিকে পুত্ররূপে লাভ করে ক্রমে তাদের মনে অহংকার হলো।

দ্বিতীয় জন্মে সুতপা ও পৃষ্ণি ভগবান কশ্যপ ও দেবী অদিতিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান বিষ্ণু দেবগণকে স্বর্গ রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বামনরূপে অদিতির ঘরে আবির্ভূত হন। তিনি উপেন্দ্র এবং বামন এই দুই নামে ত্রিজগতে পরিচিত ছিলেন।

বামনরূপে দান গ্রহণের ছলে মহারাজ বলির কাছ থেকে দানস্বরূপ ত্রিভুবন গ্রহণ করে বলিকে পাতালে রাজত্ব করার আদেশ দিয়ে বলিকে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

পরম বিষ্ণু ভক্ত বলি ভগবান বিষ্ণুকে তার ঘরে সর্বদা বিরাজমান থাকার বর চাইলেন। ভগবান বিষ্ণু বলিকে সেই বর দেওয়ায় ভগবান বিষ্ণু বলির সঙ্গে পাতালে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

ভগবান বিষ্ণুর অবর্তমানে বৈকুণ্ঠ লোক শ্রীহীন হয়ে পড়লো। যেখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেখানেই পতিব্রতা দেবী লক্ষ্মী বাস করেন। ভগবান বিষ্ণু পালন কর্তা। তিনি বলির গৃহে বাঁধা পড়ায় ত্রিলোকে অব্যবস্থা শুরু হলো। দেবগণ দেবী লক্ষ্মীকে ধরলেন এর প্রতিবিধানের জন্য। পতিব্রতা লক্ষ্মী স্বামী বিষ্ণু যা করেন তাই তিনি মেনে চলবেন এই কথা দেবগণকে জানালেন। ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য যদি কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে ভগবান বিষ্ণুকে পাতাল থেকে বৈকুণ্ঠে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মহারাজ প্রহ্লাদ দেব ও দৈত্যদের মধ্যে সুসম্পর্কের প্রতীক স্বরূপ রাখি বন্ধনের প্রচলন করেছিলেন। তিনি দেব ও দৈত্য উভয় গোষ্ঠীকে বুঝিয়ে ছিলেন যে উভয়েই তারা একই পিতা ভগবান কশ্যপের বংশধর। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে তিনলোকের কল্যাণ সুনিশ্চিত থাকবে। কিন্তু, মায়ার প্রভাবে মানুষ ও দেবতা যারই মনে অহংকার আসে তখনি তার পতন ঘটে। দেবরাজ ইন্দ্র বলির পুত্র বিরোচনকে অন্যায়ভাবে বধ করে তিনলোকের অশান্তি ডেকে আনেন। ইন্দ্রকে স্বর্গ ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ভগবান নিজেই ভক্ত বলির প্রাসাদে সেচ্ছাবন্দী হয়ে পড়েছিলেন।

একবার রাখী বন্ধন উৎসবে দেবী লক্ষ্মী পাতালরাজ বলির হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। পরম ভক্ত বলি দেবী লক্ষ্মীকে বললেন— দেবী আপনি আমায় ভাই বলে গ্রহণ করেছেন। ভাই হিসেবে বোনকে আমার কিছু দেওয়া উচিত। আপনি কি চান বলুন।

—দানবীর বলি, তুমি ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত এবং জগতের হিতচিন্তক। ভগবান বিষ্ণু তোমার ভক্তিতে পাতালে স্বয়ং বাঁধা পড়ায় আমিও পাতালে থাকতে বাধ্য হয়েছি। ভগবান বিষ্ণুর অভাবে ত্রিলোকের ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে। এভাবে চললে সৃষ্টি বিনষ্ট হয়ে যাবে। তুমি জগতের কল্যাণে ভগবান বিষ্ণুকে মুক্তি দাও। তুমি যখনি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করবে তখনি আমরা তোমার পাশে এসে হাজির হবো।

— দেবী, আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হউক। ভগবান বিষ্ণু আমাকে যেন চরণ ছাড়া না করেন আপনাদের চরণে আমার এই প্রার্থনা।

ভগবান বিষ্ণু বললেন— ভক্ত বলি, তোমার ইচ্ছে অবশ্যই পূর্ণ হবে। তোমার স্মরণ মাত্রই আমরা তোমাকে দর্শন দেবো। তোমাকে বর দিচ্ছি কলিতে; তুমি পৃথিবী ও পাতাল এই দুই লোকের অধীশ্বর হবে।

সত্যবতী, কুমার গোবিন্দকে বৃন্দাবনের তিনটি স্থান বিশেষ ভাবে প্রভাবিত

করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা স্থল আর দেবী রাধারাণীর অভিমান স্থল মান সরোবর। বৃন্দাবন দর্শন করাতেই কুমার গোবিন্দ ভাই নক্ষত্র তথা ছত্র মানিক্যের হাতে স্বেচ্ছায় রাজ মুকুট তুলে দিয়ে সেচ্ছায় বনবাসে যাওয়ার মতো মহত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। ত্রিপুরাবাসী মহা ভাগ্যবান। মহারাজ ধন্যমাণিক্য, মহারাজ অমর মানিক্য, মহারাজ রাজধর মাণিক্য, যশোধর মাণিক্য, কল্যাণমাণিক্য, রামদেব মাণিক্য , ২য় রত্ন মাণিক্য, রাধা কিশোর মাণিক্য এবং বীরচন্দ্র মাণিক্যের মতো পূণ্যবান রাজাদেব পূণ্যভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

এক সময় পাণ্ডবদের রাজপুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদের ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। ত্রিপুরার ভূমি তখনো ত্রিপুরের অত্যাচারের পাপের ভার ধোয়ে ফেলতে সক্ষম হয়নি। মহারাজ ত্রিলোচন থেকে শুরু করে মহারাজ বীরবিক্রম অবধি রাজগণ ত্রিপুরায় প্রজাদের ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ভারতে যা চলছে তা জরাসন্ধ বা কংসের রাজত্বকালের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সত্যবতী, পৃথিবীতে যখন অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে তখন ভগবান দুষ্টের দমনে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কখনো তিনি অংশ, কলা বা কলার অংশরূপে আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের বিনাশ করেন। আবার কখনো কারো মাধ্যমে দুষ্টের বিনাশ সাধন করেন।

সত্যযুগে ব্যান নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী। তার অত্যাচার থেকে মুনি ঋষিগণও রেহাই পাননি। ব্যানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একবার মুনি সমাজ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। মুনিদের সম্মিলিত আক্রমণে রাজা ব্যান প্রাণ হারান। রাজা ব্যান এর তখনো কোন সন্তান সন্ততি জন্মায়নি। এমতাবস্থায় রাজমাতা মুনি ঋষিদের বললেন— মুনি ঋষিগণ আপনারা জানেন ব্যান এর এখনো কোন সন্তান হয়নি। ক্রোধ বশত আপনারা তাকে হত্যা করায় রাজ্য রাজাশূন্য হয়ে পড়েছে। রাজাশূন্য কোন রাজ্য বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত ব্যানকে হত্যা করায় ব্যান এর বংশ নির্বংশ হয়ে গেল। তার পূর্ব পুরুষগণ পিণ্ডের আশায় মহাশূন্যে মহা অশান্তিতে ঘুরতে থাকবেন। এর বিহিতি আপনাদেরই করতে হবে।

মুনি ঋষিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলেন মৃত ব্যানের দেহকোষ থেকে তার বংশ ধরের জন্ম দেবেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যান রাজার ডান হাত, বাঁ হাত এবং ডান পা থেকে কোষ সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুই পুত্র এবং এক কন্যার সৃষ্টি করেন। ডান হাতের কোষ থেকে যে পুত্রের জন্ম হয় সেই পুত্র ত্রিভুবনে পৃথু নামে পরিচিতি লাভ করেন। বাঁ হাতের কোষ থেকে যে পুত্রের জন্ম হয় তার স্বভারও ছিলো অনেকটা রাজা

ব্যান এর মতো। ডান উরু থেকে জন্ম নেওয়া কন্যা গুণবতী হয়েছিলেন।

আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রক্রিয়াকে ক্লোনড্ পদ্ধতি বলে থাকে। কয়েক লক্ষ বছর আগে ভারতের মুনি ঋষিগণ ব্যান এর শরিরের কোষ থেকে তিন সন্তান সৃষ্টি করেছিলেন। ওরাই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম ক্লোনড্ মানব-মানবী। ধর্ম নিরপেক্ষ নেতারা বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থকে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখায় ভারতের মুনিদের ঐ কৃতিত্বের কথা বিশ্ববাসী জানতে পারেনি। এমনকি ভারতের অনেকেই জানেন না।

সত্যবতী, মহারাজ ধন্যমাণিক্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রাজভক্তদের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে রাজ গুরু লক্ষ্মী নারায়ণ নিহত হয়েছিলেন সে কথা তোমাদের বলেছি। তার সুযোগ্য শিষ্যা বলাগমা গুরুর এই করুণ পরিণতি দেখে প্রাণ বাঁচাতে বনে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি বনে একটা ঘর তুলে সাধন ভজন নিয়ে থাকতেন। তার কয়েকজন ভক্ত জুটেছিল। বলাগমা মৃত্যুর আগে সেই ভক্তদের তার অর্জিত বিদ্যা দান করে গিয়েছিলেন। তাদের একজন ছিলেন পাবিহাম। সেই পারিহামের সঙ্গে রাজকাং গ্রামে কল্যাণদেব এক সঙ্গে পরিচয় হয়। ক্রমে বন্ধুত্ব হয়।

মির্জা নূরউল্লার অত্যাচারে ত্রিপুরাবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে পারিহাম জানাল বন দেবতার পূজো দিয়ে তিনি মুসলমান সৈন্যদের উপর মহামারী রোগ চালান দিতে পারবেন। গুরুদেব বলে দিয়েছেন একান্ত দরকার না হলে যেন এই বিদ্যা অন্যের উপর প্রয়োগ না করা হয়। এই বিদ্যা যারা প্রয়োগ করেন তাদের আপন জনের সেই রোগেই মৃত্যু হয়। সেজন্য তন্ত্র বিদ্যা যারা চর্চা করেন তাদের অধিকাংশই সংসার ধর্ম পালন করে না। সেনাপতি কল্যাণদেব যদি বলেন তাহলে তিনি মুসলমান সৈন্যদের উদয়পুর থেকে তাড়াতে এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারেন।

মুসলমান সৈন্যদের হাঁতে মহিলারাই বেশী লাঞ্ছিতা হচ্ছিলেন। রাজধানীর যুবতী মেয়ে ও বধূঁরা অনেকেই সমতল ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুসলমান সৈন্যরা সেজন্য পার্শ্ববর্তী আদিবাসী পল্লীতে হানা দিয়ে প্রতিদিন আদিবাসী যুবিতীদের ধর্ষণ করছিল। যুবকদের উপর চাপ দিয়ে যশোধর মাণিক্যের সেনাপতিদের খোঁজ করছিল। রণজিৎ নারায়ণ রাজধানীর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি প্রাণ বাঁচাতে চলে গিয়েছিলেন গোমতীর উৎসমুখে। মায়ানী পর্বতকে গোমতীর উৎস স্থল বলে অভিহিত করা হয়। তারও কয়েক ক্রোশ পূর্বে এক বিশাল সমতল ভুমি ছিল। সেই সমতল ভুমিকে আচরঙ বলে। সে স্থান রাইমা ও সরমা নামে পরিচিত হয়েছিল। গোমতী নদীর উৎসমুখে বাঁধ দিয়ে ডম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হওয়ায় সরমা ও রাইমার সমতল এলাকা জলের নীচে চলে গেছে।

ত্রিপুরার মানুষের শান্তির কথা ভেবেই কল্যাণদেব পারিহামকে তান্ত্রিক অভিচার করে শত্রু সৈন্যদের তাড়ানোর পক্ষে অভিমত দেন। গোমতী নদীর তীর বামপুরে

অমাবস্যার মধ্যরাতে পিশাচীর পূজোর আয়োজন করেন পারিহাম। কল্যাণদেব সহ আরো কয়েকজন রাজ সেনাপতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দু'ঘন্টা পূজোর পর পিশাচীর উদ্দেশ্যে আটটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পাঁঠাগুলোর ছাল ছড়িয়ে শেয়ালদের উদ্দেশ্যে ভোগ প্রদান করা হয়। সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো আটটি শেয়াল মাটির থালায় রাখা পাঁঠার মাংস খেয়ে একত্রে হুঁকার শব্দ করে বনে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পারিহাম কল্যাণদেবকে বললেন- সেনাপতি মশায় পূজো সফল হয়েছে। আট পিশাচীএসে খাবার গ্রহণ করেছে। কাল থেকেই মুসলমান সৈন্যরা যারা পাঁঠার মাংস খাবে তারাই ভেদ বমিতে আক্রান্ত হবে। আপনারা সাধারণ প্রজার মাধ্যমে মুঘল সৈন্যদের খাওয়ার জন্য উপহার হিসেবে পাঁঠা সরবরাহ করার ব্যবস্থা করুন।

উপজাতি প্রজাদের মধ্যে যাদের উপর ছাগল, পাঁঠা, গরু মুসলমান সৈন্যদের জন্য সরবরাহের ভার দেওয়া হয়েছিল তারা পারিহামের মন্ত্রপড়া জল পাঁঠাদের উপর ছিটিয়ে দিয়ে মুসলমান সৈন্যদের উপহার দিয়ে এলো। মদ ও মাংস খেয়ে মুসলমান সৈন্যরা প্রায় এক বছর ধরে রাজধানী উদয়পুরের বাসিন্দাদের ঘর শ্মশানে পরিণত করেছিল।

মদ, মাস আর নারী উপভোগ এই ছিল মুঘল বাহিনীর কাজ। পারিহামের মন্ত্র কাজ করতে শুরু করলো। প্রথম দিনেই প্রায় এক হাজার সৈন্য ভেদ বমিতে আক্রান্ত হলো। এই ভেদ বমির প্রকোপ সহকর্মী সৈন্যদের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাড়ী পাহাড়ার জন্য যে অল্প সংখ্যক মানুষ রাজধানীতে ছিলো একদিনেই রাজধানী খালি করে অন্যত্র চলে গেলো। মুসলমান সৈন্যদের শতশত মৃতদেহ গোমতীর জলেই ভাসিয়ে দিতে লাগলো।

ঢাকার নবাবের আহ্বানে কয়েকদিন আগে পঞ্চাশটি হাতী নিয়ে মির্জা নূরউল্লা ঢাকা পাড়ি দিয়েছিল। না হলে ভেদ বমিতে তারও আক্রান্ত হওয়ার কথা ছিল। উদয়পুরের উপজাতিরা ডাকিনী বিদ্যায় পারদর্শী এমন একটা প্রবাদ হুসেন সাহের সময় থেকেই চালু ছিল। মুঘল সৈন্যদের মধ্যেও ঐ সংবাদ প্রচারিত হবার পর তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি হলো। মুঘল সেনাপতি বাকী সৈন্যদের নিয়ে উদয়পুর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলো। তাদের বিদায়ের পালা শুরু হলো। সাত দিনের মধ্যেই প্রাণ ভয়ে ভীত মুঘল বাহিনী উদয়পুর ত্যাগ করে ঢাকার দিকে চলে গেলো।

কুমার গোবিন্দ গোলাঘাটিতে থেকে তাঁর পিতার খবর সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছিল। কল্যাণদেব দূত মারফৎ খবর পেয়েছিলেন গোবিন্দ রাজ্যে ফিরে এসেছে। মহারাজ যশোধর মাণিক্য বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন। তিনি ইচ্ছে করেই গোবিন্দের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন নি। দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথকেও তিনি কালীবাড়ীতে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আর তৃতীয় ও চতুর্থ ছেলে রাজকাণ্ড তাদের দাদুর বাড়ীতেই বসবাস করিছল। তিনি মনে মনে ধারণা করেছিলেন ত্রিপুর সেনাপতিদের মধ্যে যারা রণকুশলী তাদের হত্যা করতে পারে মুঘল সৈন্যরা। সে

কারণেই রণজিৎ নারায়ণ আগে থেকেই অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। তার অনুচরদের সহায়তায় তিনি আচরঙ এলাকায় নিজের আধিপত্য কায়েম করেছেন। নিজেকে স্বাধীন রাজা বলেও ঘোষণা করেছেন।

মুঘল সৈন্য বিনাশর্তে, বিনা বাঁধায় প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে উদয়পুর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কল্যাণদেব রাজধানীতে এলেন। লুকিয়ে থাকা সেনাপতি এবং অমাত্যরাও আসতে লাগলো। কুমার গোবিন্দ দেবও দিল্লী থেকে ফিরে এলেন। ভাঙ্গা ও শ্মশান প্রায় রাজ প্রাসাদে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সভায় বসলেন। গোবিন্দ দেব এবং মহারাজের বিশিষ্ট দেহরক্ষি ভক্তরাম সভাসদদের মহারাজের অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। উপস্থিত সভাসদগণ মহারাজের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। ছেচল্লিশ বছর বয়সী কল্যাণদেব দেবী ত্রিপুরেশ্বরী চতুর্দশ দেবতা এবং ভুবনেশ্বরীর আশীর্বাদ নিয়ে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিন কল্যাণ মাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসলেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আবার নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রবীণ পুরোহিত রঘুনাথ বাচস্পতি কল্যাণদেব এর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের চূড়া ভেঙে মগ সৈন্যরা সোনার কলস নিয়ে যাওয়ার পর মন্দিরের চূড়া আর ঠিক করা হয়নি। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মন্দিরের চূড়াটি নূতনভাবে গড়ে দিলেন। মন্দিরের সংস্কার করলেন। তারপর দেবীকে আবার মন্দিরে নিয়ে এলেন।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সংস্কারের মধ্যদিয়ে কল্যাণ মাণিক্য মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু করেন। প্রজাগণ আবার তাদের ঘরে ফিরতে শুরু করে। রাজধানীতে প্রাণ ফিরে আসে।

জয়ন্ত গোঁসাই আর জয়ন্ত চন্তাই এর মধ্যে বয়সের পার্থক্য প্রায় ত্রিশ বছর। তবুও দুজনে বন্ধু। চন্তাই জয়ন্ত প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু-দিন ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমে আসেন। মহন্ত অদ্বৈত্বানাদ গিরি মহারাজের সঙ্গে গল্প করেন। আশ্রমে ভোজন করেন। ভোজনের সময় জয়ন্ত গোঁসাইকে পাশে বসিয়ে এক সঙ্গে ভোজন করেন। অদ্বৈতানন্দ গিরি মহারাজ জয়ন্ত গোঁসাইকে বিরজা হোমের মাধ্যমে সন্ন্যাস মন্ত্র দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জয়ন্ত গোঁসাই ভগবান বিষ্ণুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। সেজন্য জয়ন্তের মনে মনে ইচ্ছে ছিল বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার। ভক্তি জয়ন্তর যুক্তি মানতে চাইলো না। ভক্তি জয়ন্তকে নামের সর্বব্যাপী শক্তির অর্থ বুঝিয়ে বললো। ভগবানের ইচ্ছে দ্বারা যদি একটি গাছের পাতাও নড়ে না ভগবানের ইচ্ছে অনুসারেই তাহলে মহন্তজী ব্রহ্মচারী জয়ন্তকে সন্ন্যাস নেবার কথা বলেছেন।

ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। রাজ আনুকুল্যে এবং রাজপুরুষদের প্রতক্ষ্য সহযোগিতায় ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রম পরিচালিত হচ্ছে। আশ্রমের মহন্ত যা বলেন রাজপুরুষেরা সে মতোই কাজ করেন। ব্রহ্মচারী জয়ন্ত, কুমার গোবিন্দ এবং ভক্তিমাতা সরস্বতীর প্রিয় জন। জয়ন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য এক ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করেন।

মহন্ত অদ্বৈতানন্দ বিরজা হোমের পর ব্রহ্মচারী জয়ন্তকে যখন মন্ত্র দান করলেন তখন জয়ন্তর বিস্ময়ের শেষ রইলো না। উপনয়নের সময় দ্বিতীয় দিন রাত্রে স্বপ্নে জয়ন্ত এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটি মন্ত্র পেয়েছিল। দু-একটি অক্ষর মনে থাকলেও মন্ত্রটি সে পরদিন মনে করতে পারেনি। কয়েক মাস পর্যন্ত মনে মনে সে ব্যথা অনুভব করেছে। স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র গিরি মহারাজের কাছ থেকে পাওয়ার পর তার মনে হলো — ভগবান জীবের কল্যাণে সত্যি সত্যিই সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। মোহবশত জীব অনেক সময় তা বুঝতে পারে না। এতদিনে তার মানব জীবন সার্থক হলো।

কিছু সময়ের জন্য কল্যাণদেব ভক্তির ঘরে এসেছে। ভক্তি হাত জোর করে বললো — মহারাজের জয় হউক। ব্রহ্মচারিণীর ঘরে কৃপাবশত মহারাজ আসায় ব্রহ্মচারিণী খুব খুশী হয়েছে। মহারাজকে কষ্ট করে সাধারণ কাঠের কেদারাতেই বসতে হবে।

হাসলেন মহারাজ। বললেন — সাধু সন্তের স্থান রাজার অনেক উপরে। রাজা চিরকালই সাধু সন্তের সেবা করে এসেছে। মা ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপায় আমি রাজা হয়েছি। ভক্তের কাছে এসেছি ভক্তের কোন বিশেষ কাজ করে দেওয়ার সময় হয়েছে কি না তা দেখার জন্য।

— মহারাজের কথা শুনে সাত বছর বয়সের একটি কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন আমার পিতা আমাকে কিছু চাওয়ার কথা বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম — বাবা, কসবার কালী মন্দিরের সামনে যেমন সুন্দর একটি দীঘি মহারাণী কমলা দেবী করে দিয়েছিলেন তুমিও তেমনি একটি দীঘি ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরের কাছে করে দিও। আমার বাবা সেদিন কথা দিয়েছিলেন তেমনি সুযোগ এলে একটা দীঘি কেটে দেবেন। মনে হয় মহারাজের সে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় এসেছে।

কল্যাণ মাণিক্য মেয়েকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। মেয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় খুব খুশী হয়ে বললেন — মা, তুমি আজ আমার মনের গোপন কথাটি প্রকাশ করেছ। আমি অবশ্যই একটা দীঘি খনন করে দেবো। কিন্তু, মা দীঘি খনন করতে হলে যে আশ্রমের ফুলের বাগানটি নষ্ট হয়ে যাবে?

— তার জন্য ভাববেন না মহারাজ। নূতন সন্ন্যাসী পরমানন্দ গিরি নূতন বাগান গড়ে তুলবেন।

— ঠিক আছে মা তোমাকে কথা দিলাম শীত এলেই বিশাল এক দীঘি খননের ব্যবস্থা করে দেবো। মা, আচরঙ এলাকায় আমাদের প্রাক্তন সেনাপতি রণজিৎ নারায়ণ স্বাধীন রাজ্যের রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করেছে। দূত পাঠিয়ে বুঝিয়েও তাকে রাজার আনুগত্য স্বীকার করানো যায়নি। আমি ঠিক করেছি কুমার গোবিন্দকে তার বিরুদ্ধে পাঠাবো। তোমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে এলাম।

— মহারাজ দূরদর্শী। সময়কুশলী। মহারাজ যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাই সঠিক হবে

বলেই আমার অনুমান। কুমার গোবিন্দ যুদ্ধে নিপুন। আপনার দেওয়া কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারবে। আমার মনে হয় মায়ের কাজ শেষ করে যুদ্ধের উদ্যোগ নিলে সাফল্য সহজেই আসবে।

— তোমার পরামর্শ সাদরে পালিত হবে।

কল্যাণ মাণিক্য কৈলাগড়ের সেনাপতি থাকাকালে পার্শ্ববর্তী সামন্ত রাজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ভুলুয়ার রাজাকেও তিনি বুঝিয়েছিলেন হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পারলে মুসলমান শাসকদের আক্রমণের মোকাবেলা অনেকটা সহজ হবে। ভুলুয়া রাজ ঢাকার নবাবের প্ররোচনায় নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করে যশোধর মাণিক্যের ক্রোধানলে পড়েছিলেন। প্রভুত সম্পত্তি ও লোক হানির জন্য যশোধনর মাণিক্য অমাত্যদের কাছে বহুদিন দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কল্যার মাণিক্য সমতল ত্রিপুরার সামন্ত রাজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলে সকলেই সহযোগিতার হাত বারিয়ে দেন। শীতকালে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পাশে দীঘি খননের কাজ শুরু হলো। অনেকে অর্থ দিয়ে দীঘি খননে সহযোগীতা করেছিলেন। অমর মাণিক্য অমর সাগর দীঘি খননের সময় যে সব এলাকা থেকে কুলি পেয়েছিলেন কল্যাণ মাণিক্যও সে সব এলাকা থেকে কুলি পেয়েছেন। সে সব এলাকার মধ্যে রয়েছে — বিক্রমপুর, সরাইল, ভাওয়াল গোয়াল পাড়া, অষ্ট গ্রাম বাক্‌লা বানিয়াচঙ প্রভৃতি। ভুলুয়ারাজ সব চেয়ে বেশী কুলি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কার্তিক মাস থেকে দীঘির খনন কাজ শুরু করে বৈশাখ মাস শেষ হবার আগেই দীঘির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। রঘুনাথ বাচস্পতি গঙ্গা দেবরী পূজো করেছিলেন। বিভিন্ন এলাকার দলপতিগণ এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীগণ সে দিনের গঙ্গা পূজায় হাজির ছিলেন। জমিদারগণ স্বেচ্ছায় পূজোয় বিভিন্ন সামগ্রী দান করেছিলেন। সাতদিন ধরে উৎসব চলেছিল।

পুত্র গোবিন্দের কথা অনুসারে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য মুঘল সম্রাটকে প্রতি বছর দশটি করে হাতি উপহার দিয়ে আসছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুজা বাংলার শাসক হয়ে আসার পর হাতীর সংখ্যা দশ থেকে বাড়ানোর নির্দেশ দেন। কল্যাণ মাণিক্য অক্ষমতা জানিয়ে সুজাকে পত্র পাঠালেন। সুজা খুশী হলেন না। তিনি ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

আশ্রমের ফুলের বাগান থেকেই আশ্রমের এবং ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পূজার ফুল সংগ্রহ করা হতো। ফুল বাগানে দীঘি খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর মহন্ত অদ্বৈতানন্দ পার্শ্ববর্তী টিলা ভূমিতে আশ্রম সরিয়ে নেন। মন্দিরের দক্ষিণ অংশের সমতল ভূমিতে ফুলের বাগান নূতনভাবে গড়ে তুলেন।

ফুল তোলার দায়িত্ব কিশোর বয়স থেকেই ভক্তি এবং জয়ন্ত পালন করে আসছিল। সে কাজ এখনো তারা করে চলেছে। জয়ন্ত সন্ন্যাস মন্ত্র নেবার পর ছোট মহন্ত তথা পরমানন্দ গিরি নামে সকলের কাছে পরিচিত। ফুল তোলার সময় ভক্তি ও পরমানন্দ সাধন ভজন নিয়ে আলোচনা করে। নিজেদের সাধনার গোপন কথা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে।

বিশাল ফুল বাগানে দশজন মালি স্থায়ীভাবে কাজ করে। বেলা এক প্রহর থেকে দুপুর পর্যন্ত তারা ফুল গাছের পরিচর্যা করে। সকাল বিকাল দু-বেলা দীঘি থেকে জল এনে গোড়ায় জল দেয়। কোন কোন দিন মালির পরিবারের মেয়েরা বাগানে ফুল তুলতে আসে। গৃহ দেবতার পূজোর জন্য ফুল নেয়। মহারাজা মহারাণী এবং দেবী ত্রিপরাসুন্দরীর জন্য একটি করে মালা গাঁথে। ভক্তি প্রতিদিন চারটি মাল গাঁথে। একটি ত্রিপুরেশ্বরী, একটি শিব, একটি গুরুদেব আর একটি গঙ্গা দেবীর জন্য। কল্যাণ মাণিক্য শুক সাগর থেকে কচ্ছপ, বিভিন্ন জাতের মাছ এনে দীঘিতে ছেড়ে দিলেন। প্রজাদের বলে দিয়েছিলেন এই দীঘির জলে মায়ের স্নান পূজা এবং ভোগ রান্নার কাজ হয়। এই দীঘির মাছ, কচ্ছপ কেউ যেন ভোজনের নিমিত্ত শিকার না করেন। যিনি এই দীঘির মাছ এবং কচ্ছপ শিকার করবেন তার এক বছর কারাবাস করতে হবে। মহারাজের আদেশ প্রচারিত হবার পর কোন প্রজা দীঘি থেকে কচ্ছপ কিংবা মাছ শিকার করেনি। মায়ের অন্ন ভোগ, ফল প্রসাদ, প্রতিদিন দুপুরে মাছ ও কচ্ছপদের দেওয়া হতো। কিছুদিন এমনভাবে চলার পর মন্দিরে যখন ঢাক বাজানো শুরু হতো তখন কচ্ছপ এবং মাছ দল বেঁধে প্রসাদ পাওয়ার মানসে ঘাটের কাছে হাজির হতো। ভক্তদের কাছে এই মাছ ও কচ্ছেপেরা মায়ের ভক্ত রূপে পরিচিত হলো। কচ্ছপের পিঠে হাত রেখে ভক্তরা প্রণাম জানাতো। এমনি করে এক অপূর্ব প্রেম ও ভক্তির সৃষ্টি হলো।

কৈলাগড়ে কয়েকজন রিয়াং কিশোরীর সঙ্গে ভক্তির সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশ্রমে আসার পর দুই মালির দুই মেয়ের সঙ্গে ভক্তি মাতার ভাব হলো। দু'জনেই বিয়ের উপযুক্তা হয়েছে। ফুল তুলে ফুলের মালা গেঁথে তাদের বাবার হাতে তুলে দেয়। বাবা মায়ের মন্দিরে আর রাজবাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসে। মহারাণী লতিকা মায়ের মন্দিরে এলে তাদের খবর পাঠিয়ে কাছে আনেন। বিভিন্ন উপহার তাদের হাতে তুলে দেন। একজনের নাম নমিতা আর একজনের নাম দীপালি। দুজনেই জোলা পরিবারের মেয়ে। ভক্তি একদিন তাদের বাড়ী গেলো। ইচ্ছে দুজনের পারিবারিক অবস্থা জেনে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া। পরমানন্দকে নিয়ে জোলা পাড়ায় গিয়ে এদের দেখা পেলোনা এমনকি এই নামের এবং চেহারার কোন মেয়ে নেই বলেই জানতে পারলো। দুজনেই বুঝতে পারলো মা ছদ্ম বেশে তাদের সাহায্য করেছেন।

মহারাজ যশোধর মাণিক্য বন্দী হয়ে রাজ্যান্তরী হবার পর প্রধান সেনাপতি রণজিৎ নারায়ণ আচরঙ এলাকায় গিয়ে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। কল্যাণদেব তাকে রাজনীতিতে ফিরে গুরুত্বপূর্ণ পদ নেওয়ার কথা বললেও শুনেননি। তখন গোবিন্দকে সেনাপতি করে রণজিৎ নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রণজিৎ নারায়ণ প্রায় এক সপ্তাহ প্রতিরোধ গড়ে তুলে আত্মসমর্পণ করেন। মহারাজের কাছে নিজ কন্যা উর্মিলাকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কল্যাণ দেব রাজী হলেন। বিচক্ষণ সেনাপতি রণজিৎ নারায়ণকে সঙ্গে পেলে ত্রিপুরা লাভবান হবে। তিনি তার মেয়ে উর্মিলাকে বিয়ে করলেন। সেনাপতির পুত্র লক্ষ্মী নারায়ণকে সেনাপতির পদ দিলেন। উর্মিলার ঘরে এক ছেলে হলো। কল্যাণ দেব নাম

রাখেন ছত্রজিৎ। মা নাম রাখেন নক্ষত্র। ভক্তি দীঘির পাড়ে কোন দিন গিয়ে বসে। মাছেদের খেলা দেখে। মালিদের মেয়ে মল্লিকা আর টগর এসে ভক্তির কাছে বসে। তার কাছ থেকে পুরাণের কথা শুনতে চায়। ভক্তি পুরোহিতের কাছে কৈলাগড়ের মায়ের মন্দিরে যা শুনেছে সে কথা তাদের শোনায়।

সেদিনও দুজন এসে দীঘির পাড়ে ভক্তির পাশে বললো। মল্লিকা বললো — মাতাজী, আমি গত রাত্রে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম।

— কি দেখলে?

— মুসলমানেরা ত্রিপুরা আক্রমণ করেছে। শুনেছি আপনি ভূত ভবিষ্যত বলতে পারেন। আপনি ধ্যানে বসে দেখুন না।

— আমি সব কিছু মায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছি। মা যা করেন তাই হবে। মহারাজ কল্যাণদেব যতদিন সিংহাসনে থাকবেন ততদিন বড় কোন বিপদ হবে না বলেই আমার ধারণা। মা ত্রিপুরেশ্বরী মা কালী দুজনেই মহারাজের প্রতি কৃপা বর্ষণ করে চলেছেন। মায়ের আশীর্বাদ থাকলে যমকেও ভয় করার কোন কারণ নেই।

— শুনেছিলাম কমলা সাগরে প্রতিদিন আপনি গঙ্গা মার দর্শন পেতেন। এখন তাঁর দর্শন না পাওয়ার ব্যথা অনুভব হয় না?

— দিব্য দর্শনে সকলেরই আনন্দ হয়। তা চলে গেলে ব্যথা অবশ্যই হয়। আমার মনেও সে দুঃখ উপস্থিত হয়। থাক সেসব কথা আজ তোমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কথা শুনাচ্ছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন গোপ গোপীদের প্রাণ স্বরূপ। তিনি যখন সশরীরে বৃন্দাবনে ছিলেন প্রতিদিন নয়নভরে গোপ গোপীগণ তাঁর রূপ প্রত্যক্ষ করতেন। যখন তিনি দ্বারকায় চলে গেলেন তখন গোপ গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্য হৃদয়ে দর্শন করতেন। যা দেহমনের বাইরে ছিল তা দেহের অভ্যন্তরে হৃদয় মন্দিরে স্থাপিত হলো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাওয়ার পর ভেবেছিলেন গোপ গোপীগণ তার বিরহ ব্যথা সহ্য না করতে পেরে সকলেই যমুনার জলে আত্ম বিসর্জন দেবেন। বৃন্দা দেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দ্বারকায় গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপ গোপীদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বৃন্দা বললেন — কৃষ্ণ প্রেমে সকলের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দেহের ছাই এর ভেতর একটি মণিকোঠা রয়েছে। তাকে হৃদয় মন্দির বলা হয়। সেই মন্দিরে সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রমণ করছেন। বৃন্দাবনে থাকতে শ্রী কৃষ্ণের দর্শনে যত আনন্দ হতো এখন হৃদয় মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে সেই আনন্দ বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার অবস্থাও গোপীদের মতো।

মা যতদিন পাশে বসে গল্প করতেন ততদিন মা এবং আমি আলাদা ছিলাম। মা এখন আমার হৃদয় মন্দিরে ভক্তি স্বরূপিনী ও আনন্দ স্বরূপিনী রূপে বিরাজ করছেন। আমি মাকে হৃদয়ে দর্শন করে অনেক বেশী আনন্দ পাই। মা ও আমি এক হয়ে যাই। আমি মার মা যে আমার।

প্রতিদিনই আশ্রমে সকাল সন্ধ্যায় বেদ গান হতো। পুরাণে বর্ণিত ভগবানের লীলা কথা পাঠ হতো। একদিন কৈলাগড়ে থেকে দূত এসে খবর দিলো সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুজা বিশাল সেনা নিয়ে ত্রিপুরা আক্রমণ করতে আসছে। দূতের কাছে সংবাদ পেয়ে মহারাজ কন্যা ভক্তির কাছে এলেন। ভক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন — ম, ত্রিপুরাবাসীর দুঃখ দূর করার কি কোন পথ নেই?

— বাবা, আপনি মায়ের পরম ভক্ত। আপনার রাজত্বকালে প্রজার কোন কষ্ট হবে না। আপনি কুমার গোবিন্দকে সেনাপতি করে কৈলাগড় পাঠিয়ে দিন। পুরোহিত মশায়ের কাছ থেকে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যান। কুমারকে বলবেন এই আশীর্বাদ যেন সঙ্গে রাখেন। মঙ্গল হবে।

— আমি সে মতোই ব্যবস্থা করবো।

কল্যাণ মাণিক্যের সুশাসনে ত্রিপুরায় শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। কুমার গোবিন্দকে সব বিষয়ে পারদর্শী করার লক্ষ্যে আচরঙ এ রণজিৎ নারায়ণকে দমন করতে পাঠিয়েছিলেন। এবার মুগল সম্রাটের বিরুদ্ধে গোবিন্দকে পাঠালেন।

রাজা হবার পর প্রথমেই দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথকে চারজন সেবক ও দুজন সেবিকা এবং বেশ কিছু অর্থ সহ বৃন্দাবনে বাসরত মহারাজ যশোধর মাণিক্যের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কুমার জগন্নাথ পদব্রজে তিন মাস পর বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছলেন। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের কাছে যে অর্থ ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। মহন্ত বৈষ্ণব দাস সে সময় মহারাজ এবং মহারাণীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। সন্ত হরিদাস গোস্বামীর আশ্রমে দুবেলা প্রসাদ নেওয়া আর হরিনাম কীর্তনে অংশ নিয়ে সময় কাটাতেন। বৃন্দাবন বিহারী কৃষ্ণ ভক্ত যশোধর মাণিক্যের কোন অসুবিধে রাখেন নি। কুমার জগন্নাথ অর্থ ও সেবক সেবিকা সহ বৃন্দাবনে তাঁর সাহায্যে আসায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম জানিয়েছিলেন। কল্যাণ মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথকে বলেছিলেন — বাবা, বৃন্দাবনে বৃন্দাবন বিহারী আমার ভরণ পোষণের জন্য মহন্ত বৈষ্ণব দাসকে কৃপা করেছেন। কল্যাণদেব যে অর্থ পাঠিয়েছেন তার অর্ধেক কাঙ্গাল ভোজনে খরচ করা হবে। বাকী অর্থ মহারাণীর জন্য খরচ করা হবে। কল্যাণদেবকে আমার শুভেচ্ছা জানাবে। ত্রিপুরা বাসীর মঙ্গল হউক।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য যে পরিমাণ অর্থ মহারাজের ভরণ পোষণের জন্য পাঠিয়েছিলেন জীবন দশাতে তিনি সে অর্থ খরচ করে যেতে পারেন নি। মহারাজেরর আগেই মহারাণী বৈকুণ্ঠ বাসী হয়েছিলেন। তাই তিনিও বৈকুণ্ঠবাসী হবার আগে সঞ্চিত অর্থ সেবক সেবিকাদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের ইচ্ছে মতো জীবন ধারণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারা ব্রজবাসী হয়ে ব্রজের যে আনন্দ পেয়েছিলেন সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চাননি। প্রত্যেকেই শেষ সময় পর্যন্ত বৃন্দাবনে কাটিয়ে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছিলেন। কুমার জগন্নাথ রাজ সিংহাসনে বসার সুযোগ না পেলেও অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন এবং মন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য কসবায় যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানদের হাত থেকে বিগ্রহ রক্ষা করতে কমলা সাগরে লুকিয়ে এসেছিলেন। রাজা হবার পর সে বিগ্রহ কমলা সাগর দীঘির জলে ডুবুরি দিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করিয়েছিলেন। পান নি। মনের দিক থেকে কল্যাণদেব খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। এক রাতে মা-কালী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন মহারাজ যেন এর জন্য দুঃখ না করেন। তিনি স্বেচ্ছায় শিলারূপে আবার পূজিতা হবেন। সময় হলে বিগ্রহ রূপে এই মন্দিরে প্রকট হবেন।

মুঘল সেনাপতি সুজার বিশাল বাহিনী দেখে যুদ্ধের আগেই ভীত হয়ে পড়েছিল ত্রিপুর বাহিনী। ফলে যুদ্ধে ত্রিপুর বাহিনীর পরাজয় হলো। কৈলাগড় ও বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ মুঘল বাহিনী দখল করে সুজা দূত মারফত ত্রিপুর সেনাপতি কুমার গোবিন্দের কাছে দূত পাঠালন। বললেন ত্রিপুর রাজ যদি বছরে কুড়িটি হাতী পাঠাতে রাজী থাকেন তাহলে মুঘল বাহিনী যুদ্ধ বন্ধ করে ত্রিপুরার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবে। নয়তো ত্রিপুরা দখল করে মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত করা হবে।

কুমার গোবিন্দ সেই প্রস্তাব নিয়ে মহারাজের কাছে এলে মহারাজ কুমার গোবিন্দকে মহন্ত মহারাজের কাছে তরবারী জমা দিয়ে সন্ন্যাস নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ছেলের সাহায্যে এগিয়ে এলেন মহারাণী লতিকা। বললেন মহারাজ কুমার গোবিন্দকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে প্রয়োজনে আবার যুদ্ধে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হউক। মহামতী ভক্তির প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে। সে যখন বলেছে ত্রিপুরার সমূহ বিপদের কারণ নেই তাহলে কোন বিপদ হবে না। আমি কুমারকে বলবো ভক্তির সঙ্গে দেখা করে ভক্তি যা বলেন সে কথা মহারাজের কাছে নিবেদন করার জন্য। মহারাজ গোবিন্দকে ভক্তি মাতার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দান করুন।

মহারাজ অনুমতি দিলেন। মহারাজের অনুমতি নিয়ে রাতেই কুমার গোবিন্দ আশ্রমে গেলেন। তিনি অদ্বৈতানন্দ, সন্ন্যাসী পরমানন্দ এবং বোন সরস্বতীকে প্রণাম করলেন। যুদ্ধের সব কথা ভক্তি মাতাকে জানালেন। ভক্তি মাতা দাদার কাছ থেকে সব শুনে দাদাকে পরদিন ভোরে আশ্রমে আসতে বললেন। বললেন মায়ের কাছে তিনি সব নিবেদন করবেন। মা যদি দয়া করে পরিত্রাণের পথ দেখান তাহলে ভাবনার কিছুই থাকবে না। মায়ের আদেশ তিনি পরদিন জানাবেন।

ভক্তি জানে মা শেষ প্রহরে দীঘিতে এসে স্নান করেন। কয়েকদিন ভক্তির সঙ্গে মায়ের দেখা হয়ে গেছে। ভক্তিও সে সময়ই স্নান করতে যায়। মা জানেন ভক্তি তাকে চিনতে পেরেছে। তবুও ভক্তির কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন নি। মায়ের লীলা দেখে ভক্তি হাসে। মা কৃপা করে তাকে দর্শন দিচ্ছেন। আবার পরিচয়ও গোপন করছেন। মায়ের এটি এক প্রেমপূর্ণ লীলার প্রকাশ। সেদিন ভক্তি মাতা তৃতীয় প্রহর থেকেই দীঘির ঘাটে বসে মায়ের নাম জপ করছিলেন। মা এলেন। ভক্তি কিছু দিন আগে যে যুবতী বঁধুকে মায়ের বিগ্রহ দর্শন করার সময় গাছতলায় দেখতে পেয়েছিল শেষ প্রহরে রোজ স্নান করতে আসা যুবতী বঁধূটিও দেখতে একই রকম। কোথায় থাকেন জিজ্ঞেস করলে বললেন মন্দির পরিসরেই

তিনি থাকেন। পুরোহিতের আত্মীয়া। স্নান সেরে মায়ের বাল্য ভোগের ব্যবস্থা করবেন। দু-এক কথা বলার পর সেই বঁধূ স্নান করে চলে যায়। ভক্তি মাতাকে ঘাটে বসে থাকতে দেখে বঁধূ জিজ্ঞেস করলেন কি গো মা আজ অনেক আগেই চলে এসেছ মনে হয়। রাতে ঘুম হয়নি বোধ হয়? ধ্যান জপ্ বেশী করেছ না কোন সমস্যা নিয়ে বেশী ভেবেছ?

— মা, দয়া করে বসলে সমস্যার কথা আপনাকে বলতে পারি। মা স্বয়ং যেখানে বিরাজমান সেখানে সমস্যা থাকবে কেন?

— তোমার কথায় বসলাম। কিছু পরেই তোমার পরমানন্দ গোঁসাই স্নানে চলে আসবে। তার আগেই আমায় যেতে হবে। ভক্তিমাতা সেই ফাকে সমস্যার কথা বললেন। মা বললেন — তোমার দাদাকে বলো কাল রাতে শতাধিক মোষ সামনে রেখে মোষের গলায় যেন ঘন্টা বেঁধে দেয়। কিছু সৈন্য মোষগুলোকে পেছন থেকে তাড়া করবে। বাকী সৈন্যরা ডান দিক থেকে শত্রু শিবির আক্রমণ করবে। ত্রিপুরা বাহিনী তাহলে জয়ী হতে পারে। তোমার দাদা জয়ী হবেন। আমি চলি। যুবতী বঁধূ তাড়াতাড়ি স্নান সেরে চলে গেলেন। ভক্তি মাতা স্নান সেরে ফুল তোলার জন্য বাগানে চলে গেলো।

সকালে দুজন সঙ্গী নিয়ে কুমার গোবিন্দ এলো আশ্রমে। ভক্তি ভোগের প্রসাদ দিলো কুমারকে। তারপর মায়ের পরিকল্পনার কথা কুমারকে বললো। পরিকল্পনার অভিনব ব্যবস্থা শুনে অবাক হলো গোবিন্দ। বললো — মাতাজী, মা যে ব্যবস্থা করতে বলেছেন আমি সে ব্যবস্থাই করবো। আমরা চলি। প্রণাম।

মায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধে সাফল্য পেলো ত্রিপুর বাহিনী। ত্রিপুর বাহিনী যখন শিবির আক্রমণ করলো তখন কয়েকজন প্রহরী ছাড়া সকলেই ঘুমে ছিলো। প্রথমে ঘুম থেকে উঠে ঘন্টার শব্দ লক্ষ্য করে মুঘল বাহিনী মোষদের ধাওয়া করলো। সে অবসরে অন্ধকারে ত্রিপুর বাহিনী শিবির আক্রমণ করে সেনাপতি সুজাকে বন্দী করে ফেললো। সম্রাটের পুত্র বলে কথা। মুঘল সৈন্য যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হলো। গোবিন্দ সুজাকে তাদের শিবিরে নিয়ে এলো। সম্মানের সঙ্গে তাবুতে রাখলো। তাদের সকলকে পান ভোজন করালো। ত্রিপুরায় হাতীর সংখ্যা কমে গেছে। প্রতিবছর যে অধিক সংখ্যক হাতী পাঠানো সম্ভব নয় সে কথা সুজাকে বুঝিয়ে বললো। দূত মাধ্যমে মহারাজের কাছে খবর পাঠিয়ে সুজাকে নিয়ে কি করা যায় সে সম্পর্কে আদেশ চাইলো।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য ভেবে দেখলেন বাংলার সুবেদার তথা সম্রাটের পুত্র সুজার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা গেলে কয়েক বছর ত্রিপুরাবাসী মুঘলদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবে। তিনি কুমার গোবিন্দকে আদেশ দিলেন খুব যত্ন সহকারে মহামান্য বন্দীকে যেন রাখা হয় এবং তিনি যখনই ফিরতে চাইবেন তখন যেন তাকে ফিরে যেতে দেওয়া হয়।

গোবিন্দ তাই করলেন সুজা যাতে খুশি থাকেন তাই দেওয়া হলো। খুশী মনে সুজা বাংলায় ফিরে গেলো। কয়েক বছর ত্রিপুরাবাসী বিদেশীর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলো।

মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবার পর কুমার গোবিন্দকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হলো। তিন রাণীর গর্ভজাত আরো তিন পুত্র জগন্নাথ, যাদব, রাজ ও বলাইকে সেনাপতির পদ দেওয়া হলো আর নক্ষত্রকে রাজ প্রাসাদেই রেখে দেওয়া হলো।

মহন্ত অদ্বৈতানন্দ দেহ রাখলেন। জয়ন্ত ঠাকুর তথা পরমানন্দ গিরি হলেন নূতন মহন্ত। মন্দিরের পুরোহিতদের বংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা চাইছিলো মন্দিরের পুরো ক্ষমতা তাদের হাতে নিয়ে নিতে। অদ্বৈতানন্দ গিরি মহারাজ অমর মাণিক্যের সময় থেকেই আশ্রমে ছিলেন। সাহস করে পুরোহিতরা তখন তাদের মনোভাব রাজার কাছে বলতে পারেননি। কল্যাণদেব এর কাছে তারা তাদের মনোভাব প্রকাশ করলেন।

আশ্রম কর্তৃপক্ষ এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব হলে মন্দিরে অব্যবস্থা দেখা দিতে পারে। পরমানন্দকে তিনি কিশোর বয়স থেকে দেখেছেন। সে পরম ভক্ত। অদ্বৈতানন্দ পরম পণ্ডিত, পরম ভক্ত এবং বিচক্ষণ ছিলেন। পরমানন্দ তেমন নয়। তিনি পরমাননন্দকে ডেকে নিয়ে সব বুঝিয়ে বললেন। মন্দিরের সব ভার পুরোহিতদের হাতেই দিয়ে দিলেন।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য যুবরাজ গোবিন্দের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে আশ্রমে চলে এলেন। গোবিন্দ সরল প্রকৃতির। বীর হলেও কল্যাণদেব এর মতো বিচক্ষণ ছিলেন না। কল্যাণদেব এর কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্র রায় দাদার হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত শুরু করলেন। এই চক্রান্তের মূল উদ্যোক্তা ছিল নক্ষত্র রায় এর মামা সেনাপতি লক্ষ্মী নারায়ণ। প্রবীণ রাজ পুরোহিত রঘুনাথ বাচস্পতি এবং চন্তাই জয়ন্তকেও সে দলে টেনে আনতে সক্ষম হলো।

গোবিন্দ মাণিক্য তাদের চক্রান্তের কিছুটা আঁচ করতে পারলেন। কল্যাণদেব এর কাছে পরামর্শ চাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের ষড়যন্ত্রের সংবাদে তিনি প্রচণ্ড মর্মাহত হলেন। ভাইদের ঝগড়ায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে রাজী হলেন ন। ভক্তি মাতার পরামর্শে চলতে বললেন।

প্রায় এক বছর তিনি যুবরাজ গোবিন্দের উপর রাজ্যভার সঁপে দিয়ে ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি কুমারদের মধ্যে ঠাকুর উপাধির প্রচলন করেছিলেন। সেনাপতি রণজিৎ নারায়ণের কন্যাকে বিয়ে করে কল্যাণ দেব প্রধান সেনাপতির মনের ক্ষোভ দূর করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। রণজিৎ নারায়ণের উদ্দেশ্য ছিল অপুত্রক যশোধর মাণিক্যের মৃত্যুর পর তিনিই রাজা হবেন। তার পক্ষে কয়েকজন সেনাপতিএবং অমাত্যবর্গ ছিলেন। মুঘল বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ না করলে রণজিৎ নারায়ণ সিংহাসনে বসতেন এমন ধারণা তার মনে বদ্ধমূল ছিল। তা না হওয়ায় কল্যাণদেব এর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে যেমন নিজের ভবিষ্যতে নিশ্চিত করেছিলেন তেমনি পুত্র লক্ষ্মী নাারায়ণের ভবিষ্যতের পথ প্রশস্থ করেছিলেন।

ধুরন্ধর লক্ষ্মী নারায়ণ যুবরাজ গোবিন্দকে সরিয়ে ভাগ্নে নক্ষত্রকে রাজা করার চেষ্টা করছেন। আর তাতে সহযোগিতা করছেন জয়ন্ত চন্তাই এবং প্রবীণ বিশিষ্ট পণ্ডিত রঘুনাথ

বাচস্পতি। আশ্রমবাসী মহারাজ কল্যাণদেব এর কানে এলো এই সংবাদ। তিনি ভক্তি মাতা এবং পরমানন্দ গিরিকে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন — পৃথিবীতে বিশ্বাস বলতে কি কিছু নেই? আশ্রমে মহন্তের ঘরে মেয়ে ভক্তি যুবরাজ গোবিন্দ এবং ঘনিষ্ঠ অমাত্যদের সামনে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন — সেনাপতি লক্ষ্মী নারায়ণ এবং কুমার নক্ষত্রকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। ভক্তি দেখতে পেলেন একটি কালো ছায়া বারান্দায় ঘুরাঘুরি করছে। মহারাজের প্রতি ঘন ঘন তাকাচ্ছে। সাধিকা বুঝতে পারলেন মহারাজের হয়তো যাওয়ার সময় হয়ে এলো।

ভক্তি বাবাকে শান্তনা দিয়ে বিশ্রামের জন্য নিয়ে গেলো। রাতে স্বপ্নে মা ভক্তিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন ভক্তি, দেহ ধারণ করলে দেহ পরিত্যাগ করতেই হবে। ভক্ত কল্যাণের আয়ু আর মাত্র তিন দিন। ছায়ামূর্ত্তি শিবের অনুচর। কল্যাণ পরম শিব ভক্ত। শিবলোকে সে অনন্তকাল বসবাস করবে। জগতেও তার নাম অমর হয়ে থাকবে। যতদিন কল্যাণ সাগর থাকবে ততদিন তার নাম কেউ মুছতে পারবে না। এই মাত্র কল্যাণের মাথায় রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। তুমি রাজবৈদ্য এবং যুবরাজ গোবিন্দ ঠাকুরকে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করো।

ভক্তির ঘুম ভেঙ্গে গেলো। বাইরে গিয়ে মহন্তজীকে ডেকে তুললো। মহারাজ যে ঘুরে ঘুমিয়েছেন সে ঘরের দরজায় পাহাড়ারত প্রহরীকে দরজা খুলে মহারাজ কেমন আছেন খবর নিতে বললো।

ভক্তির কথায় প্রহরী অবাক হলো। ভক্তিকে সে শ্রদ্ধা করে। তাই কথামতো দরজা খুলে আলো বাড়িয়ে দিয়ে মহারাজকে ডাকলো। কোন সাড়া নেই। নাক দিয়ে কালো রক্ত বের হয়ে বুকের কাছে জমা হয়ে রয়েছে। আশ্রম জেগে উঠলো। রাজবাড়ীতে খবর পাঠানো হলো। বৈদ্য নাড়ি পরীক্ষা করে বিষণ্ণ ভাবে বললেন মহারাজের পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে। আপনারা যুবরাজ গোবিন্দ ঠাকুরের অভিষেক ক্রিয়া মহারাজের মৃত্যুর পূর্বেই শেষ করে ফেলুন। নইলে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের বুধবারে সেনাপতি যুবরাজ গোবিন্দ ঠাকুর সিংহাসনে বসলেন। পরদিনই কল্যাণদেব শিব লোকে পাড়ি দিলেন। রাজ সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র আরো গভীর হলো।

গোবিন্দ মাণিক্য লক্ষ্য করলেন যদি তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করতে চেষ্টা করেন তাহলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। এতে আর একটি মহাভারত সৃষ্টি হবে। চন্তাই ও ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত গঙ্গাধর এবং রাজপুরোহিত বৃদ্ধ রঘুনাথ বাচস্পতি নক্ষত্র রায়ের পক্ষে থাকায় গোবিন্দ মাণিক্যের পক্ষে নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি আশ্রমে গিয়ে বোন ভক্তিমাতা সরস্বতীর স্মরণ নিলেন। ভক্তিমাতা বললেন — মহারাজ, আপনি বিচক্ষণ রাজা। মনে মনে আপনি যা ভাবছেন তা করলেই আপনার পক্ষে এবং রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। রাজা রাম রাজপদ গ্রহণের প্রাক মুহূর্তে বনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আপনি রাজা হয়েছেন। কয়েক বছর আপনাকেও বনবাসে কাটাতে হবে। মা আপনার মঙ্গলই করবেন। কিছু দিনের জন্য রাজ্যভার নক্ষত্র রায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মচারীর বেশে বনবস কাটানোর আপনার ভাগ্যে লেখা রয়েছে।

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যকে বিনাশের সব উদ্যোগ সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। পৌষ তথা মকর সংক্রান্তি উৎসব সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ঘোষণা দিলেন ১লা মাঘ তিনি রাজ্যবাসীকে একটি সুখবর শুনাবেন। সমস্ত রাজপুরুষদের সভায় হাজির থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন। চক্রান্তকারীগণ সেই সুখবর শোনার আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গোবিন্দ বধ স্থগিত রাখলেন।

ভক্তি মাতা, মহন্ত পরমানন্দ ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত গঙ্গাধর, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত কমলাকান্তও হাজির রয়েছেন। মহারাজের মুখ থেকে সুখবর শোনার আগ্রহে সকলেই ব্যাকুল। একামত্র ভক্তি মাতা সরস্বতী আর গোবিন্দ মাণিক্য এই দুজন ছাড়া গোবিন্দ মাণিক্য কি খবর শোনাবেন তা কেউ জানতো না।

মহারাজের মুখ থেকে সুখবর জানার আগ্রহে সভাসদদের উপস্থিতিতে সভা ভরে গেল। গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে বসলেন। তারপর সভাসদদের উদ্দেশ্যে করে বললেন — উপস্থিত মাননীয় অমাত্যবর্গ এবং সেনাপতিগণ, আপনারা সবাই জানেন কিশোর বয়স থেকেই আমি ধর্মের প্রতি অনুরাগী। প্রায় এক বছর রাজ্য পরিচালনা করে মনে হলো আমার জন্য রাজ মুকুট এক কাঁটার মুকুট হিসেবেই মাথায় শোভা বৃদ্ধি না করে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি তাই ঠিক করলাম আমার অনুজ ভ্রাতা ছত্রজিৎকে আমার এই গুরু দায়িত্ব সঁপে দিয়ে আমি ব্রহ্মচারী রূপে বনে গিয়ে সাধন ভজন করবো। সেই উদ্দেশ্যেই আজকের এই বিশেষ সভার আয়োজন। আমার অন্য তিন ভ্রাতার চেয়ে ছত্রজিৎ অনেক বেশী গুণি, বিচক্ষণ এবং বীর যুদ্ধা। আমি মা ভুবনেশ্বরীর কাছেও প্রার্থনা জানিয়েছিলাম মা তুমি আমায় এই কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্তি দাও। স্বপ্নে মা আমায় ব্রহ্মচারীবেশ ধারণ করে বনে গিয়ে সাধন ভজনের আদেশ দিয়েছেন। সে জন্য আমি মহন্তজী, পুরোহিত এবং সকলের উপস্থিতিতে প্রিয় ভ্রাতা ছত্রজিতের রাজ্যাভিষেক কাজ এখন সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিচ্ছি। আমি ব্রাহ্মণদের বৈদিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রাতা ছত্রজিতের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমার আশা সভাসদগণ আমার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নক্ষত্রকে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন।

উপস্থিত সভাসদ, সেনাপতি এবং বিশিষ্ট প্রজাবর্গ কেউই এমন অদ্ভুত কথা শোনার আশা করেন নি। ষড়যন্ত্রকারীগণও বিস্ময়ে হতবাক। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ছত্রজিৎকে সিংহাসনে বসালেন। রাজমুকুট রাজ পুরোহিত রঘুপতি পরিয়ে দিলেন। রাজসভাতেই গোবিন্দ মাণিক্য রাজপোষাক খুলে সেবকের হাতে দিয়ে দিলেন। বনবাসে কাউকে সঙ্গী হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু, রানী গুণবতী, ভ্রাতা জগন্নাথ, জেষ্ঠপুত্র রামদেব জগন্নাথের পুত্র সূর্য প্রতাপ ও চম্পক রায় গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গ নিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য সাধারণ বেশে ঘুরতে ঘুরতে

বর্তমান সাব্রুম মহকুমার একটি রিয়াং অধ্যুষিত গ্রামে এসে ঘর তুলে বসবাস করতে লাগলেন। গ্রামটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। অপূর্ব একটি ঝর্ণা ছিল। গ্রামটির নাম হলো বৈষ্ণবপুর। গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে কয়েকজন বৈষ্ণব এসেছিলেন। তারা গোবিন্দকে প্রতিদিন কৃষ্ণ কথা শোনাতেন। আর হরিনাম কীর্তন করতেন।

ছত্রজিৎ তথা নক্ষত্র মাণিক্যের পক্ষে কয়েকজন বিচক্ষণ অমাত্য থাকায় রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তথা মাঘ মাসের প্রথম তারিখে ৩৭ বছর বয়সে ছত্র মাণিক্য সিংহাসনে বসেন। উদয়পুরে তিনি একটি বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন। যা ছত্র সাগর নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার একটি গ্রামের নাম রাখেন ছত্র গ্রাম। দান ও সুশাসনে তিনি প্রজার মন জয় করতে সক্ষম হন। কিন্তু মায়ের লীলা কে বুঝতে পারে।

প্রায় পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মহারাজের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হবার ঘটনাকে অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন মহারাজের বিপক্ষগণ মহারাজের উপর বসন্ত রোগ চালান করেছিল। কেউ বলেছে পরম ভক্ত গোবিন্দকে সিংহাসনচ্যুত করার পাপে ছত্র মাণিক্য অকালে বসন্ত রোগে মারা গেল। গোবিন্দ দেব কিন্তু ছোট ভাই এর মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছিলেন।

অমাত্যগণ বৈষ্ণবপুর থেকে গোবিন্দকে এনে ১৬৬৭ সালে আবার সিংহাসনে বসালেন। দূরদর্শী গোবিন্দ মাণিক্য ছত্রজীতের পুত্র উৎসব রায়কে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকার নবারে দরবারে পাঠালেন এবং তাকে নোয়াখালি জিলার কাদরা, অমিরাবাদও বেদরাবাদ নামক তিনটি পরগণা উপহার দিলেন। উৎসব রায় থাকতেন ঢাকায়। গোবিন্দ মাণিক্যের উপর তাই উৎসব রায়ের তেমন ক্ষোভ রইলো না।

শান্তনু বললো — মাতাজী, আপনি কি ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন না কালি প্রসন্ন সিংহের রাজমালা পড়ে ত্রিপুরার ইতিহাস মুখস্থ করেছিলেন?

— বাবা, শুনেছি ত্রিপুরায় রাজ আমলে স্কুলে ও কলেজে ত্রিপুরার ইতিহাস পড়ানো হতো। আমি ইতিহাস পড়িনি। তোমার মতো ইতিহাসের ছাত্রদের কাছ থেকে শোনা কথাই তোমাদের শোনাচ্ছি। আজ পবিত্র দিন। সে কারণে তোমাদের ধন্য মানিক্য থেকে দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শোনাতে চাইছি। যদি শুনতে তোমাদের কোন আপত্তি না থাকে।

সত্যবতী বললো — মাতাজী, আমি দর্শনের ছাত্রী। ত্রিপুরার ইতিহাস আমার জানা ছিল না। আপনার কৃপায় অনেক কথা জানলাম। একজন সন্ন্যাসিনী হয়ে আপনি ত্রিপুরার এত কথঅ জানেন আপনার সঙ্গ করার সেভাগ্য যাদের হয়নি তারা এটা ভাবতেই পারবেনা। আপনি বলুন। শান্তনু না শুনলেও আমি শুনবো। ভক্তি মাতা সরস্বতী আর পরমানন্দ গিরি মহারাজের কথাও বলুন।

— বলছি শোন। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিজরত্ন নারায়ণকে রাজপুরোহিত

করেছিলেন। তার পরামর্শে তিনি এবং রাণী গুণবতী অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গুণবতী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মন্দির এবং একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন। ঐ দীঘি গুণ সাগর নামে পরিচিত। বর্তমানে এর অবস্থান বাংলাদেশে।

রাজ পুরোহিত দ্বিজ রত্ন নারায়ণ ছিলেন পরম ভক্ত ও পরম পণ্ডিত। তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মাছ মাংস, ডিম প্রভৃতি কোন আমীষ জাতীয় খাবার খেতেন না। তার বাসগৃহে কালী, সরস্বতী, বিষ্ণু এবং শিব সকলের বিগ্রহই পুজিত হতো। তিনি রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায় পুরোহিত দ্বারা সব বিগ্রহের সেবা করাতেন। সময় ও সুযোগ করে নিজের ধন্যা ও পূজা করতেন। মহারাজ ধন্য মাণিক্য থেকে মহারাজ বীর বিক্রম পর্যন্ত সকল রাজাই শক্তি, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সব সনাতন ধর্মাবলম্বীকে সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছেন। পুরোহিত দ্বিজ রত্ন নারায়ণ সবাইকে বলতেন — আগে মায়ের সাধনা করো। মা সন্তুষ্ট হলে শক্তি প্রদান করবেন। শক্তি না অর্জন করতে পারলে কোন কাজেই সাফল্য আসবে না। মা শুধু শরীরে এবং মনে শক্তিই প্রদান করেন না তিনি ভক্তি ও বিশ্বাসও প্রদান করেন।

সেবা মহৎ কাজ। রাজপুরুষদের মধ্যে যাদের অর্থ ছিল তাদের প্রজার এবং জনগণের সেবায় সেই অর্থ ব্যয় করার পরামর্শ দিতেন। দ্বিজ রত্ন নারায়ণের পরামর্শেই গোবিন্দের ছোট ভাই জগন্নাথ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। উদয়পুরের বিশাল জগন্নাথ দীঘি ও জগন্নাথের এক অমর কীর্তি। উদয়পুরের জগন্নাথ মন্দিরকে তিনি পাথর দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন।

মহারাজ গোবিন্ন মাণিক্যের সুশাসনে প্রজাগণ সুখেই ছিলেন। সে সময়ে একবার পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের ঘটনা ঘটে। রাজ পুরোহিত দ্বিজ রত্ন নারায়ণ মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যকে ঐ মহা দিনে তুলা পুরুষ দান যজ্ঞের আয়োজনের উপদেশ দেন। মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। বলেন — পুরোহিত মশায়। আপনি তো জানেন যে কোন বিশেষ কাজ ঘোষণা করার আগে আমি ভক্তিমাতা সরস্বতীর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করি। আশা করি তিনিও আপনার এই প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানাবেন। আপনি ও আমি দুজনে কাল আশ্রমে গিয়ে ভক্তিমাতাকে সে সংবাদ জানিয়ে তার পরামর্শ চাইবো।

— মহারাজ আমার দৃষ্টিতে ভক্তিমাতা সরস্বতী ছদ্মবেশী কোন দেবী। ত্রিপুর রাজ কল্যাণ মাণিক্যের আশা পূর্ণ করতে হয়তো তিনি কল্যাণ মাণিক্যের কন্যা হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছেন। তার প্রভাবেই আপনাদের পরিবার দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে প্রজাদের উপর। আপনাদের পরিবারের শাসন কালে প্রজাগণ পরম সুখে রয়েছেন। ভক্তি মাতাকে দর্শন করতে আমার মন ও সর্বদা ব্যাকুল থাকে। আমি অবশ্যই আপনার সঙ্গে কাল ভক্তি মাতাকে দর্শন করতে যাবো।

পরদিন পাল্কীতে করে মহারাজ ও রাজ পুরোহিত আশ্রমে ভক্তি মাতার কাছে এলেন। ভক্তি মাতার তাদের সাদর আহ্বান জানিয়ে বসতে দিলেন। রাজ্যের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করলেন তারপর আশ্রম দর্শনে আসার পেছনে কোন কারণ রয়েছে কি না জানতে চাইলেন।

মহারাজ বললেন — ভক্তি মাতা, আপনি অন্তর্যামিনী। আমাদের আসার কারণ ও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। তবুও বলছি। আগামী অমাবস্যায় পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণ হচ্ছে। ত্রিপুরাতে তা সম্পূর্ণভাবে দেখা যাবে। তাই রাজপুরোহিত সূর্য গ্রহণকে কেন্দ্র করে তুলা পুরুষ দান যজ্ঞের আয়োজন করার কথা বলেছেন। বাবার সময় থেকেই আমরা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার পরামর্শ এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করছি। আজো এলাম।

— মহারাজের এটি একটি অপরিসীম অনুগ্রহ মাত্র। মা ভুবনেশ্বরী, মা ত্রিপুরেশ্বরী, ত্রিপেরশ ভৈরব, ভগবান বিষ্ণু এবং দ্বিজ রত্ন নারায়ণের কৃপা রয়েছে আপনার প্রতি। আপনার শুভ কাজ অবশ্যই বিনা বাঁধায় সুসম্পন্ন হবে। পূর্বে বিভিন্ন মহানুভব রাজা ঐ সব মহৎ কাজ করতে গিয়ে অহংকারের আবর্তে পড়েছিলেন। মহারাজ, যে কোন মহৎ কাজ ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে করলে কোন বিঘ্ন দেখা দেয় না। না হলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আপনাদের মহামতী রুক্মিণীর তুলা পুরুষ যজ্ঞের কাহিনীটি সংক্ষেপে বলছি শুনুন।

একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে দ্বারকায় দেবী রুক্মিণী তুলাপুরুষ যজ্ঞের আয়োজন করেন। ঠিক করেন তুলা পুরুষ যজ্ঞের ধন তিনি দেবী মাকে দান করবেন। তিনি দেবর্ষিকে স্মরণ করলেন। দেবী রুক্মিণী তার অভিপ্রায় দেবর্ষিকে জানালেন। দেবর্ষি বললেন - দেবী আপনি স্বয়ং মহালক্ষ্মী। আপনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। আমি পরিব্রাজক। ধন রত্ন নিয়ে আমি কী করবো? আপনি আমায় ধন দানের সংকল্প নিয়েছেন তা থেকে আপনাকে বিরত করতে পারি না। তবে ধন গ্রহণে আমার একটি শর্ত আছে।

— কি সেই শর্ত?

— দেবী আপনি যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ওজন অনুযায়ী ধন দিতে না পারেন তবে আমি যা চাইবো তাই দিতে রাজী থাকবেন?

দেবী রুক্মিণী সামান্য ভাবলেন। দেখলেন তাঁর নিজস্ব যে ধন রত্ন রয়েছে তা কয়েক কৃচ্ছের ওজনের সমান হবে। তাই তিনি বললেন — ঠিক আছে তাই দেবো।

— আপনি যদি তুলা পুরুষ দান না করতে পারেন তাঁলে যা চাইবো তাই দিতে রাজী হয়েছেন। দেবী দেখবেন পরে কিন্তু শর্ত থেকে সরে যেতে পারবেন না।

— দেবর্ষি আপনাকে পুনরায় কথা দিলাম আপনি যা দাবি করবেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে।

পুরোহিত ভগবান বিষ্ণুর যজ্ঞ শেষ করলেন। তারপর বড় দাঁড়ি পাল্লার এক পাল্লিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বসানো হলো অন্য পাল্লায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম ওজন ধন দেওয়া শুরু হলো।

দেবী রুক্মিণীর ঘরে যত দৌলত ছিল সব এনে পাল্লায় দিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সমান ওজন হলো না। ধন রত্নের ওজন অনেক কম হলো। রাকমিনী শর্তে হেরে গেলে দেবর্ষি

শ্রীকৃষ্ণকে আজ্ঞাবাহক হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের ষোলশত আট মহিষী তাদের সব ধন রত্ন পাল্লায় ওঠালেন। তবুও শ্রীকৃষ্ণের সমান ওজন হলো না। দেবর্ষী নারদ তখন মহিষীদের প্রতি হাত জোর করে বললেন — এবার আপনারা অনুমতি করুন শ্রীকৃষ্ণকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই। তিনি আমার সেবক হয়ে আমার সঙ্গে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াবেন।

শ্রীকৃষ্ণ হাত জোর করে দেবর্ষীকে বললেন — দেবর্ষী আমি প্রস্তুত। আমার কি করতে হবে বলুন। দেবর্ষী নিজের বীণাটি শ্রীকৃষ্ণের হাতে দিয়ে বললেন — এই বীণাটি কাঁধে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ তাই করলেন। শ্রীকৃষ্ণের সব মহিষী পতিকে হারানোর আশংকায় কাঁদতে লাগলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে বের হবার মুহূর্তে বৃন্দাদেবী বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে এলেন। বৃন্দা দেবীকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবর্ষী নারদ দাঁড়ালেন। বৃন্দাদেবী দুজনকে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের কাঁদতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। দেবী রাকমিনী তুলা পুরুষ দান যজ্ঞের কথা বললেন এবং শর্তের কথাও বললেন। দেবী রাকমিনী শর্ত হেরে যাওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহের ভাবনায় তারা সবাই কাঁদছেন।

দেবী বৃন্দা মহিষীদের বললেন — শ্রীকৃষ্ণের বিরহের যে কি তীব্র জ্বালা তা সব গোপীই ভালো করে জানেন। তাই আপনাদের যাতে গোপীদের দশা না হয় আমি সে চেষ্টা করে দেখবো।

বৃন্দা দেবী দেবর্ষিকে বললেন — দেবর্ষি ভ্রমবশতঃ দেবী রুক্মিণী মনে করেছেন তার ধন ভাণ্ডারে আর কোন ধন নেই। কিন্তু আমি জানি তার ধন ভাণ্ডারে অমূল্য ধন রয়ে গেছে। সেই ধন শ্রীকৃষ্ণের ওজনের সমান ওজন অবশ্যই হবে।

বৃন্দা দেবীর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের সব মহিষী হতবাক্ হয়ে গেলেন। দেবী রুক্মিণী অমূল্য ধন ঘরে লুকিয়ে রেখে শ্রীকৃষ্ণকে আজ্ঞাবাহকের কাজ করতে যেতে দিচ্ছেন। সব মহিষী এবং দেবী রুক্মিণী নিজেও অবাক হলেন। তিনি বৃন্দা দেবীকে হাত জোর করে বললেন — দেবী আমার ঘরে জানা মতো কোন ধনই নেই। তবুও আপনি যখন বলছেন তখন দয়া করে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে আমাদের মহা সংকট থেকে উদ্ধার করুন।

বৃন্দা দেবী বললেন তাই হবে। পুনরায় সভার কাজ শুরু হউক। দেবর্ষীর কাছে প্রার্থনা তিনি দেবী রুক্মিণীকে একটিবার সুযোগ দান করুন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবর্ষী নারদ বৃন্দা দেবীর কথা শুনে উভয়ে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দুজনেই হাসলেন। দেবর্ষী বললেন — বৃন্দাদেবীর ইচ্ছে পূর্ণ হউক।

আবার সভা বসলো। দাঁড়ি পাল্লা লাগানো হলো। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ বসলেন। অপরদিকে বৃন্দা দেবী কি অমূল্য রত্ন নিয়ে আসেন তা দেখার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দেবী বৃন্দা রুক্মিণীকে নিয়ে তুলসী গাছের কাছে গেলেন। রুক্মিণীকে একটি তুলসী পাতা ছিড়তে বললেন। তারপর সেই পাতার পেছন দিকে শ্রীকৃষ্ণ শব্দটি লিখতে বললেন। রুক্মিণী তাই করলেন। বৃন্দা বললেন তিনবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করে নামযুক্ত তুলসী পাতা খালি পাল্লায় দিয়ে দাও।

রুক্মিণী তাই করলেন। একটি ক্ষুদ্র তুলসী পাতা নাম যুক্ত হওয়ায় দু দিকের পাল্লা সমান হয়ে গেল। সভাসদগন দেবী বৃন্দার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই অপার্থিব ভক্তির প্রশংসা করলেন।

দেবর্ষি নারদ দেবী রুক্মিণীকে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিলেন। নাম এবং নামী যে অভিন্ন সে কথাও মহিষীদের বুঝিয়ে বললেন।

এবার প্রসাদ মাহাত্মের কথা বলছি। প্রভাস খণ্ডে সেই কথা ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে প্রতিদিন কাঙ্গাল ভোজন করাতেন। রাম ভক্ত হনুমান শুনেছেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র পরে শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের মানসে তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাঙ্গাল সেবার স্থানে এলেন।

দেবী রাকমিনী অংশত দেবী লক্ষীর অবতার। রান্নার উপকরণ সব যোগার করে দেবী রাকমিনীকে খবর দেওয়া হতো। তিনি রান্না ঘরে ঢুকে সব উপকরণের দিকে একবার তাকাতেন আর তাতেই বিভিন্ন প্রকারের খাবার তৈরী হয়ে যেতো।

যে সময় হনুমান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এলেন সে স্থানে এলেন সে সময় খাবারের উপকরণ সঠিকভাবে সাজানো হয়নি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী হনুমান রন্ধনশালার সামনে এসে কর্তব্যরত লোকদের কাছে খাবার চাইলেন। হাড় জির জিরে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেখে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ব্রাহ্মণের মৃত্যু হবে।

রন্ধনশালার প্রধান হাত জোর করে মানিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে সামান্য সময় ভিক্ষা চাইলেন। ব্রাহ্মণ জানালেন — তিনি সাত দিসেনর উপবাসী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাঙ্গাল ভোজনের স্থানে এসে উপবাস জনিত কারণে যদি মৃত্যু হয় তাহলে জগতে কাঙ্গালের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুর্নাম হবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মহত্যার অপরাদে অপরাধী হবেন। যদি খাবার প্রস্তুত না হয়ে থাকে তা হলে শুধু চাউলই তাকে খেতে দিয়ে প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

রন্ধন শালার প্রধান বললেন — ব্রাহ্মণ, আপনি এখন চাউলই খেয়ে আপনার ক্ষুধা দূর করতে চাইছেন তাহলে তাই হউক। রান্নার সামান্য চাউলই মুখে দিয়ে একটু জল খেলে ক্ষুধা দূর হয়ে যাবে। মাতা রুক্মিণী দেবী একটু পরেই এখানে আসবেন। তখন আপনার ইচ্ছেমতো উপাদেয় খাবার খেয়ে ভোজনের আনন্দ পেতে পারবেন।

একটি আশায় ধোয়া চাউল আর এক পাত্র জল দেওয়া হলো। ব্রাহ্মণ জয় শ্রীরাম বলে মুহূর্তে সেই চাউল খেয়ে রন্ধন শালার প্রধানকে বললেন — প্রধান পাঁচক, সাতদিন পর সামান্য খাদ্য পেটে লড়ায় ক্ষুধা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। শীঘ্র আরো খাবার না পেলে মুহূর্তে আমার প্রাণ চলে যাবে।

ব্রাহ্মণের কথায় ভয় পেয়ে রাঁধুনী এক বড় পাত্র চাউল এনে দিলেন। বৃদ্ধ সে চাউল ও মুহূর্তে খেয়ে ফেলে আবার খাবার চাইলেন।

রান্নাঘরে যত চাউল এনে জমা করেছিলো সেই ব্রাহ্মণ সব খেয়ে ফেললেন। এরই

মধ্যে খবর পেয়ে রুক্মিণী দেবী ছুটে এসেছেন। তিনি আসা মাত্র বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত হয়ে গেল। পরিবেশকরা পরিবেশন করতে লাগলেন আর ব্রাহ্মণ জয় রাম বলে মুহূর্তে সে সব খেয়ে ফেলতে লাগলেন। শুরু হলো রুদ্ররূপী হনুমান আর লক্ষ্মীরূপী রুক্মিণীর ক্ষমতার লড়াই। এর মধ্যে কাঙ্গাল ভোজনের সময় হয়ে এলো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এলেন। মৃদু হেসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে হাত জোর করে বললেন — রুদ্রাবতার হনুমান, আপনার এই লীলা চলতে থাকলে কাঙ্গালেরা অভুক্ত থেকে যাবে। আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়ে আপনার স্থানে ফিরে যান।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন — প্রভু। আপনি ত্রেতাতে লংকায় যুদ্ধের সময় গড়ুরকে শ্রীবিষ্ণুর রূপ দেখিয়েছিলেন। আমার প্রভু শ্রীরাম দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এমন কথা মুনি ঋষিগণ বলছেন। মুনি ঋষিগণের কথা সত্য কিনা তা জানতে দয়া করে আমাকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দেখানোর সৌভাগ্য দান করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন — ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান, তুমি আমার ভক্তশ্রেষ্ঠদেব একজন। তোমার প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ হবে। আগে তুমি আমাকে কাঙ্গাল সেবার সুযোগ দান করো।

— প্রভু ভক্ত বৎসল। প্রভুর ইচ্ছে মতোই জগতের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। কাঙ্গাল ভোজন ও সমাপ্ত হউক।

কাঙ্গাল ভোজন শেষ হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন ভক্ত হনুমান, আমার এইরূপ তুমি এবং রুক্মিণী ভিন্ন অন্য কেউ দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীরাম রূপ ধারণ করলেন। ভক্ত হনুমানের দু-চোখ বেয়ে প্রেমাশ্রু পড়তে থাকলো। শ্রীরাম হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন। ভক্ত হনুমান বললেন — প্রভু প্রসাদের অনন্ত মাহাত্ম। আমার ভোজনের অবশেষটুকু আমি মাথায় করে বনে নিয়ে গিয়ে বনের সমস্ত পশুদের মধ্যে বিতরণ করবো।

তুমি কথা দাও তোমার প্রসাদের স্পর্শ যারা পাবে তাদের বৈকুণ্ঠলাভ হবে। ভগবান বললেন হনুমান, নাম, নামী এবং প্রসাদ সমভাবে ভক্তের হৃদয়কে ভক্তিতে পূর্ণ করে তুলে। আমাকে স্মরণ করে যারা প্রসাদ গ্রহণ করে তাদের অবশ্যই বৈকুণ্ঠ লাভ হবে।

রাজ পুরোহিত দ্বিজ রত্ন নারায়ণকে কুমিল্লার অন্তর্গত এলাকায় বাইশ দ্রোণ ভূমি দান করেন এবং তুলাপুরুষ দানের সর্ব অর্থ দান করেন। রাজ পুরোহিত সেই অর্থের অর্দ্ধেক সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণদের দান করেন।

মহারাজ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম দেব মাণিক্যকে সিংহাসনে বসিয়ে বার্ধক্য কাল সাধন ভজন করেই কাটিয়েছিলেন। রামদেব মাণিক্যও একাধিক বিয়ে করেছিলেন। বিভিন্ন রাণীর গর্ভে আঠারজন কুমারের জন্ম হয়েছিলো। রামদেব এর এক শ্যালকের নাম ছিল বলি ভীম নারায়ণ। বলি ভীম নারায়ণ মহাবীর ছিলেন। সেজন্য রামদেব শ্যালককে যুবরাজ পদে নিয়োগ করেছিলেন। ক্ষমতার গর্বে তিনি মুঘলদের হাতী পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সে জন্য মুগল বাহিনী ত্রিপুরার উপর অসন্তুষ্ট ছিলো। তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব।

রামদেব মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজা হন দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য। কসবায় তখনো শিলা মূর্তি পূজা হতো। রত্ন মাণিক্য একদিন রাতে স্বপ্নে মা কালীর দর্শন পেলেন। মা কালী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন — তিনি ধর্ম পড়ে এক ভাঙ্গা মন্দিরে অনারম্বর ভাবে পূজিতা হচ্ছেন। রাজা যেন সেই বিগ্রহ কসবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজার ব্যবস্থা করেন।

রত্ন মাণিক্য প্রধান সেনাপতি বলি ভীম নারায়ণকে পাঠালেন ধর্মগড় থেকে বিগ্রহ নিয়ে আসার জন্য। বলি ভীম লোকজনসহ ধর্মগড় বিগ্রহ আনতে গেলেন। বিগ্র সম্পর্কে কারোরই কোন ধারণা ছিল না। বলি ভীম ভাঙ্গা মন্দিরে বিগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি নেই। মন্দিরের চার প্যাশের বিস্তীর্ণ এলাকা বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। খুব কষ্টে পুরোহিত মায়ের ভোগের সামগ্রী যোগার করেন।

বলি ভীম নারায়ণ লোকজনদের মাধ্যমে পার্শ্ববতী এলাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করলেন। জঙ্গল পরিস্কার করে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তাবু খাটালেন।

ভক্তিমাতা কাহিনী শেষ করে বললেন — মহারাজ, ভগবানের কাজ করতে গেলে যাতে অহংকার না আসে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। তুলা পুরুষ দানের ধন দ্বিজ রত্ন নারায়ণকে দিলে ভালো হয়।

— ভক্তি মাতার উপদেশ অনুযায়ীই কাজ হবে। চলি। নমস্কার।

বলি ভীম ব্রাহ্মণকে বিগ্রহের কথা জিজ্ঞেস করলেন। ব্রাহ্মণ জানালেন — মহারাজ প্রতীত খলংমা থেকে ধর্মনগরে রাজধানী স্থাপন করার পর রাজবাড়ীর কাছেই মন্দির তৈরী করে এই বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। আমার পূর্বজগণ ক্রমান্বয়ে এই বিগ্রহের সেবা করে আসছেন। এই স্থানের নামাকরণ করা হয় ধর্মগড়বা ধর্মনগর ।

মহারাজ ছেঙথুঙফা'র শাসন কালে মুসলমান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। বিশাল শত্রু সৈন্য দেখে মহারাজা ভীত হয়ে পড়েন। তিনি সন্ধি করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। মুসলমানেরা নির্বিচারে হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধংস করতে থাকে। আমার পূর্বজগণ সেবকদের দ্বারা বর্তমান স্থানে বিগ্রহ এনে লুকিয়ে রেখে বিগ্রহের পূজা গোপনে শুরু করেন।

মহারাণী মহারাজের কাপুরুষতাকে ধীক্কার দিয়ে নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন এবং যুদ্ধেজয়লাভ করেন। মহারানী যুদ্ধে গিয়ে দেখেছেন শ্যামবর্ণা এক বীরাঙ্গনা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছেন। মহারাণী সেই মহিলার সঙ্গে যোগ দিয়ে দুজনে মিলে শত্রু পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। দুই মহিলা নেত্রীর বিক্রমে দিশেহারা হয়ে পড়ে হৈতন খাঁর সেনা বাহিনী। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যোদ্ধাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন শ্যামবর্ণা যে যুবতী বঁধূ এত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং মা কালী। মহারাণী ছিলেন মায়ের এক নিষ্ঠ ভক্ত। ভক্তের মান বাড়াতে এবং ভক্তকে রক্ষা করতে মা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মহারাজ ছেংথুঙফা মায়ের মাহাত্মের কথা ভুলে গেলেন। সাধারণ মানুষ মহারানীর

প্রশংসা করলেন। মহারাজ রাজধানী ধর্মগড় তথা বর্তমানের ধর্মনগর থেকে রাজধানী বর্তমান কমলপুর এলাকায় স্থানান্তরিত করেন। ঐ স্থানের নাম ছিল ছাম্বুল নগর। মা পড়ে রইলেন অনাদরে অবহেলায়।

রাজধানী স্থানান্তরিত হবার ফলে ধর্মগড়ের বিশিষ্ট প্রজাবর্গ এই স্থান ত্যাগ করে ছাম্বুলনগর গিয়ে নূতন ভাবে ঘরবাড়ী তৈরী করে বসবাস শুরু করেন।

গ্রামের মানুষ জীবিকার অভাবে গরীব হয়ে পড়েন। মাকে ছেড়ে পুরোহিত কেমন করে যাবেন। পুরোহিত কষ্ট করে মায়ের ভোগের সামগ্রী ভিক্ষা করে যোগার করেন। আমিও নয় বছর বয়স থেকে মায়ের সেবা কার্যে নিযুক্ত রয়েছি। মায়ের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা জানাচ্ছি মা এমনভাবে আত্মগোপন না করে প্রকাশিত হউন। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের ধৈর্য কম। এরই মধ্যে কয়েক শত বছর চলে গেছে। মা এবার যথাস্থানে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন।

বলি ভীম নারায়র বললেন — পুরোহিত মশায়, পুরুষানুক্রমে আপনারা পূজা করছেন। আপনিও বিগ্রহের সঙ্গে চলুন।

— ঠিক আছে। মা ছাড়া আমারতো আর কেউ নেই। মাকে ছাড়া আমি মুহূর্ত কালও শান্তি পাবো না। আমিও মায়ের সঙ্গেই যাবো।

বলি ভীম নারায়ণ হাতীতে চড়িয়ে মাকে নিয়ে কৈলাগড় এলেন। মহারাজ দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য নূতন করে মায়ের মন্দির তৈরী করলেন। নূতন মন্দিরে ভাদ্র মাসরে অমাবস্যা তিথিতে মা কৈলাগড়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

শান্তনু, মা ত্রিপুরেশ্বরী এবং কসবার মা কালীর প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে তোমাদের এত কথা শুনালাম। তোমরা দুজনে অবশ্যই দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ। না হলে এত সব কথা ধৈর্য সহকারে শুনতে না।

সত্যবতী বললো — মাতাজী আপনি পরমানন্দ গিরি এবং ভক্তি মাতা সরস্বতীর কথা বলুন।

— ভক্তিমাতা সরস্বতী মা গঙ্গার মানস কন্যা। মা ত্রিপুরেশ্বরী, মা কসবা কালীর মাহাত্ম্য যেন সমাজে প্রচারিত হয় মায়ের কৃপায় যাতে ভক্তপ্রাণ মানুষ উপকৃত হন সে কাজে সহায়তা করার জন্যই জয়ন্ত ঠাকুর আর ভক্তিমাতা জন্ম নিয়েছিলেন।

— মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য দীঘি কাটিয়ে দেওয়ার পর ভগবান বিষ্ণু একদিন ভক্তিকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন — ভক্তি, তুমি মহারাজকে বলো শুকসাগর থেকে পাঁচটি কচ্ছপ এবং কিছু মাছ ধরে জ্যান্ত কল্যাণ সাগর দীঘিতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। সমুদ্র মন্থনের সময় আমি কূর্ম রূপ ধারণ করে সুমেরু পর্বতকে পিঠে ধারণ করে সমুদ্র মন্থনে সাহায্য করেছিলাম। কচ্ছপ সে জন্য বৈষ্ণবদের প্রণম্য এবং অভক্ষণীয়। দেবী কালী পরমা বৈষ্ণবী। দেবী যেখানে অধিষ্ঠিত থাকেন, পরম ভাগবত শিব যেখানে অধিষ্ঠিত থাকেন সেখানে আমি

বিভিন্ন রূপে অবস্থান করি। পরমা বৈষ্ণবী দেবী কালী গরমের সময় রাতে যখন দীঘির শীতল বাতাসে শরীর শীতল করেন তখন আমি কুর্ম রূপে দীঘির মধ্যস্থলে ভক্তিমতি কালীকে আমার পিঠে বসে শীতল বাতাস ভোগ করার সুযোগ দান করি। যতদিন কচ্ছপ কল্যাণ সাগরে বসবাস করার সুযোগ পাবে ততদিন মাকে আমি কুর্মরূপে সেবা করে যাবো। ভক্তের সেবা করতে পারলে আমার খুবই আনন্দ হয়।

ভক্তির কথা অনুসারে কল্যাণ মাণিক্য পরদিন ধীবরদের শুক সাগরে জাল ফেলার আদেশ দেন। ধীবরদের জালে পাঁচটি কচ্ছপই ধরা পড়েছিল। বিভিন জাতের মাছও ধরা পড়েছিল। মহারাজের আদেশে দীঘিঁর মাছ এবং কচ্ছপ শিকার নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় এখনো মাছ ও কচ্ছপেরা কল্যাণ সাগর দীঘিতে বেঁচে আছে। দীঘির সৌন্দর্য বাড়ে দীঘির জলে।

ত্রিপুর রাজগণ জনকল্যাণের জন্য এবং মানুষের জলকষ্ট দূর করার জন্য ত্রিপুরা এবং চাকলা রোশনাবাদে জমিদারী এলাকায় অনেকগুলো বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সরকার মাছ চাষের নামে দীঘির জল কমিয়ে ফেলে দীঘির সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি আর কয়েক শতাব্দী পর এইসব বিশাল দীঘির কথা শুধুমাত্র বই পড়েই জানতে পারবেন।

সত্যবতী, মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। সে সূর্য গ্রহণ এমন এক অমাবস্যায় হয়েছিল যে অমাবস্যা একশো বছর পর এসেছিল। রাজ পুরোহিত মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যকে ঐ বিশেষ গ্রহণ উপলক্ষে তর্পণ এবং বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলেছিলেন। রাজ পুরোহিত দ্বিজ রত্ন নারায়ণের উপদেশ অনুসারে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য বিশেষ যজ্ঞ এবং সকলের মঙ্গলের জন্য গোমতীর জলে তর্পণ করেছিলেন।

সত্যবতী, শাস্ত্র অনুসারে মানব লোকের এক বছর প্রেতলোক এবং দেবলোকের একদিন হয়ে থাকে। তাই উত্তর পুরুষগণ পূর্ব পুরুষদের প্রেতাত্মার শান্তি এবং সদ্গতি কামনায় তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ করে থাকেন।

যজ্ঞ উপলক্ষে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ভগিনী সন্ন্যাসিনী ভক্তিমাতা সরস্বতীকে আমন্ত্রণ করে রাজ প্রাসাদে নিয়ে এসেছিলেন। ভক্তি মাতা রাতে নিভৃতে এক গোপন কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন — মহারাজ, সূর্য গ্রহণের পরদিন মধ্যরাতে আমি আর ত্রিপুরেশ্বরী আশ্রমের মহন্ত মহারাজ কল্যাণ সাগরে জলসমধি নেবো। আমরা এসেছিলাম আদ্যাশক্তি মহামায়ার মহিমা ত্রিপুরায় প্রচার করার জন্য। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। পঞ্চ পাণ্ডব যখন বনবাস কালে বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছিলেন তখন তাদের পুরোহিত ধৌম্য তাদের ত্রিপুর রাজ্যে আসতে নিষেধ করেছিলেন। সে জন্য ত্রিপুর রাজ্য পাণ্ডব বর্জিত দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। পরম ভক্ত সেনাপতি রায় কচাকের এবং মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ভক্তিতে বাঁধা পড়ে। মা মহাকালী ত্রিপুরায় আসার পর থেকে ত্রিপুরা তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এসেছেন মঙ্গলচণ্ডি, মহাকালী তাদের মহিমা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা তাই আমাদের রাজ্যে ফিরে যাবো।

গোবিন্দ মাণিক্য এমন সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ভক্তিমাতা তাদের কাছে মহামায়ার অংশ হিসেবে পরিচিতা। তাই গোবিন্দ মাণিক্য হাত জোর করে ভক্তি মাতাকে বললেন — মা, আমার একান্ত নিবেদন আমার পরেই আপনি জলসমাধি গ্রহণ করুন।

— তা হয়না মহারাজ। কালের নিয়মেই আমাদের সবাইকে চলতে হয়। মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবো আপনার শাসনকালে ত্রিপুরাবাসী যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে। মহারাজের অনুরোধ না রাখতে পারায় দুঃখিত।

—মা, পণ্ডিত গঙ্গাধরের কাছ থেকে আপনি শাস্ত্রের বহু কথা শুনেছেন। তর্পণ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনার বাসনা জেগেছে দয়া করে তা পূর্ণ করুন।

— মহারাজ, তর্পণ সম্পর্কে বায়ু পুরান, দেবী ভাগবত সহ বিভিন্ন পুরানে বিশেষ বর্ণনা রয়েছে। দেবী ভাগবতে মহামুনি জরৎকারু এবং দেবী মনসার যে কাহিনী রয়েছে তা সংক্ষেপে আপনাকে বলছি।

মহর্ষি জরৎকারু একমাত্র বায়ু সেবন করে হাজারো বছর ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনিও সনকাদি চার ঋ ষির মতো ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। একদিন বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। জলের খোঁজে তিনি ঘুরতে ঘুরতে এক কূপের সামনে এসে কুপের ভেতর নজর দেন। তিনি দেখতে পান অনেক গভীরে জল রয়েছে। জলে বড় বড় কয়েকটা সাপ রয়েছে। মাঝখানে একটি গাছের শেকড় ধরে ঝুলে রয়েছেন আঙ্গুল প্রমাণ কয়েকজন পুরুষ। যে কোন সময় তারা নীচে পড়ে যেতেপারেন এবং সাপের খাদ্যে পরিণত হতে পারেন। জরৎকারু তাদের ঐ দুর্গতির কারণ জিজ্ঞেসর করলেন। উত্তরে তারা জানালেন তারা তাঁর পূর্ব পুরুষ। জরৎকারু জপ্ তপ্ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তারা জল তিল পাচ্ছেন না এবং বংশ রক্ষা না হলে তাদের ঘোর নরকে পড়তে হবে। নীচে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সেটা নরকেরই একটা চিত্র। কাজেই জরৎকারু যেন শীঘ্র সংসার ধর্ম পালন করে বংশ সৃষ্টি করে পূর্ব পুরুষদের ঘোর সংকট থেকে মুক্ত করেন।

পূর্ব পুরুষদের অবস্থা দেখে জরৎকারু তপস্বিনী দেবী মনসাকে শর্তানুসারে বিয়ে করেন। তাদেরই সন্তান হলেন পরম তপস্বী আস্তীক মুনি।

তর্পণ আট প্রকার। সনাতন ধর্ম মানব ধর্ম। কিছু স্বার্থান্বেষী লোক মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছে। তর্পণের সময়ও জগতের কল্যাণের জন্যই তর্পন করা হয়। তর্পণের মন্ত্রগুলো শুনলেই আপনি তা বুঝতে পারবেন। আট প্রকার তর্পণ হলো — মনুষ্য তর্পণ, ঋ ষি তর্পণ, সম তর্পণ, পিতৃ তর্পণ, ভীষ্ম তর্পণ, সামান্য তর্পণ, রাম তর্পণ ও লক্ষ্মণ তর্পণ। চারটি তর্পনের মন্ত্র আমার স্মরণে আছে। এই চার তর্পণের মন্ত্র আপনাকে শুনাচ্ছি।

সামান্য তর্পণ

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপাদগ্ধা ঃ কুলে মম।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্তা যান্তু পরাংগতিম্

পিতৃ তর্পণ—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরম তপম্।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে পিতাহি সর্ব দেবতা।।

শ্রীরাম তর্পণ —

ওঁ আব্রহ্মাভুবনোল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবা।
তৃপ্তন্তু পিতর সর্বে মাতৃমাতা মহোদয়।।
অতিত কুল কোটিলাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্তন্তু ভুবন ত্রয়ম্।।
ওঁ যেহবান্ধবা বান্ধব বা যেহন্য জন্মনি বান্ধব।
তে তৃপ্তিম অখিলং যান্তু পরাং গতিম্।।

শ্রীলক্ষ্মণ তর্পন ঃ-

ওঁ আব্রহ্মাস্তম্ভ পর্যন্তং জগৎ তৃপ্তন্তু
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা মেহপ্যদগ্ধা কুলেমম।
ভুমৌ দত্তেন তৃপ্তন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম।।
ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা সুপুত্রা গোত্রিনো
মৃতা তে তৃপ্তন্তু ময়া দত্তেন বস্ত্রনিস্পীড়ানোদকম্।।

পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে গোমতী নদীতে তর্পণ করে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য পূর্ব পুরুষদের প্রতি ও স্বর্গ কামনায় তুলা পুরুষ দান যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। নক্ষত্র মাণিক্যের অকাল প্রয়াণের পর মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য বিনা রক্তপাতে সিংহাসনে বসেছিলেন। কোন লোক হয়তো বলতে পারেন গোবিন্দ মাণিক্য কাপুরুষ ছিলেন। যারা এমন কথা বলবেন তারা সনাতন ধর্মের মহৎ গুণ গুলোর সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত নন। গোবিন্দ মাণিক্য ছোট ভাই নক্ষত্র তথা ছত্রজিতের মনোবাসনা পূর্ণ করতে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। মা ত্রিপুরেশ্বরী গোবিন্দ মাণিক্যকে তার সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মা ত্রিপুরেশ্বরীর দয়ার অন্ত নেই। আমরা সাধারণ মানুষ মায়ের দয়ার কথা সহসাই ভুলে যাই। স্বার্থ ছাড়া আমরা অন্য কিছু ভাবতে চাই না। তোমাদের একটা গল্প বলছি শোন —

মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সেনাপতি বিনয় দেববর্মা তথা বিনয় হাজারীর একমাত্র ছেলে বরুণের একবার জ্বর এবং উদরাময় রোগ দেখা দেয়। সেনাপতির ছেলে বরুণের আরোগ্য কামনায় বৈদ্য তার ভেষজ বিদ্যার সব বিদ্যাই ক্রমে প্রয়োগ করেন। দুই মাস অতিক্রম হবার পর বৈদ্য বিনয়ের কাছে প্রকাশ করেন যে ভেষজ মতে যত রকমের চিকিৎসা ছিল

সবই বৃথা হয়েছে। ছেলের বেঁচে থাকার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

একমাত্র ছেলে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ সংবাদ শুনার পর ছেলের আরোগ্য কামনায় বিনয় হাজারী মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে ধর্ণা দেন। একাক্রমে তিন দিন তিন রাত্রি বিনয় হাজারী মায়ের মন্দিরে ধর্ণা দেওয়ার পর তৃতীয় রাত্রির শেষ প্রহরে মা বিনয় হাজারীকে দর্শন দেন। তিন দিন অনাহারে থাকায় বিনয় হাজারীর মাঝে মাঝেই দুর্বলতার কারণে তন্দ্রার ভাব আসছিলো। এমনি এক সময়ে মা ত্রিপুরেশ্বরী বিনয় হাজারীকে দেখা দিয়ে বললেন — বাবা, এবার ঘরে ফিরে যাও। তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

তন্দ্রাবস্থায় মায়ের আদেশ শুনে বিনয় হাজারীর তন্দ্রাভাব দুর হয়ে যায়। সে মায়েরই মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলে মা, আমার ছেলে বরুণ যদি সত্যিই ভালো হয় তাহলে তোমার কাছে জোড়া কালো পাঁঠা বলি দেবো।

তিন দিন তিন রাত্রি মায়ের মন্দিরে ধর্ণা দিয়ে মায়ের আদেশ পেয়েছেন এই সংবাদ সারা উদয়পুরে প্রচারিত হয়ে গেলো। বরুণ তিন চার দিন পর থেকেই ক্রমে সুস্থ হতে লাগলো। মায়ের মন্দির থেকে আনা চরণামৃত খেয়ে সেনাপতির ছেলে ভালো হয়ে গেছে এই সংবাদও প্রচারিত হলো। রাজধানীর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ মায়ের মন্দিরে তাদের সমস্যার প্রতিকারের জন্য ব্যাপক সংখ্যা আসতে থাকেন।

বিনয় হাজারী কিছুদিন পর অমরপুরের সেনা ছাওনিতে বদলী হয়ে যায়। মায়ের কাছে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়। প্রায় এক বছর পর মা তাকে এক রাতে স্বপ্নে দেখা দেন। বলেন বাবা বিনয়, তোর ছেলে তো ভাল হয়ে গেছে। তুই তোর প্রতিজ্ঞা পালন করছিসনা কেন? বিনয় হাজারী স্বপ্নের মাঝেই আবার প্রতিজ্ঞা করলো আগামী অমাবস্যায় মায়ের মন্দিরে অবশ্যই তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে। বিভিন্ন কারণে বিনয় তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। কয়েক মাস পর বিনয়কে মা পুনরায় এক রাতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিনয় স্বপ্নে আবার প্রতিশ্রুতি দিলো সে আগামী অমাবস্যায় অবশ্যই তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে। মায়ের কাছে জোড়া পাঁঠা বলি দেবে। কিন্তু সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

ক্রমে পাঁচ বছর এভাবে কেটে গেলো। বিনয় এবং তার পরিবার জোড়া পাঁঠা মায়ের কাছে বলি দেওয়ার কথা ভুলে গেলো। ছেলে ইতিমধ্যেই মহারাজের সেনাবাহিনীতে ভর্ত্তি হয়েছে। মায়ের কৃপায় সে দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ হয়ে পড়েছে। মহারাজের বেতন ভুক্ত পঞ্চাশ জন বৈষ্ণব ছিল। তাদের কাজ ছিলো পালা করে হরিনাম কীর্তন করা। বিনয় যখন তার ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে শুরু করেছে এমন সময় যে মহারাজকে অনুরোধ করে চাকুরী ছেড়ে সামান্য বেতনে মহারাজের কীর্তনের দলে ভর্ত্তি হয়ে গেলো। বিনয় তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে অনেকভাবে বুঝিয়ে ব্যর্থ হলো। তখন তাদের মনে পড়লো মায়ের কাছে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতির কথা। মা কৃপা করে ছেলের জীবন ফিরিয়ে

দিয়েছিলেন। মায়ের সন্তানকে মা ভগবানের সেবা কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। মায়ের লীলা বুঝার সাধ্য কার আছে।

সত্যবতী, দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে কোন সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা করলে তা পূরণ করতে হয়। উদয়পুরের এক ভক্ত ঐ সময়ে একবার তার বাড়ীতে ভাগবত পাঠের আসর বসানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিষয় বাসনায় ডুবে গিয়ে আর সংকল্প পূরণ করেন নি। ক্রমে তার পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। তিনি নিজেও রোগে আক্রান্ত হন এবং হঠাৎ একদিন পরলোক গমন করেন।

শ্রীরামের বাণে রাবণ বিদ্ধ হবার পর বিভিষণ শ্রীরামকে বলেছিলেন প্রভু, রাবণ পরম রাজনীতিবিদ। আপনি দেশে ফিরে রাজা হবেন। আমার অনুরোধ রাজনীতি সম্পর্কে আপনি রাবণের কাছ থেকে কিছু উপদেশ গ্রহণ করুন। শ্রীরাম রাবণের কাছে সেই প্রার্থনা নিবেদন করলেন। রাবণ বিভিন্ন উপদেশ দান করলেন। বললেন — শ্রীরাম, শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই। অশুভ কাজ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত। আমি মর্ত থেকে স্বর্গ পর্যন্ত পথ তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। করবো করবো করে করা হয়নি। অমৃত পেয়ে নাভিতে রেখে দিয়েছিলাম। খাব খাব করে খাওয়া হয়নি। আসলে ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর করান আমরা নিমিত্ত মাত্র।

তুলাপুরুষ দান সহ বিভিন্ন কাজ শেষ করে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য রাতে ভক্তি মাতার ঘরে একাকী এলেন। ভক্তিমাতা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে মহারাজকে অভিনন্দন জানালেন। মহারাজকে বসতে বললেন। মহারাজ বসে হাত জোর করে ভক্তি মাতাকে জিজ্ঞেস করলেন — মাতাজী, আজকের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে তো?

— হ্যাঁ, মহারাজ। ভক্তের কাজে ভগবান কখনো ত্রুটি ধরেন না। আপনার কল্যাণ হউক।

মহারাজ স্বয়ং চলে আসায় খুব আনন্দিত হয়েছি। আমার একটা গোপন কথা মহারাজকে বলার ছিল। আমাদের দুজনের এই কথা অন্য কেউ যাতে না জানতে পারেন। সময় হলে পরমানন্দজীকে জানাবো।

— ভাবনায় পড়লেন মহারাজ। বললেন — বলুন আপনার এমন কি কথা আছে যা কাউকে বলা যাবে না?

— মহারাজ, আপনি মহা পূণ্যবান। আপনার ছেলে রত্নও সত্যিকারের একটি রত্নের মতোই মহিমায় উজ্জ্বল। তবুও এমন কিছু কথা থাকে সবাইকে বলা যায় না। মহারাজ, পিতা কল্যাণ দেব বহু জন্ম পূর্বে মহারাজ দাক্ষিণের পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মহারাজের তৃতীয়া পত্নী সুকুমারীর একমাত্র সন্তান। তার নাম ছিল সুমন। মায়ের কাছ থেকে ভক্ত ধ্রুবের কাহিনী শুনে ভগবান বিষ্ণুকে লাভ করার জন্য কৈশোরেই তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। মা তাকে বলেছিলেন — তৃতীয় রাণীর গর্ভজাত পুত্র ত্রিপুর বংশে কখনো রাজা হতে পারেন না। ত্রিপুরের সিংহাসনের অধিকারী হলেন প্রধানা মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মায়ের কাছ থেকে এসব কথা শুনে বালক সুমনের মনে তীব্র বৈরাগ্য আসে। ষোল বছর বয়সে মাকে কিছু না বলে ঘোড়ায় চড়েঅজানাকে জানতে বেরিয়ে পড়েন সুমন। অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ এই যুবককে বিভিন্ন গ্রামেই মেয়েরা ভালবাসার বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সে ঘুরতে ঘুরতে মনু নদীর তীরে এক সাধুর আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। জন মানব শূন্য স্থানে মনু নদীর তীরে একটি ছন বাঁশের ঘর তুলে একটি শিলাকে দেবী কালী রূপে তিনি পূজা করতেন। বার্ধক্য আসায় একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল। সাধুবাবা নিজের অবস্থার কথা বলে বিগ্রহের সেবার ভার গ্রহণের অনুরোধ জানালে সুমন রাজী হয়ে যায়। এরই মধ্যে দুটো বছর চলে গেছে। আঠার বছর বয়সে সুমন সেই আশ্রমে ঢুকেন।

সাধু বাবা ছিলেন মাতৃ সাধক। মা দক্ষিণা কালীর উপাসক। কালীকা পুরাণে দেবী কালীর যে মন্ত্র লেখা আছে তা হলো — ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালীকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁং হুঁং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। সাধু বাবা সুমনকে ওঁ ক্রীং মা কালীর এই মন্ত্র দান করেন। সুমনের নাম রাখেন মনু।

মনু সাধু বাবার দেওয়া মন্ত্র দ্বারা মা কালীর পূজা এবং ধ্যান করছিলেন। প্রায় বারো বছর একাক্রমে মায়ের পূজা এবং ধ্যান করার পর একদিন তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। কাছাকাছি কোন লোকালয় ছিল না। বনের ফল খেয়েই সাধুবাবা দেহ ধারণ করতেন। বনের আলু আর ফল কাছাকাছি এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেতো। সাতদিন জ্বরে ভোগার পর মনুর পরলোক প্রাপ্তি হয়।

বারো বছর মায়ের সেবা ও ধ্যান করার ফলে এই জন্মে মনুর মাতৃদর্শন এবং রাজ সিংহাসন লাভ হয়। পরমানন্দগিরি পূর্ব জীবনে মহারাজ প্রতীত প্রতিষ্ঠিত মা কালীর বিগ্রহের পূজারী ছিলেন। জন্ম জন্মান্তরে সে ব্রাহ্মণের ঘরেই জন্ম গ্রহণ করে মায়ের পূজায় আত্মনিয়োগ করেছিল। মা ত্রিপুরেশ্বরীর অপরিসীম কৃপায় এবার পরমানন্দ গিরি মুক্তি লাভ করে শিব লোকে শিব ও পার্বতীর সেবক হিসেবে অনন্তকাল শিব লোকে বসবাস করবেন।

— মাতাজী আমার ইচ্ছে ছিলো আজীবন আপনাদের পদপ্রান্তে বসে দেব দেবীর লীলা কথা শুনি। আমি বয়সে আপনার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। আমার যাওয়ার কথা আপনার আগে। আপনি চলে গেলে রাজপ্রাসাদ, পরিজন সবই অসার বলে মনে হবে।

— মহারাজ সংসার যে একটি নাট্যশালা আমি এবং আপনি দুজনেই ভালো করে জানি। নাটকে প্রত্যেক শিল্পীর এক একটি ভূমিকা থাকে। যে শিল্পীর পাঠ আগে শেষ হয়ে যায় সে আগে চলে যায়। যার সংলাপ শেষ সময়ে থাকে তাকে অপেক্ষা করতে হয়। আমি, আপনি মহামায়ার এই রঙ্গমঞ্চে সাধারণ পুতুল মাত্র। মা আমাদের যেমন খেলিয়েছেন তেমনি খেলেছি। আমার অভিনয় শেষ হয়েছে এবার আমাকে চলে যেতেই হবে। আমি চাইলেও এক মুহূর্ত বেশী সময় আমি এই পৃথিবীতে থাকতে পারবোনা। আপনার মনে যদি কোন প্রশ্ন জাগে মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে এসে মাকে প্রশ্ন করবেন। আপনার হৃদয়েও মা বসে আছেন। উত্তর পেয়ে যাবেন। রাত অনেক হলো এবার বিশ্রাম নিন।

— আমি মহারাণী সহ কাল বিকেলে আশ্রমে যাবো। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি দেখে প্রাসাদে ফিরবো। আমার বিনীত প্রার্থনা আপনাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন।

ভক্তিমাতা বললেন — মহারাজ, নিয়তিকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও নিয়তিকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। আমি আপনাকে যে কথা বললাম সেটাই আমাদের নিয়তি। আপনি যখন বিকেলে আশ্রমে যাবেন তকন একান্তে আপনাকে ঐ সিদ্ধান্তের রহস্যের কথা ব্যক্ত করবো।

— ঠিক্ আছে।

ভক্তি মাতা ও পরমানন্দজী আশ্রমে এসে আশ্রমের দায়দায়িত্ব সেবকদের বুঝিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। পরমানন্দ গিরি ঠিক করে রেখেছেন আশ্রমে প্রধান সন্ন্যাসী অভেদানন্দ গিরিকে আশ্রমের মহন্ত পদের দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ গিরি পরমানন্দ গিরিকে খুব বেশী স্নেহ করতেন বলেই বয়সে নবীন হওয়া সত্ত্বেও পরমানন্দকে মহন্ত পদে বসিয়ে গিয়েছিলেন।

সত্যবতী জিজ্ঞের করলো — মাতাজী, আশ্রমের মহন্ত হতে গেলে সন্ন্যাসীর বয়স না সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক শক্তি কোনটাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়?

— সাধন ভজনে যিনি এগিয়ে আছেন তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

— আপনি কিশোর জয়ন্ত ঠাকুর তথা পরবর্ত্তী কালের পরমানন্দ গিরি মহারাজের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন তাতে মনে হয় না প্রবীন সন্ন্যাসী অভেদানন্দ গিরির তুলনায় পরমানন্দ গিরি অনেক বেশী এগিয়েছিলেন?

— হ্যাঁ মা, পরমানন্দ গিরি জন্ম সিদ্ধ ছিলেন। কসবায় গঙ্গাধর পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসে যোগ সাধনার দ্বারা কুল কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার পরই পরমানন্দ নিজেকে চিনতে পারলেন। পূর্ব জন্মেও তিনি ছিলেন এক সিদ্ধ মহাপুরুষ। কসবা কালী বাড়ী ও উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী সিদ্ধপীঠকে পূর্ণ রূপে জাগ্রত করতেই পরমানন্দ ও ভক্তি মাতার আবির্ভাব। কসবা ও উদয়পুরে দুজনে যেভাবে গুপ্তভাবে সাধন ভজন করে ঐ দুই স্থানের পীঠস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন তার ফলস্বরূপ এখনো ঐ দুই স্থানে মহাশক্তি আদ্যা মায়ের নিত্য লীলা অনুষ্ঠিত হয়।

— আচ্ছা মাতাজী, জয়ন্ত ঠাকুরের পরিচয়তো আপনি দিয়েছেন। তিনি গোপাল ঠাকুরের ঔরসজাত সন্তান। কিন্তু ভক্তি মাতার ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে গেলো। যে মহিলা ভক্তি মাতাকে কসবার কালী মন্দিরে এনে রেখে গিয়েছিলেন তিনি কে? ভক্তি মাতা রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন। তাহলে তিনি কার ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন?

— পূর্ব বাংলার অষ্ট গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভাগ্য অন্বেষণে তিনি ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন কোন মন্দিরে পূজোর কাজ পেলে কিংবা কোন জমিদারের কাছ থেকে ভাল উপহার পেলে তিনি বাড়ী ফিরে আসবেন। ব্রাহ্মণ তার কথা

রাখেননি। আর ঘরে ফিরে আসেন নি। এক তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তারা বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণের বৃন্দাবন দর্শনের সাধ হলো। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গ নিলেন। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকও ছিলেন। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃন্দাবন দর্শনে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। পূণ্য অর্জনের আশায় অবস্থাপন্ন যাত্রীগণ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিলেন। ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে গেলেন। বৃন্দাবন বিহারীকে দর্শন করলেন। সংসারের কথা ভুলে ব্রজবাসী হয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণ যখন ঘর ছাড়েন তখন ব্রাহ্মণী তিন মাসের অন্তসত্বা ছিলেন। ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরছেন না দেখে ব্রাহ্মণী পরশীদের সঙ্গে ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় কসবার মন্দিরে এসেছিলেন ব্রাহ্মণের মঙ্গল কামনায়। ব্রাহ্মণ যাতে শীঘ্র বাড়ী ফিরে আসেন এবং তার গর্ভস্থ সন্তান যাতে সুনামের সঙ্গে সুখে জীবন কাটাতে পারে এই ছিল ব্রাহ্মণীর প্রার্থনা। ব্রাহ্মণী ন'মাসের অন্তঃসত্বা ছিলেন বলে মন্দিরে ঢুকতে পারেন নি। দূর থেকে মাকে প্রণাম জানিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণীর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

ফেরার পথে খেউড়া গ্রামে এসে ব্রাহ্মণী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরশীরা গ্রামের এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে ব্রাহ্মণীকে নিয়ে যান। আগেকার মানুষ অতিথি পরায়ণ এবং দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। বর্তমানে ভারতবাসী পাশ্চাত্য ভোগ বিলাসের মোহজালে পড়ে দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন।

গৃহস্থ অসুস্থ গর্ভবতী ব্রাহ্মণীকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে একটি আলাদা ঘরে আশ্রয় দিলেন। বাড়ীতে রান্নার যে বামুন ছিলো সে বামুনকে বলে দিয়েছিলেন তিনি যেন তার রান্নার সঙ্গে ব্রাহ্মণীর রান্নাও করে নেন। বড় গৃহস্থ বাড়ী। পরদিন এক বৃদ্ধা যিনি গ্রামে ধাই মা নামে পরিচিতা তিনি ব্রাহ্মণীর গর্ভ পরীক্ষা করে দেখে বললেন — দু-তিন দিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণী মা হবেন। ব্রাহ্মণী গর্ভের দিন গণনায় ভুল করেছেন।

গৃহস্থ গিন্নি ধাইমার কথা শুনে ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে তার বাড়ীর অবস্থা এবং খুটি নাটি বিষয় জেনে নিলেন। বুঝতে পারলেন এই অবস্থায় ব্রাহ্মণীকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে মহা অধর্ম হবে। গৃহস্থ গিন্নি ব্রাহ্মণীকে বললেন — তিনি তাদের বাড়ীতে তাঁর সন্তানের জন্ম দিন। ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি তার সন্তান নিয়ে তাদের বাড়ীতেই অতিথি হিসেবে থাকুন।

ব্রাহ্মণী খুশী হলেন। চারদিন পর বৃহস্পতি বারে ব্রাহ্মণী এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। ঐ গৃহস্থের বাড়ীতে মা ও মেয়ে চার মাস থাকলেন। এত দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণ বাড়ী না ফেরায় ব্রাহ্মণীর মনে একটা হতাশা জাগলো। তিনি একদিন ঠিক করলেন কন্যা সন্তানটি সহ কমলা সাগরের দীঘিতে আত্ম বিসর্জন দেবেন।

ভোর হবার আগেই ব্রাহ্মণী কন্যা সন্তানটিকে ঘুম থেকে তুলে কাঁথায় জড়িয়ে কোলে নিয়ে দীঘির পাড়ে এলেন। গঙ্গা দেবীর দয়া হলো। তিনি যুবতী বঁধূর বেশে ব্রাহ্মণীকে দেখা

দিলেন। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞেস করলেন কেন ব্রাহ্মণী মহা পাপ করে নরকে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

ব্রাহ্মণী তার করুণ কাহিনী বঁধূকে শোনালেন। বঁধূটি কেন এত ভোরে একাকী দীঘির পাড়ে এসেছেন বিস্ময়ে ব্রাহ্মণী তা জানতে চাইলেন।

বঁধূটি জানালেন তিনি মন্দিরে মায়ের সেবা কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। দীঘিতে স্নান করে মায়ের সেবার ফুল তুলতে হয়। বাসন পরিস্কার করতে হয়। সেজন্যই এত সকালে এসেছেন। বঁধূটি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞেস করলেন —

— ব্রাহ্মণী, আপনি কি চান না আপনার মেয়ে সুখে থাকুক। দীর্ঘ জীবন লাভ করুক?

— চাই। কিন্তু, সামনেতো আমার ভবিষ্যত অন্ধকারই দেখতে পাচ্ছি। আশার কোন আলোই দেখতে পাচ্ছিনা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মৃত্যু ছাড়া উপায় কি বলো?

— ব্রাহ্মণী, আপনি মায়ের মন্দিরে মায়ের কৃপা প্রার্থনা করতে এসেছিলেন। মা কি আপনাকে কৃপা করেন নি?

বঁধূর কথায় ব্রাহ্মণীর চৈতন্য হয়। মায়ের অশেষ কৃপার ফলেই গত চার মাস ধরে অপরিচিত এক কৃষক তাকে এবং তার মেয়েকে সাদরে সব রকরমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছে। ব্রাহ্মণী বললো - সত্যিই মায়ের অপরিসীম করুণা লাভ করেছি। কিন্তু মা, আমার ভবিষ্যত কেমন করে কাটবে? মেয়েটিকে কেমন করে বড় করে তুলবো। গৃহস্থের বাড়ীতে আর কতদিন পরে থাকবো?

— আমি শুনেছি দুর্গের সেনাপতির স্ত্রী একটি কন্যা সন্তানের জন্য মায়ের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তোমার মিষ্টি শিশু কন্যাটিকে পেলে সে সাদরে তার মেয়ে বলে গ্রহণ করবে। মেয়েটি ব্রাহ্মণের কন্যা। তারা ক্ষত্রিয়। বংশ পরিচয় পেলে মা মেয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। তুমি যদি মেয়েটিকে আমার কোলে তুলে দাও তাহলে সব কাজ সুন্দরভাবে আমি শেষ করে ফেলবো। তুমি গোপনে খোঁজ নিও তোমার মেয়ে সেনাপতির ঘরে স্থান পেয়েছে কিনা। তুমি রাজী?

— রাজী। মেয়ে সুখে থাকুক। বেঁচে থাকুক। মায়ের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

— তাহলে তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে, নিজের পরিচয় দিতে কোন দিন সেনাপতির কাছে আসবে না। তুমি ঐ গৃহস্থের বাড়ীও আর ফিরে যেওনা। অন্য কোন গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নাও। মা তোমার অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করবেন। একটি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তোমার ব্যবস্থা হবে। তুমি ঢাকা চলে যাও। সেখানেই সব পাবে।

— তাই হউক। মা কালীর নাম স্মরণ করে মা কালীর সেবার জন্যই আমি আমার শিশুকে তোমার কোলে তুলে দিলাম।

— তুমি কোন চিন্তা করো না। তোমার মেয়ে সুনামের সঙ্গে সুখে দীর্ঘজীবি হয়ে কাল কাটাবে। এই হলো ভক্তি মাতা সরস্বতীর জন্মের গোপন কথা। তারপরের কথা তো

তোমাদের বলেছি। এবার তাদের জল সমাধির কথা বলে আমার কথা শেষ করবো।

ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ব্রাহ্মণীর মায়ের সেবার কাজে নিযুক্ত হন। মৃত্যু পর্যন্ত ভাল ভাবেই জীবন নির্বাহ করেন। মা দয়াময়ীর দয়ার অন্ত নেই।

সত্যবতী, এই কমলাসাগরের দীঘি পাঁচশো বছরেরও বেশী সময় ধরে এলাকার মানুষের সুখ দুঃখের সাথী। এই দীঘিতে চৈত্র মাসেও পার ভরা জল থাকতো। জলের গভীরতা প্রায় পাঁচশো বছর পরেও চৈত্র মাসে দশ বারো হাত জল থাকতো। বর্ষায় এই দীঘিতে প্রায় বিশ বাইশ হাত জল থাকতো। এখন এই দীঘির অবস্থা দেখো। দীঘির জল বার করে দিয়ে দীঘির ভেতরে মানুষের বনভোজনের আয়োজন করেছে। কমলা সাগরের দীঘির শুধু সৌন্দর্যই এতে নষ্ট হয়নি। দীঘিতে গঙ্গা দেবী এবং মহারাণী কমলা দেবীর প্রিয় সখী কমলা দেবীও বাস করতেন। যারা ভগবান মানে না সময় কাটানোর জন্য বনভোজন করতে এখানে আসে তাদের অত্যাচারে ঐ দুই দেবী দীঘি ছেড়ে চলে গেছেন। যেখানে ভগবান নেই, ভক্ত নেই সেখানে সৌন্দর্য নেই। তোমাদের বর্তমান বক্সনগরের জীয়ন পুকুরের কাহিনী সংক্ষেপে বলছি শোন —

প্রায় দু হাজার বছর আগের কথা। তখন থেকে ভগবান বুদ্ধের অনুগামীরা সনাতন ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম নামে নূতন শাখার প্রচলন করেছে। ভগবান গৌতম বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধের ১২৬ তম অবতার। সূর্য বংশীয়দের একটি উপ শাখা হচ্ছে শাক্য বংশ। নেপালের পাদ দেশে কপিলাবস্তু নামক রাজ্যের রাজা ছিলেন শুদ্ধোধন। তারই পুত্র সিদ্ধার্থ তথা গৌতম বুদ্ধ।

বুদ্ধ সনাতন ধর্মের সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়ে সনাতন ধর্মের নিয়ম অনুসারে সাধনা করে বুদ্ধত্ব অর্থাৎ দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তবু ও তার অনুগামীরা সনাতন ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে গেলেন।

বর্তমান বক্সনগর বর্তমান বিশলগড় মহকুমার অধীন। এক সময় সোনামুড়ার অধীন ছিল। সোনামুড়ার প্রাচীন নাম সাভারমুড়া। সেখানেও ত্রিপুরার মহারাজের একটি গড় বা দুর্গ ছিল। নাম ছিল সাভারমুড়া গড়। সাভার মুড়া গড়ের আশ পাশ এলাকায় মহারাজের মহিষের একটি খামার ছিল। চতুর্দশ দেবতা, ভুবনেশ্বরী এবং ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে বছরে একবার একটা করে মোষ বলি দেওয়া হতো। এই মহিষ সরবরাহ করা হতো সাভারমুড়া থেকে।

আরাকানের রাজা শিকান্দার শাহ ছিলেন দেবী গঙ্গার আত্মীয়। বর্তমান কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি এলাকা সমুদ্রের তলায় ছিল। বক্স নগরের নাম ছিল ব্রাহ্মণা নগর। সে সময়ে রাজা ছিলেন মুকুট রাজা। ত্রিপুরায় মুকুট মাণিক্য নামে এক রাজা ছিলেন। ঐ মুকুট রাজা ছিলেন আরো প্রায় দেড় হাজার বছর আগে।

সেকন্দর শাহ্ এর একমাত্র পুত্রের নাম ছিল সদা শাহ। তার খুড়তুতো এক ভাই ছিল তার নাম ছিলো ছেদু শাহ্। সেকন্দর শাহ্ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার পুত্র সদাশাহ এবং

ছেদু শাহ একবার দেশ ভ্রমেণ বের হন। মুকুট রাজা দেবী গঙ্গায় তপস্যা করে দেবী গঙ্গার কাছ থেকে একটি বর লাভ করেছিলেন। দেবী গঙ্গা বলেছিলেন — রাজবাড়ীর অন্দর মহলে যে দীঘি আছে সেই দীঘির জল কোন মৃত জীবের গায়ে ছিটিয়ে দিলে সেই জীব আবার জীবিত হয়ে যাবে। গঙ্গা দেবী অংশত সেই দীঘিতে অবস্থান করতেন।

মুকুট রাজার পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। সদা শাহ ঘুরতে ঘুরতে একবনে সখীগণ সহ সেই রাজকন্যার দেখা পান। রাজকন্যা ও রাজকুমার উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হন। রাজকন্যা সদা শাহকে রাজকন্যার পরিচয় দিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন। সদা শাহ সেই রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য মাসী গঙ্গা দেবীর আরাধনা করতে থাকেন। গঙ্গা দেবী জানতেন তার আত্মীয় সেকন্দর শাহ সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে। সনাতন ধর্ম মানব ধর্ম। যে যেভাবেই উপাসনা করুক পরম ব্রহ্মই সেই উপাসনা গ্রহণ করেন। সে জন্যই ভগবান বিষ্ণু ও ভগবান শিবের হাজারো নাম। দেবী গঙ্গা সদা শাহ এর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। তাকে আকাশ পথে চলার ক্ষমতা দিলেন।

সদা ও ছেদু শাহ ব্রাহ্মণা নগরে এলেন। ছেদুকে দূত হিসেবে পাঠিয়ে মহারাজের কাছে রাজকন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালেন। সদা শাহ সনাতন ধর্ম ত্যাগ করেছে। তাই তিনি তার মেয়েকে সদা শাহ এর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হলেন না। যুদ্ধ করেও সদা শাহ কোন কিছু করতে পারলেন না। তখন সদা শাহ আবার গঙ্গার আরাধনা শুরু করলেন। গঙ্গাকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে সব কথা জানালেন। গঙ্গা ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে জিয়ন পুকুর ত্যাগ করতে রাজী হলেন। কেমন করে দীঘির জল অপবিত্র করতে হবে সে উপায়ও বলে দিলেন।

ছেদু শাহ গঙ্গার বরে বলিয়ান হয়ে প্রতিদিন মুকুট রাজার প্রচুর সৈন্য হত্যা করতেন। পরদিন ভোরে মুকুট রাজা দেবী গঙ্গার পূজা করে দীঘির জল মৃত সৈনিকদের উপর ছিটিয়ে দিতেন। সৈন্যরা আবার জীবিত হয়ে উঠতো। সদা শাহ এর প্রার্থনায় দেবী গঙ্গা জীয়ন পুকুর ত্যাগ করেন। পুকুরের জল অপবিত্র করায় আর কোন মৃত সৈন্যকে জীবিত করা সম্ভব হলো না। মহারাজ তার মেয়েকে সদাশাহ এর সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। মুসলমান শাসকরা ব্রাহ্মণা নগরের নাম পরিবর্তন করে বকমস নগর রেখেছে। এই দীঘির জলও অপবিত্র করা হয়েছে। তাই দীঘি শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

সত্যবতী, কসবা কালী মায়ের মন্দিরে বেলা একটা পর্যন্ত ভীড় হতো। বৈশাখ ও ভাদ্র মাসের মেলায় সীমান্তের উপারের দূরবর্তী গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার হিন্দু ভক্তরা আসতেন। ক্ষমতালোভীদের দ্বারা ভারত মায়ের অঙ্গচ্ছেদ করে ধর্মের বিত্তিতে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের নেতারা পাকিস্তানকে ইসলামিক দেশ ঘোষণা করায় সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতির মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। হাজারে হাজারে শরণার্থী ধর্ম রক্ষায় আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলায় চলে আসতে থাকেন। ১৯৭৭ সালের পর থেকে হিন্দুদের সঙ্গে হাজার হাজার মুসলমানও ঐ রাজ্যগুলোতে

অবৈধ অনুপ্রবেশ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উপর বিষময় প্রভাব ফেলেছে।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো পালিত কন্যা ভক্তি আর শ্রীশ্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ার অহৈতুকী কৃপা। আসলে তুমি ঠিকই বলেছ মায়ের স্থান আমাদের হৃদয়ে। তিনি জ্ঞান সরূপিনী, ভক্তি স্বরূপিনী। শ্রদ্ধা স্বরূপিনী। শক্তি বিহনে শক্তিমানের কোন ক্ষমতা নেই। ভগবান শ্রীহরি নারদকে বার বার এই কথা বলেছেন।

পরমব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্মময়ীর মিলিত ও অভেদ সত্বাই হচ্ছে শক্তি ও শক্তিমানের বহিঃপ্রকাশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। তিনি লীলা প্রকাশের জন্য সগুণ হয়েও নির্গুণ। আমরা মনের মাধুরী, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভালবাসা দিয়েই গড়ে তুলি আমাদের দেব-দেবীর প্রতিমা। পরম ব্রহ্মের যে নিরাকার রূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেই বর্ণনার সঙ্গে আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা গঠিত সাকার দেব-দেবীর কোন তুলনাই হয় না। তোমরা আমার সামনে বসে রয়েছ। চোখ বুজে তোমাদের কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যখন আমার সামনে থাকবে না এখন তোমার যে পরিচিত রূপ আমার চোখের তারায় এবং মনের মাঝারে ধরে রাখা হয়েছে তা দিয়ে তোমার রূপ চিন্তা করবো। যে পরমব্রহ্মকে আমরা কখনো দেখিনি যাকে শুধুমাত্র উপলব্ধি করা যায় তার রূপ মনের মন্দিরে স্থাপন করা কষ্টকর। তাই মুনিগণ সাকার উপাসনার উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সাকার উপাসনা সহজ। নিরাকার উপাসনা কঠিন। মুনি-ঋষিগণ সাকার থেকেই নিরাকার উপাসনার পথ ধরেছেন।

সত্যবতী, সোনামুড়া মেলাঘরে এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী হলেও পরম ভক্ত ছিলেন। রামঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। সাধন ভজন করতে করতে তাঁর চেহারাও অনেকটা রামঠাকুরের মতো হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ তিনি রামঠাকুরের সারূপ্য লাভ করেছিলেন। তার নাম ছিলো বিরাজ মোহন সাহা। তিনি কয়েকবারই ভাগবত যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। একবার তিনি সাতদিন সাত রাত নিরবিছিন্ন ভাগবত পাঠের আয়োজন করেছিলেন। এমন মহৎ যজ্ঞ ত্রিপুরায় আর কখনো হয়নি।

ভারতে সনাতন ধর্মে এখন হাজারো সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন করে বৌদ্ধ, ইসলাম, শিখ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও কয়েকটি সম্প্রদায় যারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে তারা সনাতন ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি হলো — সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, ভালবাসা, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি। মুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণ ঐসব কথা বললেও তাদের বাস্তব জীবনে সেসব পালন করেন না।

বিরাজ বাবুর বাড়ীতে সাতদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাগবত পাঠে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাঠক ছিলেন। তারা তাদের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য

সম্প্রদায়ের দ্বারা রান্না এবং পরিবেশন করা খাবার খেতে আপত্তি করেছিলেন। ঐসব পাঠকগণ যখন মঞ্চে উঠে ভাগবত পাঠ করেন তখন তাদের এক রূপ আর যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসেন তখ ন তাদের অন্য রূপ। বিরাজবাবু সন্ন্যাসীদের জন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য, কালাচান্দ সম্প্রদায়ের ভেক্‌ধারী বৈষ্ণবদের জন্য, গৃহী বৈষ্ণবদের জন্য এবং সাধারণ ভক্তদের জন্য ঐ সব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই সেবক নিযুক্ত করে আলাদাভাবে রান্না ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধর্মগুরুদেব ঐ রকম আচরণে সকল দেব-দেবী অবশ্যই মন কষ্ট পেয়েছিলেন। কারণ যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ জ্ঞান এবং বৈষম্য থাকে ভগবান সেখানে অবস্থান করতে পারেন না। আমারও ঐ ব্যবস্থায় খুব দুঃখ হয়েছিল। প্রসাদ গ্রহণ না করেই চলে আসতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভক্ত বিরাজ বাবু নিজে যখন অন্যদিন তার ইষ্ট দেব এর কাছে শ্রদ্ধা ভরে ভোগ নিবেদন করেছেন তখন অবশ্যই তার ইষ্টদেব সেই ভোগ গ্রহণ করেছেন। তোমাদের ঐ কথা এজন্য বললাম — মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করার মতো পাপ আর নেই।

সত্যবতী, ভক্তিমাতা সরস্বতী আর পরমানন্দ গিরি মহারাজ দুজনেই খেচরী মুদ্রায় সিদ্ধ ছিলেন। খেচরী মুদ্রা সম্পর্কে তোমাদের বলেছি। দূরদর্শনের কল্যাণে তোমরা রামায়ণ এবং মহাভারতের বহু কাহিনী দেখেছ। দুর্বাশা ঋষি সহ অনেক ঋষি জল স্তম্ভন করে জলের নীচে সাধন ভজন করেন। আর খেচরী মুদ্রার দ্বারা মুনি-ঋষিগণ তাদের পরমায়ু এবং যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেন। মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, পরমানন্দ গিরি এবং ভক্তিমাতা সরস্বতী খেচরী মুদ্রা দ্বারা যৌবনকে ধরে রেখেছিলেন। সেজন্যই তাদের জল সমাধির কথা শুনে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য চমকে উঠেছিলেন। তার মৃত্যুর পর জল সমাধি নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা নিভৃতে মহন্ত মহারাজ এবং ভক্তি মাতা আলোচনা করেন। জীবনের শেষ ভাগে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ভক্তি মাতার কাছ থেকে গীতার ভক্তি যোগ ও মোক্ষ যোগ শুনে জীবনের যে কয়টা দিন বেঁচে ছিলেন সে মত ও পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

শান্তনু বললো — মাতাজী, আপনি ভক্তিমাতা সরস্বতীর নাম এবং উপাধি গ্রহণ করেছেন। নাম এবং উপাধি গ্রহণের মধ্যে কি কোন বিশেষ কারণ রয়েছে?

— তোমার বাবা-মা তোমার নাম রেখেছেন শান্তনু। কুরু বংশের এক বিখ্যাত রাজার নামের অনুকরণে তোমার নাম রাখার দুটো কারণ রয়েছে একটি কারণ হলো প্রিয়জনদের বিখ্যাত ব্যক্তির নাম রাখার মধ্যে তাদের নাম স্মরণে রাখা। দ্বিতীয় কারণ হলো — সন্তান যেন নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবন ধারণ করতে পারে। ভক্তি মাতা সরস্বতী জন্ম সিদ্ধ সাধিকা। সে কারণেই গুরুদেব আমার নাম ও সেই সাধিকার নামে রেখেছেন ভক্তি মাতা সরস্বতী। ঠিক বলেছি তো? কল্যাণ সাগর দীগির পাড় বাঁধানোর ফলে কচ্ছপের বংশ রক্ষার

সংকট দেখা দিয়েছে। মায়ের মন্দিরের জায়গা বেদখল হতে হতে শুধু মন্দিরের জায়গা টুকুই রক্ষা পেয়েছে। একদিন হয়তো মন্দির ভেঙ্গে ফেলে শুধু পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার দাবি উঠবে। ধর্মকে আমরা রক্ষা না করলে ধর্ম আমাদের রক্ষা করবে না। দীঘির জল কমে যাওয়ায় নিশ্চয়ই তাদের সাধন ভজনে অসুবিধা হচ্ছে। জগতের কল্যাণের জন্যই সাধক সাধিকাগণ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। পরমাত্মা ভগবান কিংবা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন। ভক্তের পদধূলিতে মন্দির, তীর্থস্থানে পরিণত হয়। মন্দিরে কতভাবে কত ভক্ত আসেন তার হিসেব কে রাখে। তোমাদের তো বলেছি সাধক সাধিকার চারটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। শিশু ভাব। ক্ষ্যাপা ভাব। পিশাচ ভাব এবং জড় ভাব। কোন কোন সাধকের মধ্যে আবার চারটি ভাবেরই প্রকাশ ঘটে। কাজেই মন্দিরে এবং তীর্থ স্থানে কারো প্রতি কোন অনাদর প্রকাশ করা ঠিক নয়।

— সত্যবতী বললো — মাতাজী, বেলা প্রায় এগারটা থেকে আমরা আপনার সঙ্গে রয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপনার কি মনে হয়েছে এই মন্দিরে এই বিশেষ দিনে কোন সাধক সাধিকার আগমন ঘটেছে?

— সকালে যখন মায়ের নাট মন্দিরে ছিলাম তখন এক সন্ন্যাসীকে দেখেছিলাম। সৌম্য দর্শন। পরনে গেরুয়া। হাতে নারকেলের কমণ্ডলু। বগলে ছোট্ট এক টুকরো কম্বল। সৌম্য চেহারা আর মিষ্টি স্বভাব দেখে মনে হয়েছিল তিনি সিদ্ধ পুরুষ। বাড়ী উদয়পুর।

— তিনি কি এখনো মন্দিরে আছেন?

— খোঁজ করে দেখতে পারো।

— মাতাজী আপনি তাহলে একটু বিশ্রাম নিন। আমরা যাব আর আসব।

— আমি সন্নাসিনী। অনেকক্ষণ তোমাদের সঙ্গে রইলাম। আমিও একটু এদিক সেদিকঘুরে দেখি।

শান্তনু আর সত্যবতী মন্দিরে এলো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দু-একজন ভক্ত এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছেন। কোন সন্ন্যাসী নেই।

মন্দিরের পুরোহিত দুজন বয়সে নবীন। শান্তনু একজনকে জিজ্ঞেস করলো ঠাকুর মশায় সকালের দিকে যে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন তিনি কি চলে গেছেন?

— মনে হয়। এখন তো কোন সন্ন্যাসীকে দেখছি না। সকালে একজনকে দেখেছিলাম বটে। ভেবেছিলাম তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবো। সময় পাইনি। আজকে তো বিশেষ পূজার দিন। সকাল থেকেই ভক্তের আনাগুনা ছিল। শুনেছি আজকের দিনে রাজ আমলে হাজার হাজার ভক্ত আসতেন। মায়ের মন্দিরে বৈশাখী অমাবস্যায় আর ভাদ্র অমাবস্যায় অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে বলে শুনেছি। মা কালী এবং বাবা ভোলানাথ বহুবার বহু ভাবে বহু ভক্তকে কৃপা করেছেন। আমাদের তো বিশ্বাস কম তাই ভগবানের লীলা বুঝতে পারি না।

শান্তনু আর সত্যবতী মাকে প্রণাম করে নীচে দীঘির পাড়ে নেমে এলো। মাতাজীকে

দেখতে পেলো না। দীঘির পাড়ের মাঝামাঝি স্থানে তার কাঁটার বেড় দেওয়া হয়েছে। তীর্থ যাত্রীরা এখন আর বাংলাদেশ থেকে এই পূণ্য দিনে আসতে পারেন না। দীঘির জল কমিয়ে দীঘির ভেতর যে সব বন ভোজনের স্থান করে দেওয়া হয়েছে তাদের কোনটি থেকে পোঁড়া কাঠের ধোঁয়া উঠছে।

এখন অনেকেই কাঠ না এনে গ্যাসের সিলিন্ডার এবং চুল্লি সঙ্গে নিয়ে আসে। শান্তনু আর সত্যবতী চারদিকে ভাল করে লক্ষ্য করলো। মাতাজী চলে গেছেন। দুজনেই মনে বিরাট শূন্যতা বোধ করলো।

দুজনে আবার আগের জায়গায় বসলো। সত্যবতী হাতের ঘড়িতে সময় দেখে বললো — আমরা আরো আধ ঘন্টা বসতে পারি। শান্তনু, আজকের দিনটা আমাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে - তাই না ?

— হ্যাঁ। মাতাজী কেমন করে শাস্ত্রের এবং ইতিহাসের এত কথা জানলেন তা ভাবতে অবাক লাগছে।

— মাতাজীও হয়তো উচ্চ শিক্ষিতা। স্কুল কলেজের পাশের বই ছাড়াও আরো অনেক বই পড়েছেন। জ্ঞানের কোন সীমা নেই। অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের কতটুকুই বা আমরা জানি। তবুও আমাদের অহংকার হয়।

— মাতাজী ছদ্মবেশী কোন দেবী কিনা ছায়া পরীক্ষা করলে বুঝতে পারতাম।

— বাংলায় একটা প্রবাদ আছে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমাদেরও হয়েছে সে রকম অবস্থা। আমরা বট গাছের ছায়ার নীচে বসেছি। ছায়া পরীক্ষা করার সুযোগও আমাদের ছিল না।

— বাংলাদেশের কিশোর কিশোরীদের দেখো তার কাঁটার ফাঁক দিয়ে কেমন করে তীর্থ যাত্রীদের এবং ভ্রমণ বিলাসীদের দেখছে।

— মানুষের মিলনের পথ মানুষই বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিভাজন মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। মাতাজী আমাদের এতক্ষণ যে সব কথা শোনালেন তাতে পরিস্কার যে ভগবানের সৃষ্টিতে কোন ভেদাভেদ নেই। ভেদাভেদ সৃষ্টি করে মানুষ নিজেদের মধ্যে অশান্তি ডেকে এনেছে।

— মা বাবার মুখে শুনেছি কোন কোন ভাগ্যবানরা ভগবানকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভগবান তার রূপ নিয়ে সাধারণ ভক্তকে দেখা দেন না। ভগবানের রূপ দর্শন করে সহ্য করার মতো ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদ্যাশক্তি এর পরম ব্রহ্ম মানুষের রূপেই মানুষকে দর্শন দিয়েছেন। আমাদের এই দিব্য দর্শনের কথা, আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার কথা আমরা অন্য কাউকে বললে হয়তো গল্প বলে হেসেই উড়িয়ে দেবে।

— তাতে কি হয়েছে, পৃথিবীতে যত মন্দির হয়েছে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এর অধিকাংশই হয়েছে স্বপ্নাদেশ বা স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে। আর আমাদের বেলায় যা হয়েছে তা স্বপ্ন নয় বাস্তব। দিনের বেলায়, প্রকাশ্যে মাতাজীর বেশে হয়তো মা কালী নয়তো পরম

সাধিকা ভক্তিমাতা সরস্বতী আমাদের ত্রিপুরার দুই তীর্থের কথা বলতে গিয়ে এক বিশাল ইতিহাসের কথা বলে ফেললেন। ঐ দেখো পরমাসুন্দরী, মধ্যবয়সী আর এক মাতাজী আমাদের দিকেই ধীর পদে এগিয়ে আসছেন।

— সেই মাতাজী কিংবা মা কালীই আবার অন্য রূপে আমাদের দেখা দিতে এলেন কি না কে জানে ! সূর্যের আলো থাকলে মায়ের ছায়া আছে কিনা পরখ করে দেখতে পারতাম। মা এমন সময়েই আমাদের দেখা দিলেন যখন গোধূলী বেলাও শেষ পর্যায়ে।

— শান্তনু, আনন্দে আমার শরীর বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছে। শুনেছি যে সাধক বা সাধিকাকে দেখলে আনন্দ হয়, ভগবৎ ভক্তি জন্মে সেই সাধক বা সাধিকাকে সিদ্ধ পুরুষ বা সিদ্ধামাতা বলে অভিষিক্ত করা হয়। মাতাজীকে দেখে তোমার কেমন লাগছে?

— আমার মনও আনন্দে ভরে উঠেছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। মাতাজীকে আমরা সহজে ছাড়ছিনা। মাতাজীর পরিচয় জেনে নেবই।

— কিন্তু, আমাদের যাওয়ার সময় যে হয়ে এলো। দেখি মা আমাদের নিয়ে কি লীলা করেন। মা কালী আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দান করুন।

— তুমি সত্যি কথাই বলেছ। মায়ের উপরই সব ছেড়ে দেওয়া ভাল। ভগবান স্বয়ং মহামায়াকে নিয়ে লীলা করেন। মানুষ মায়ার প্রভাবে পুতুলের মতো অভিনয় করছে। আমরাও পুতুল মাত্র। যেমন খেলায় তেমনি খেলি।

মধ্য বয়স্কা অপূর্ব মুখশ্রী সন্ন্যাসীনি দীঘির পাড়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার পরনে লাল পাড় দামী গরদের শাড়ী। ডান হাতে প্রায় এক হাত লম্বা একটা পিতলের ত্রিশূল। বাঁ হাতে একটা মাঝারি আকারের পিতলের কমন্ডলু। কপালে জ্বল জ্বল করছে একটা সিঁদুরের টিপ। ঘন কালো চুলের রাশি কোমর ছাড়িয়ে গেছে। শান্তনু ও সত্যবতী কমলা সাগরের মায়ের আসার পথে মুখ করে বসেছিলো। প্রায় দশটায় এখানে এসে বসেছে। এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। একটু পর পর রেল পথ দিয়ে কখনো মালবাহী রেল, কখনো যাত্রীবাহী রেল চলাচল করছে। স্থানীয় রেলগুলো কমলাসাগর ষ্টেশনে মিনিট দু-এক এর জন্য যাত্রা বিরতি করছে। এখানের ষ্টেশনটি খুবই ছোট। যে উদ্দেশ্যে বৃটিশরা এখানে রেল ষ্টেশন তৈরী করে দিয়েছিল তা এখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কাছে বড় কোন গ্রাম বা হাঁট বাজার নেই। তাই খুবই কম সংখ্যক যাত্রী উঠানামা করছে।

যে সব ট্রেন এই ষ্টেশনে থামে না সে সব ট্রেন দূর থেকেই হর্ন দিয়ে আসে। যে মুহূর্তে সন্ন্যাসিনী তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সে সময়েও একটি মালবাহী ট্রেন হর্ন দিতে দিতে ষ্টেশন অতিক্রম করছিল। মাতাজী যেন ট্রেন চলে যাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দুই যুবক যুবতী সে সময় উদাসভাবে মালবাহী গাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। উভয়ের মন থেকেই দীর্ঘশ্বাসে একই সময়ে বের হয়ে এসেছিল। দুজনেই মনে মনে ভাবছিল ত্রিপুরার এই রেলপথটা যদি স্বাধীনতারে পর ত্রিপুরাতেই থেকে যেতো তা হলে ত্রিপুরাবাসী কতইনা উপকৃত হতেন।

ক্ষমতার লালসা মানুষকে হিতাহীত জ্ঞান শূন্য করে দেয়। ত্রিপুরা তার উদাহরণ।

সন্ন্যাসিনী সত্যবতী ও শান্তনুর কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। দুজনেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। একে একে দুজনেই মাতাজীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

মাতাজী ডান হাতে অভয় মুদ্রা দেখিয়ে পাশে বসলেন। বললেন — তোমাদের দুজনেরই কল্যাণ হউক। বাবা শান্তনু, পৃথিবীর সব কিছুই তো নশ্বর। এই কমলা সাগর দীঘি দেখতে দেখতে পাঁচশো বছর পার করে এসেছে। যখন এই দীঘি থাকবে না তখন কমলা দেবীর নামও হারিয়ে যাবে। স্মৃতি বিস্মৃতি নিয়েই এই জগৎ। যা সত্য, নিত্য তাই থাকবে আর সব কালের গতিতে হারিয়ে যাবে। পাঁচশো বছর আগে দীঘির গভীরতা ছিল কুড়ি পঁচিশ হাত। এখন ছ-সাত হাত। আরও পাঁচশো বছর পর দীঘি কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

তোমাদের আগরতলা শহরের হাওড়া নদীর কথাই ধরো। পঞ্চাশ বছর আগে কুমিল্লা থেকে নৌকায় করে হাওড়া নদী দিয়ে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আসতো। নদীতে পাঁচ ছয় হাত জল থাকতো। এখন হাঁটু জল। আর পঞ্চাশ বছর পর হাওড়া নদীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

সত্যবতী বললো — মা, আপনি তো বিনা দ্বিধায় আপনার পা ছুঁয়ে আমাদের প্রণাম করতে দিলেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে অনেক সাধু সন্ত আপত্তি করেন। আপনি আপত্তি করলেন না কেন?

— মা, প্রত্যেকের ভেতরেই পরম ব্রহ্ম ভগবান এবং আদ্যাশক্তির অবস্থান রয়েছে। আমরা মুখেও বলি যত্র জীব তত্র শিব। বৈষ্ণবগণ আর একজন বৈষ্ণব দেখলে জয় রাধে কৃষ্ণ, বা ওঁ নমো নারায়ণায় বলে সম্বোধন করেন। এখন বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভক্তরা তাদের গুরু নির্দেশিত সম্বোধন শব্দে সম্বোধন করে থাকেন। শৈবরা আর এক শিব ভক্তকে দেখলে ওঁ নমো শিবায় বলেন। আর মায়ের ভক্তরা জয় মা বলে থাকেন।

তোমরা তো মায়ের কাছে শুনেছ প্রকৃতির পাঁচ উপাদান দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত। প্রতি মুহূর্তে আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে বাঁচার উপাদান গ্রহণ করি। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যেই আমরা বসবাস করছি। অনেক সন্ন্যাসী আছেন তারা নারীর কাছ থেকে দূরে থাকেন। নারীর স্পর্শ এড়িয়ে চলেন। সেটা তাদের মনের দুর্বলতার জন্য। পুরুষ ও প্রকৃতিতে তাদের ভেদ জ্ঞান রয়েছে বলেই তারা এমন করছেন।

মহামতি শুকদেব বার বছর মাতৃ গর্ভে ছিলেন। মাতৃগর্ভে থেকেই তিনি সর্বশাস্ত্র শিক্ষা করেন। জন্মের পর তিনি বার বছরের যুবক। শারিরিক দিক থেকে পূর্ণ যুবক। তিনি বনে তপস্যার জন্য ছুটে চললেন। গায়ে এবং পরনে কোন পরিধান নেই। বৃদ্ধ ব্যাসদেব পুত্রের মায়ায় হা পুত্র, হা-পুত্র বলে পিছু ছুটছেন পুত্রকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য।

বনের ভেতরে এক সরোবরে দেবকন্যা, গন্ধর্ব কন্যাগণ স্নান করছিলেন। তারা পোষাক খুলে খালি গায়ে নগ্ন অবস্থায় স্নান করছিলেন। শুকদেব গোস্বামী সেই সরোবরের পাশ দিয়ে

চলে গেলেন। যুবতী দেব ও গন্ধর্ব কন্যাগণ তাকে উলঙ্গ দেখেও তাদের মনে কোন বিকার দেখা দিল না। কিন্তু যখন ব্যাসদেবকে তারা দেখতে পেলেন তখন সবাই জল থেকে উঠে পোষাক পরে নিলেন।

জ্ঞানী ব্যাসদেব এটা লক্ষ্য করে যুবতীদের এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। এক যুবতী বললেন — ব্যাসদেব, আপনি পরম জ্ঞানী হলেও আপনার মনে স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান রয়েছে। সেজন্যই আমরা পোষাক পরেছি। আপনার পুত্র যুবক হলেও তার মধ্যে স্ত্রী পুরুষে ভেদ জ্ঞান নেই। তাই তাকে দেখে আমাদের লজ্জা হয়নি।

আমরা যতক্ষণ প্রকৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছি ততক্ষণ আমরা দূরে থাকলেও পৃথিবীর অনু পরমাণুর মাধ্যমে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই যারা বলেন পাঁ ছুঁয়ে প্রণাম করো না তারা প্রকৃতির লীলা না বুঝে অথবা অজ্ঞানতা বশতই এমন বলে থাকেন।

কেউ কেউ বলেন — কোন রোগী গুরুদেবকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে তার রোগ গুরুর দেহে সঞ্চারিত হতে পারে। আরে ভগবানের বা মায়ের ইচ্ছে ছাড়া কি তা কখনো সম্ভব? গুরুর কাজ হচ্ছে শিষ্যকে জাগতিক ও ঐশিক দু জগতের ভাবের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। শিষ্যের কল্যাণ করা। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে বেশি কিছু বলার সুযোগ নেই। সপ্ত ঋষির এক ঋষি অত্রির বিয়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলে আমি উঠে পড়বো।

অত্রি ঋষি, তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা সকলেই বেদ এর মন্ত্র রচনা করেছেন। সেই অত্রি ঋষি এক বিখ্যাত আশ্রমে আসার পথে শুনলেন — এক পরম বিদুষী রাজকন্যা যিনি রাজ্য সুখ ত্যাগ করে আশ্রমবাসী দাদুর কাছে এসে আশ্রমিক জীবন যাপন করছেন তার যোগ্য পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। রাজকন্যাও যোগ্যপাত্র ছাড়া বিয়ে করবেন না। এমতাবস্থায় একদিন দাদু আদেশ দিলেন তিনি কন্যার কোন কথাই আর শুনবেন না। ভোরে ঘুম থেকে উঠে নদীতে স্নান করে যে পুরুষকে দেখবে সেই পুরুষের গলাতেই বরমালা দিতে হবে। সেই পুরুষের বয়স, জাত, শিক্ষা, শারিরীক অবস্থা কোনটাই বিচার করা চলবে না। কন্যা রাজী হলেন।

মহর্ষি অত্রি দুজনের কথা শুনে এক কুষ্ঠ রোগীর বেশ ধারণ করে রাজকন্যা নদীতে স্নান করতে যাওয়ার পর পথের পাশে এক গাছের নিচে বসে রইলেন। ক্ষতস্থান গুলোতে পোকা কিল বিল করছিল। রাজকন্যা স্নান করে মালা হাতে কয়েক কদম এগিয়ে এসে অতি বৃদ্ধ কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন।

রাজকন্যা শিবের কঠোর তপস্যা করেছেন। শিবের মতো সর্বগুণ সম্পন্ন পতি লাভের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ভগবান শিব এমন একজনকে স্বামী হিসেবে পাঠানোয় বিন্দুমাত্র শিবের প্রতি বিরক্ত হলেন না। এটাও শিবের আশীর্বাদ ধরে নিয়ে সেই বৃদ্ধ কুষ্ঠ রোগীর গলায় মালা দিলেন। কুষ্ঠ রোগী নিজের শারিরীক অবস্থার কথা বলে কন্যাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। আসলে ঋষি অত্রি রাজকন্যার ভগবানের প্রতি কতটা বিশ্বাস রয়েছে তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

কন্যার সঙ্গীরা আশ্রমে গিয়ে এই সংবাদ জানালেন। আশ্রমবাসী রাজা মনে খুব আঘাত পেলেন। নিজেকে সংযত করে সেই গাছের তলায় কুষ্ঠ রোগীর সামনে এলেন। বেদ বিধি অনুসারে আশ্রমে গিয়ে কন্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন।

মহর্ষি অত্রি বললেন — মহারাজ, আপনি মনে কষ্ট পেলেও এই রাজকন্যা এই ঘটনাকে দৈব ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছে। কন্যার ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে আমি নিশ্চিত যে এই কন্যা সাংসারিক জীবনে সাধন পথের অন্তরায় হবে না। আমি ঋষি অত্রি। আপনাদের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে রাজকন্যাকে পরীক্ষার নিমিত্ত কুষ্ঠ রোগীর বেশ ধারণ করেছিলাম। ঋষি পরম সুন্দর ও যুবক ছিলেন। তাদের মধ্যে বিয়ে হলো। জগৎবাসী উপকৃত হলো। কেউ কারো পাপের ভাগ দিতেও পারে না নিতেও পারেনা। মহর্ষি বাল্মীকি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাহিনী পড়লেই তা তোমরা জানতে পারবে।

শান্তনু বললো — মাতাজী আপনার আশ্রমে একদিন যাবো। আপনার আশ্রম কোথায়?

— বাবা, আমার আশ্রম দেবীপুরে। মনের জোর থাকলে দেব দর্শন ও সাধু দর্শন হয়। যাবার আগে তোমাদের একটা কথা বলে যাই — সত্যই ধর্ম। সত্যকে জানাই ভগবানকে জানা। সত্যকে জানতে হলে মা বাবাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। মা বাবার আদেশ পালন করতে হবে। সত্য পথে চলতে হবে। সত্য কথা বলতে হবে। সৎ ভাবনা ভাবতে হবে। সদোপদেশ গ্রহণ করতে হবে। সৎ উপদেশ দিতে হবে।

সমাজের অবক্ষয়ের জন্য আধুনিক মা বাবাই দায়ী। আধুনিক মা বাবাদের জন্যই তাদের সন্তান শৈশব থেকেই সত্য পথে না চলে অসৎ পথে চলতে শুরু করে। মন্দির, বিগ্রহ এসবের চেয়েও ঘরের জীবন্ত বিগ্রহ মা-বাবার সেবা করলে ভগবান লাভ অনেক সহজ হয়। মা-বাবার সেবায় কেমন ফল পাওয়া যায় ধর্ম ব্যাধ এর কাহিনী পড়লে বা শুনলেই সব জানা যাবে।

মেয়েরা এখন স্বামীকে অবহেলা করে। যে সব মেয়ে স্বামীকে শ্রদ্ধা করে, সন্তানকে গোপাল জ্ঞানে সেবা করে তাদের ছেলে মেয়ে সব দিক থেকেই ভালো হয়। তোমরা যদি ভবিষ্যতে সংসার ধর্ম পালন করো তাহলে অচেনা মাতাজীর এই সামান্য কথাগুলো স্মরণে রেখো। তোমাদের কল্যাণ হবে।

আজকাল অনেকেই ধর্ম বিপন্ন বলে চিৎকার করে। সত্য তথা ধর্ম কখনো বিপন্ন হয় না। সত্য থেকে তথা ধর্ম থেকে সরে গিয়ে মানুষ নিজেকে বিপন্ন করে তুলে। সত্যকে ধরলেই মঙ্গল। অসত্যকে গ্রহণ করলেই অমঙ্গল তথা বিনাশ। তোমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করো এই আশীর্বাদ রইলো।

সত্যবতী, তোমাদের আর একটা কথা বলি — আমরা অনেক সময় সাধু সন্তদের মুখে শুনি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ভগবান বা ব্রহ্ম ছাড়া জগতের যা কিছু সব অলীক কল্পনা মাত্র। এসব কথা শুনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ভগবান ছাড়া জগৎ মিথ্যা হলে এই জগৎ, আমার, আমাদের অস্তিত্ব সব কিছুই কি মিথ্যে? এই ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ

মিথ্যা প্রসঙ্গ নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ অনেক বই লিখেছেন। সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে এক সময় এ নিয়ে প্রচণ্ড মত বিরোধ দেখা দিয়েছিল।

আধুনিক যুগের পণ্ডিত সমাজ ঐ বিবাদকে অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। তাদের মতে ভগবান শংকরাচার্য যে স্তরে যে সময়ের প্রসঙ্গক্রমে এই কথা বলেছেন তার সঠিক ব্যাখ্যা হয়নি।

ভগবান শংকরাচার্য এমন এক স্তরে এই দর্শনের কথা বলেছেন যে স্তরে খুব কম সংখ্যক সাধু সন্তের প্রবেশ সম্ভব। তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় সমগ্র জগতে পরম ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন করেছেন। সেই পরম জ্যোতি ভিন্ন তার দর্শনে তখন কিছুই ছিল না। নিজের অস্তিত্ব পর্যন্তই ছিল না। ঐ সময়ের জন্য ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

গৌড়াঙ্গ মহাপ্রভু যখন পুরীতে কাশী মিশ্রের বাগান বাড়ীতে গম্ভীরায় বাস করতেন তখন সমাধিস্থ অবস্থায় বহুবার উপলব্ধি করেছেন এই জগতে কৃষ্ণ ভিন্ন আর সব মিথ্যা। সমাধি অবস্থায় সমস্ত জগতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। তার সেই ভাব অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ তাই লিখেছেন — "যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে"। যেদিকে চাই শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিবারে পাই। তা হলে ভগবান শংকরের এ জগৎ ব্রহ্মময়। আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এ জগৎ কৃষ্ণময়" দুটো বাণীর মূল কথার একই অর্থ হলো। সাধক সাধিকার যখন সমাধি অবস্থা তখনি এমনভাব হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন — নূনের পুতুল যখন সমুদ্রের তীরে থাকে তখন নূনের পুতুলের আলাদা অস্তিত্ব থাকে। নূনের পুতুল যখন সমুদ্রে নামে তখন তার আর আলাদা অস্তিত্ব থাকেনা। মানুষেরও একই অবস্থা। পরমাত্মা রূপী ভগবান কিংবা ব্রহ্মের অবস্থান আমাদের হৃদয়ে। পাঁচ প্রকার প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত দেহের সঙ্গে পরমাত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

এই যে মায়ের মন্দির মা যতক্ষণ মন্দিরে আছেন ততক্ষণই মন্দিরের মূল্য আছে। বিগ্রহ না থাকলে মন্দির সাধারণ ঘরে পরিণত হয়। আমাদের এই অনিত্য দেহে যতক্ষণ পরমাত্মারূপী ভগবান বা পরম ব্রহ্ম বিরাজ করবেন ততক্ষণ এই দেহের মূল্য থাকে। যখন পরমাত্মা এই অনিত্য দেহ ত্যাগ করেন তখন এই দেহ শবে পরিণত হয়। এই শব দেহ কেউ ছুঁতে চায় না। ছুঁলে স্নান করে নেয়।

এই দেহ যেমন অনিত্য এই প্রাকৃতিক জগৎও অনিত্য। পরম সত্য হলো পরমাত্মারূপী ভগবান। তাই এই পরমাত্মাকে জানাই জ্ঞান আর অনিত্য বস্তু জগতকে জানাই অজ্ঞান। আমাদের দেহের সাধারণ চোখ দ্বারা অনেক কিছুই দেখতে পাই না। তাই আমাদের উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। উপনয়ন হলো তৃতীয় নয়ন। তথা জ্ঞান চক্ষু। জ্ঞান চক্ষুর বিকাশ না হলে পরমাত্মাকে দর্শন করা যায় না।

তোমাদের দুজনেরই পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কার রয়েছে। গেরুয়া কিংবা মালা তিলক

পরে আশ্রমে কিংবা আখড়ায় গিয়ে বসবাস করলেই পরমাত্মাকে লাব হবে এমন কোন কথা নেই। এখনকার অধিকাংশ আশ্রম, মঠ, মসজিদ, গুরুদ্বোয়ারা, পরিচালিত হচ্ছে এক শ্রেরীর অসাধু ব্যক্তির কালো টাকার দ্বারা। ফলে আশ্রমে, মঠে, মসজিদে গুরুদ্বোয়ারায় সর্বত্রই চলছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সাধারণ মানুষ শান্তির খোঁজে সে সব জায়গায় গিয়ে বিষণ্ণ মনে ফিরে আসে। ভগবানের কিংবা পরম ব্রহ্ম কিংবা পরম ব্রহ্মময়ীর লীলার শেষ নেই। কোন কোন ভাগ্যবানজনেরা ভগবানের কিংবা মহামায়ার অহৈতুকি কৃপা লাভে ধন্য হয়ে থাকেন। যেমন তোমাদের বেলায় হয়ে গেল। একেইতো ঈশ্বর দর্শন, ভগবান দর্শন বলে।

সত্যবতী বললো — মাতাজী, সন্ন্যাসীনি মাতার মুখে এত সব কথা শুনার পর আমার মনে হলো — আমাদের জীবনে সত্যের পথই একমাত্র পথ। সত্যের সন্ধান দিতে পারেন একমাত্র জাগতিক গুরু যিনি ভগবান এবং মানুষের মধ্যে মিলন সেতুর কাজ করেন। সন্ন্যাসীনি মাতাজী আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন। আমরা সাধারণ মানুষ। দেব দেবীর লীলা বুঝার সাধ্য আমাদের নেই তাই পরশ মণি পেয়েও হারিয়েছি। এই হারানোর ব্যথা আপনি অনেকটাই দুর করে দিলেন। আপনাকে আমাদের শত কোটি প্রণাম। আপনি যদি দয়া করে আপনার আশ্রম কোথায় তা সঠিকভাবে বলেন তা হলে একদিন আপনার আশ্রমে গিয়ে আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে আসবো।

— অবশ্যই যাবে মা। আমার বাড়ী দেবীপুরে। দেবীপুরে গিয়ে যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই মাতাজীর আশ্রমের পথ বলে দেবে। সত্যই আমার আশ্রম।

— আপনাকে আমরা আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চাই।

— হাসলেন মাতাজী। বললেন তোমরা খুব বেশী রকম আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছ। আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে যদি তোমাদের মানসিক শান্তি আসে তবে প্রণাম করো।

শান্তনু আর সত্যবতী দুজনেই মাতাজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। মায়ের চরণ স্পর্শে তাদের দু'জনের শরীরেই আনন্দ বিদ্যুতের মতো সারা শরীর ও মনকে আনন্দময় করে তুললো। আনন্দের যে কি মধুর রূপ তা কিছুটা অনুভব করলো।

মা বললেন — সন্ধ্যে হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে। মা তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন। জয় মা।

সত্যবতীর মনে হচ্ছিল — সেই মাতাজীকে জড়িয়ে ধরে বলে — মা, তুমি যেওনা। চিরকাল আমার হৃদয়ে আনন্দ ঘন বিগ্রহ রূপে অবস্থান করো। মনের মধ্য থেকেই কে যেন বলে উঠলো — আনন্দ রূপেও আমি। সত্য রূপেও আমি। প্রেম রূপেও আমি। বিশ্বাস ও ভক্তি রূপেও আমি। আমি ছাড়া সত্য ও সুন্দরকে জানা যায় না।

সত্যবতী বললো — মা, আপনার সধবার বেশ দেখে মনে হচ্ছে আপনার স্বামী রয়েছেন। তিনি কি করেন?

সত্যবতীর প্রশ্ন শুনে হাসলেন মাতাজী। বললেন — মা, আমার স্বামী আছেন বটে

তবে আমার ভাগ্যে স্বামী সুখ নেই। স্বামী আমার ভোলানাথ, সংসারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। কখনো ভিক্ষা করেন, কখনো নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকেন তার পরেও তিনি তিন তিনটি বিয়ে করেছেন। তোমার তো মা বিয়ে হয়নি, সতীনের ঘরে যে শান্তি নেই ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেন না। তাই আমিও ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করি।

মাতাজীর কথা শুনে শান্তনু আর সত্যবতী দুজনের মনেই খুব কষ্ট হলো। সত্যবতী বললো — মা, আপনার মতো পরমাসুন্দরী স্ত্রী ঘরে রেখে যে পুরুষ আবার অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে তার মতো হতভাগ্য আর নেই। ঐ দুই মহিলার নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধি নেই। নাহলে কি দ্বিতীয় বর কিংবা তৃতীয় বরের ঘর করতে রাজী হয়?

— তুমি ঠিকই বলেছ মা। মেয়েরা পোড়া কপাল নিয়েই জন্মায়। মা-বাবা কোন প্রকারে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলেই যেন বাঁচেন।

— একথা ঠিক নয় মা। সব - মা-বাবাই চান মেয়ের সুপাত্রে বিয়ে হউক। সুখে শান্তিতে থাকুক। মেয়ে সুখী না হলে মা বাবার দুঃখের শেষ থাকে না। ছেলেদের তুলনায় মা-বাবার কাছে মেয়েরাই বেশী আদরণীয় হয়। তবে ব্যতিক্রম তো নিশ্চয়ই আছে। যেমন আপনার ক্ষেত্রে হয়েছে। মায়ের আশ্রমে নিশ্চয়ই শিষ্য-শিষ্যা রয়েছেন?

— শিষ্য বলতে একজন নাম — বিশ্বাস। আর শিষ্যাও একজন নাম ভক্তি। স্বামীকে তো কদাচিৎ পাই তাই ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়েই আমার সংসার।

— মায়ের কথা শুনে দুজনে আবার ব্যথা অনুভব করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

— মা এবার আমাকে বিদায় দিতেই হয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আগরতলাগামী শেষ বাসটিও একটু পরেই চলে যাবে।

— আপনিতো বাসেই যাবেন।

— না মা। হেঁটে ফাঁড়ি পথে চলে যাবো। দেবীপুরতো এখান থেকে সামান্য পথ। তোমাদের কল্যাণ হউক।

উৎসবে কমলাসাগর কালীবাড়ীতে এখন আর আগের মতো মেলার পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। ভাঙ্গা হাঁটের অবস্থার মতোই গত পাঁচ দশক ধরে মেলার নিয়ম টুকুই বজায় রয়েছে। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আসা প্রায় সব যাত্রীই চলে গেছেন। যে ক'জন রয়েছেন তারাও আগরতলাগামী শেষবাসটিতে উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শান্তনুদের সামান্য দূরে দুই মহিলা বসেছিলেন। তারা মাতাজীর সব কথাই মন দিয়ে শুনেছেন। মাতাজী ধীর পায়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর এক মহিলা আর একজনকে বললেন — দেখো, সন্ন্যাসিনী হয়েও এতক্ষণ কেমন করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন। আমার বয়স প্রায় চল্লিশ। জন্ম কর্ম আমার দেবীপুরেই। মাতাজীর বয়স আমার চাইতেও কম। মাতাজীকে কখনো দেবীপুরে দেখিনি। ভক্তি ও বিশ্বাস নামে দুজন সেবকের কথাও অবলীলায় বলে গেলেন।

পার্শ্ববর্তী মহিলা বললেন — দিদি, এখন কলি যুগ। সাধু সন্তরা সাধারণ মানুষের

চেয়েও হিংসুক। মিথ্যেবাদী আর পরশ্রীকাতর। চলুন বাস এক্ষুণি ছেড়ে দেবে।

দুই মহিলা বাসের দিকে চলে গেলেন। শান্তনু সত্যবতীকে বললো — সত্যবতী, আমার হৃদয় ও মন এখনো আনন্দে পরিপূর্ণ। তোমার কেমন মনে হচ্ছে?

— আমিও আনন্দ সাগরেই ভেসে বেড়াচ্ছি। এই দুই মহিলা মাতাজীকে চিনতে পারেন নি। আমরাও চিনতে পারিনি। এই মাতাজীও আমাদের ফাঁকি দিয়েছেন। আমার মনে হয় — ভক্তি ও বিশ্বাস নামক মহৎ গুণই মায়ের এবং ভগবানের শিষ্য ও শিষ্যা। দেবীপুর মানে দেবতা হিমালয় মানে কৈলাশ। স্বামী ভোলানাথ মানে শিব। আর দুই সতীন হচ্ছেন দেবী দুর্গা আর দেবী গঙ্গা। যিনি কৃপা করে আমাদের দর্শন দিয়ে গেলেন তিনি আদ্যাশক্তি মহাকালী।

সত্যবতীর কথা শুনে শান্তনু বললো — সত্যবতী আমিও এমনটাই ভাবছিলাম। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই আজ আমরা আদ্যাশক্তি মহামায়ারা দর্শন পেলাম। আমাদের জীবন ধন্য। মাকে শতকোটি প্রণাম।

সত্যবতী আর শান্তনু জোর হাত করে কমলা সাগর কালী মন্দিরের দিকে মুখ করে উচ্চারণ করেন —

ওঁ সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে, শিবে সবার্থ সাধিকে।
স্মরণ্যে এম্ব্যকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে।।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশায় শক্তিভুতে সনাতনী।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোস্তুতে।।
নমস্তে স্মরণ্যে শিবে সানু কম্পে।
নমস্তে জগৎ ব্যাপিকে বিশ্ব রূপে।
নমস্তে জগৎবিন্দ পদার বৃন্দে
নমোস্তে জগৎত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

ত্রিপুরার প্রথম উপন্যাস 'পথের প্রদীপ' এর সার সংক্ষেপ

কাজল দেবী এবং শ্যামলা দেবী ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের আশ্রয় শিবিরের একটি পরিদর্শনে গিয়ে ইব্রাহিম মিঁয়ার দেখা পান। ইব্রাহিম মিঁয়া এবং কাজল দেবীদের বাড়ী ছিল একই গ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের সুনামগঞ্জে।

কাজল দেবীর বাবা সনাতন বাবু সুনামগঞ্জের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কাজল দেবী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। গ্রামের প্রত্যেক ছেলেরই কাজল দেবীর উপর লোভ ছিল। গ্রামেরই এক মুসলমান যুবক যার নাম ইব্রাহিম সে কাজলকে শাদী করার সুযোগে ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রাত বারোটার কিছু আগে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হলো ভারত মাতাকে দ্বিখণ্ডিত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষণার পরেই পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের উপর অত্যাচার শুরু হলো। সুযোগ বুঝে এক রাতে ইব্রাহিম কয়েকজন মুসলমান যুবককে সঙ্গে নিয়ে কাজল দেবীর বাড়ীতে হামলা করলো। জোর করে কাজল দেবীকে নিয়ে আসতে চাইলে বাবা সনাতন বাবু বাঁধা দেন। ইব্রাহিমের বন্ধুদের দ্বারা সনাতন বাবু খুন হন। কাজলকে অজ্ঞান অবস্থায় ইব্রাহিম তার বাড়ীতে নিয়ে আসে।

স্কুলের শিক্ষিকা সালিমা বেগম সনাতন বাবুর মর্মান্তিক কাহিনী শুনে ছুটে আসনে ইব্রাহিমের বাড়ী। তিনি ইব্রাহিমের আত্মীয়া এবং সনাতন বাবুর সহকর্মী ছিলেন। ইব্রাহিম পরিবারকে বুঝিয়ে তিনি কাজলকে তার বাড়ী নিয়ে আসেন। শর্ত হলো কাজল যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণে রাজী হয় তাহলে কাজলকে ইব্রাহিমদের বাড়ীতে তুলে দেওয়া হবে আর রাজী না হলে সে যেখানে যেতে চায় সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

কাজল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ায় সালিমা বেগম কাজলকে আগরতলায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কাজল ম্যাট্রিক পাশ ছিল। তিনি সেই প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য কাজলকে পরামর্শ দেন। কাজল সালিমা বেগমের পরামর্শ মতো শিক্ষার প্রমাণপত্র নিয়ে সালিমা বেগমের দেওয়া বোরখা পরে রেল গাড়িতে মোগড়া ষ্টেশনে আসে। সেখান থেকে ষ্টেশন মাষ্টারের সহায়তায় আগরতলা এসে বিমানে কলকাতা চলে যায়।

কলকাতা থেকে গাড়ীতে করে প্রথমে হাওড়া রেলষ্টেশন সেখান থেকে রেলে আহমদনগর ষ্টেশনে নেমে বাসে শিউরি তার জীবন কাকার বাড়ী আসে। সুনামগঞ্জের প্রতিবেশীদের মুখে শুনেছিল কাজলের মা ও ভাই সনাতন বাবুর খুনের পর শিউড়ি চলে এসেছেন। কাকার বাড়ীতে এসে কাজল জানতে পারে মা ও দাদা সেখানে আসেন নি। তারপর সে নিশ্চিত হয় বাবাকে খুন করার পর ইব্রাহিমের বন্ধুরা মা ও ভাইকেও খুন করেছিল।

কাজলের কাকার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না তাই চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত কাজল প্রাইভেট পড়ানোর কাজ শুরু করে। পরিচয় হয় শিখা নামে এক যুবতীর সঙ্গে। শিখাও ম্যাট্রিক পাশ। সে একদিন মা-বাবার মতামতকে উপেক্ষা করে গ্রামেরই নরেন্দ্র নামক এক যুবকের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। মালা বদল করে বিয়ে হয়। নরেন্দ্র একটা বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী করতো।

চরিত্র ভাল ছিল না। আরো একাধিক মেয়ের সঙ্গে তার ভাব ছিল। সে কথা শিখা জানতো না। তার স্বামীর অসৎ চরিত্রের পরিচয় পেয়ে শিখা চলে আসে তার এক বান্ধবী মাধবীর বাড়ী। মাধবীর আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। পরিবারের দায়িত্ব ছিল তার উপর। চাকুরী না পাওয়ায় সে অসৎ উপায়ে অর্থ যোগার করে পরিবার চালাতো।

শিখা বান্ধবীর ভাড়া বাড়িতে এসে নিজের খরচ চালানোরী জন্য মাধবীর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। চোরা চালান, পকেটমার, ছিনতাই সব ধরনের কাজই তারা করতো। তাদের দলের প্রধান ছিল সতীশ নামে এক যুবক।

কাজল চিঠিতে শিখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। শিখা একদিন কাজলকেও তাদের দলে নিয়ে নেয়। কাজলকে নিয়ে দুজনে আলাদা বাড়ী ভাড়া করে বসবাস করতে থাকে।

কাজল প্রায়ই একটি রেষ্টুরেন্টে যেতো মদ খাওয়ার জন্য। একদিন সন্ধ্যার পর মদ খেতে ঢুকে ক্যাবিনে জায়গা না পেয়ে এমন একটি চেয়ারে বসতে বাধ্য হয় যে চেয়ারের পাশে অতি সাধারণ পোষাকে এক যুবক বসেছিল। কাজলের ঐ চেয়ারে বসার ইচ্ছে না থাকলেও সেই যুবকের দু-হাতে চারটি সোনার আংটি দেখে প্রলোভিত হয়। ভাবে সুযোগ পেলে ওকে বাইরে ডেকে নিয়ে ছিনতাই করে আংটি, ঘরি, টাকা হাতিয়ে নেবে। যুবকটির নাম অবিনাশ। বাড়ী কদমতলায়।

অবিনাশ যখন স্বেচ্ছায় কাজলকে মাংস বিরানি খাইয়ে টাকা মিটিয়ে দিলো তখন অবিনাশ সম্পর্কে তার কৌতুহল জাগলো। ছিনতাই করার মানসিকতা চলে গেলো। সে চলে যেতে চাইলো। অবিনাশ প্রস্তাব দিলো কাছেরই এক হোটেলে সে উঠেছে কাজলের সময় থাকলে দুজনে আলাপচারিতা করতে পারে। কাজল রাজী হলো। হোটেলে এসে কাজল তার দুঃখের কাহিনী অবিনাশকে শুনালো। বিপাকে পড়েই যে সে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছে তা খুলে বললো। অবিনাশ প্রস্তাব দিলো তার সঙ্গে কদমতলায় আসার জন্য। সে তাকে কলেজে পড়াবে। চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেবে।

কাজল শিখার সঙ্গে আলোচনা করলো। শিখার নিষেধ সত্বেও কাজল অবিনাশের সঙ্গে কদমতলায় চলে এলো। বাড়ীতে অবিনাশের বৃদ্ধা মা। বিশাল বাড়ী। লোক নেই। অবিনাশের মা কাজলকে দেখে খুশী হলো। ভাবলো ছেলের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। বিয়ে করে সংসারী হবে।

কাজল কলেজে ভর্ত্তি হলো। বি এ পাশ করলো। সরকারী চাকুরী পেলো। কাজল অবিনাশকে ভালবেসে ফেলেছিল। প্রতি মুহূর্তে অবিনাশের সঙ্গে ঘর করার স্বপ্ন দেখতো। অবিনাশের মাও চাইতেন অবিনাশ কাজলকে বিয়ে করুক। সংসারী হউক। অবিনাশ সিদ্ধান্তে অবিচল। বিয়ে করবে না। ভাল ছেলে পছন্দ করে কাজলকে সংসার করার পরামর্শ দিলো। কাজলেরও একই সিদ্ধান্ত অবিনাশকে ছাড়া সে কাউকেই বিয়ে করবে না। কাজল অবিনাশের কাছে জানতে চায় কেন সে বিয়ে করবে না?

অবিনাশ তখন কাজলকে তার জীবনের একটি করুণ কাহিনী শোনায়। অবিনাশ পাড়ারই গীতা নামে একটি মেয়েকে ভালবাসতো। তারা উভয়ে সংসার গড়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। অবিনাশের মায়ের গীতাকে পছন্দ ছিল না। তিনি ছেলেকে পছন্দমতো পাত্রীকে বউ হিসেবে ঘরে আনার কথা বলতেন। কারণ গীতা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি। অবিনাশ স্নাতক ছিল এবং ভাল চাকুরী করতো। গীতা সে কথা জানার পর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে এবং ম্যাট্রিক পাশ করে।

অবিনাশের বাবা ততদিনে মারা গেছেন। অবিনাশ মায়ের কাছে গীতাকে বিয়ে করার

প্রস্তাব দেন। মা অবিনাশের অগোচরে গীতাকে তাদের বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দেয়। মর্মাহত গীতা অবিনাশকে ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে ভাবতে থাকে। অত্যধিক ভাবনায় এবং অনিয়মে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসক তার স্বাস্থ্যের অবনতিতে শংকিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ছুটে যায় অবিনাশ। অসুস্থ গীতা অবিনাশের কাছে তাকে নিয়ে ঘর করতে না পারার বেদনা প্রকাশ করে। এ জন্মে সম্ভব না হলেও পরজন্মে যেন তাকেই পতি হিসেবে লাভ করতে পারে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে মরতে চায়। কথোপকথনের মধ্যেই গীতার মৃত্যু হয়। গীতার মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হয় সে। গীতার চিতায় সে আগুন দেবার সময় প্রতিজ্ঞা করে এ জীবনে আর সে বিয়ে করবে না। পর জন্মে যদি সে পুরুষ মানুষ হিসেবে জন্ম নেয় তা হলে গীতাকেই যাতে স্ত্রী হিসেবে পেতে পারে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানায়।

গীতার চিতার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করায় অবিনাশ বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তার মায়ের মৃত্যুর পর কাজলকে একটি চিঠি লিখে কদমতলা থেকে চলে যায়। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কাজলও অবিবাহিত থেকে যায়।

শরণার্থী শিবিরে ইব্রাহিম মিঁয়াকে দেখে ইব্রাহিম মিঁয়ার কাছে নিজের পরিচয় গোপন করে শরণার্থী হবার কারণ জানতে চায়। ইব্রাহিম তার দুঃখের কাহিনী শোনায়। ইব্রাহিমের তিন মেয়ে এক ছেলে। দুই মেয়েই যুবতী হয়েছিলো। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে রাজাকার বাহিনী খান সেনাদের খুশী করতে ইব্রাহিমের দুই যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। তৃতীয় মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে ভয়ে সাব্রুম দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে। পথে কিশোর পুত্র জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। রাজাকারের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ছেলের দেহ ফেলে রেখেই সে ভারতে চলে আসে। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

কাজল ভগবানের এই কঠোর বিচারে বিস্মিত হয়। বাংলাদেশ হবার পর শরণার্থী বাংলাদেশ ফিরে যায়। কাজল ছুটি নিয়ে প্রথমে শিখার বাড়ী আসে। জানতে পারে স্বামী নরেন্দ্রকে হত্যার অপরাধে শিখা জেল বন্দী রয়েছে।

জেলখানায় এসে জানতে পারে কয়েকদিন আগেই শিখার জেলের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাবে এর নিশ্চয়তা না থাকায় জেল কর্তৃপক্ষ কোন বেসরকারী হোমে তাকে পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজল নিজের পরিচয় দিয়ে শিখাকে তার কাছে নিয়ে আসার আবেদন জানায়। শিখাকে কাজলের সামনে নিয়ে আসা হয়। কাজলকে পেয়ে শিখা নূতন করে বাঁচতে চায়। শিখাকে নিয়ে কাজল পুরী জগন্নাথ দর্শনে আসে। সমুদ্র তীরে এক সন্ন্যাসীকে দেখে তার ছবি তুলতে গিয়ে আবিস্কার করে সেই সন্ন্যাসী আর কেউ নয়, অবিনাশ।

কাজল অবিনাশকে কদমতলায় এসে ভগবানের সেবা পূজায় আত্ম নিয়োগের আবেদন জানায়। অবিনাশ কদমতলায় আসতে অস্বীকার করে। কাজল অবিনাশকে বলে এ জন্মে অবিনাশকে নিয়ে ঘর বাঁধতে না পারলেও আগামী জন্মে যেন ঘর বাঁধতে পারে ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা জানাবে। জীবনের শেষ সময়ে দুজনের দেখা হয়েও আবার বিচ্ছেদ ঘটে।

ত্রিপুরায় প্রকাশিত "হাল" সাহিত্য পত্রিকায় ১৯৭৩ খৃঃ জানুয়ারী সংখ্যায় — "পথের প্রদীপ" উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন — মেঘনাদ সাহা।